বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম
BA and BSS PROGRAMME

ইসলামিক স্টাডিজ-১
ISLAMIC STUDIES-1

উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস
ULUMUL QURAN & ULUMUL HADITH

الدراسات الاسلامية –١
علوم القران و علوم الحديث

কোর্স কোড-BIS-2301

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BA And BSS PROGRAMME

ISLAMIC STUDIES-1

ULUMUL QURAN & ULUMUL HADITH

এটি একটি পুনর্মুদ্রিত এবং পরিমার্জিত পাঠসামগ্রী। পাঠসামগ্রীটি ড. মো. আমির হোসেন সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), মরহুম ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান (অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি), ড. এবিএম হিযবুল্লাহ (অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ড. মুহাম্মদ ইউসুফ (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) রচনা করেছেন এবং মরহুম ড. মো. গিয়াস উদ্দিন (সহকারী অধ্যাপক, বাউবি), ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি) এবং ড. মো. আমির হোসেন সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, বাউবি) সম্পাদনা করেছেন। ২০১২ সালে পাঠসামগ্রীটির সর্বশেষ পরিমার্জন করেছেন মুহাম্মদ আবদুল মালেক (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ (অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

ডীন, এসএসএইচএল

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ-১

ULUMUL QURAN & ULUMUL HADITH

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০১
পুনঃ প্রকাশ ঃ ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
মাসুদ মাহমুদ মল্লিক
পিপিডি, বাউবি

কভার গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক
পিপিডি, বাউবি

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম সরকার

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
ফরাজী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
মাতুয়াইল দক্ষিণ পাড়া কলেজ রোড
ঢাকা ১৩৬২।

ISBN-948-34-1012-2

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের কথা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল কর্তৃক পরিচালিত বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা যারা কোর-কোর্স হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি নির্বাচন করেছেন তাদের জ্ঞাতার্থে কিছু তথ্য ও নিয়মাবলি জানিয়ে দিচ্ছি। উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস বইটি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রথম কোর্স।

আমরা জানি, দূর-শিক্ষণ পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের পরিমাণ কম। এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ এবং শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ সামগ্রীই মুখ্য। শিক্ষার্থীগণ যাতে স্বশিক্ষণের মাধ্যমে বইটির ভাষা ও বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারেন সে দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। বইটি বহুলাংশে শিক্ষকের অভাব পূরণ করবে বলে আশা করছি।

ইসলামিক স্টাডিজ অধ্যয়নে একজন শিক্ষার্থী ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারবেন। জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামই যে মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা তা জেনে নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারবেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের কোর্স-১ ঃ উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদীস-এর মাধ্যমে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয়ের প্রতি ধারণা দেওয়া হয়েছে, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে অনুশীলন করলে সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, যুলম, বিভিন্নভাবে প্রচলিত নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব হবে। ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের কোর্স-১ বইটি তিন ক্রেডিট বিশিষ্ট। এক ক্রেডিটের পরিমাণ হল আনুমানিক ১৪/১৫ ক্লাস ঘন্টা। সে দিকে দৃষ্টি রেখে বইটি পাঁচটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিট আবার কতগুলো পাঠে বিভক্ত রয়েছে। পুরো বইটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত-এর কোন অংশ বাদ দেওয়া যাবে না। একজন শিক্ষার্থী যাতে নিজে নিজেই বইটি পাঠ করে আয়ত্ত করতে পারেন সে জন্য কিছু নির্দেশনা দেওয়া হলো-

১. প্রতিটি ইউনিটের একটি করে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এবং শিরোনাম অনুসারে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী এ ভূমিকা পাঠ করলে ইউনিটের বিষয়বস্তু এবং এর বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে জেনে ইউনিটে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে প্রথমেই ধারণা লাভ করতে পারবেন।

২. প্রথমে নিজেই পাঠের সবগুলো উদ্দেশ্য পড়ে এ পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন। অতঃপর পাঠটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। আয়ত্তে না আসলে একাধিকবার পড়ুন।

৩. প্রতিটি পাঠ অধ্যয়ন শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন। প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের জন্যে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উত্তর জেনে নিন। পাঠ শেষে তিন ধরনের প্রশ্ন দেওয়া আছেঃ নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন। সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর আয়ত্ত করুন। টেক্সট বইয়ের মধ্য হতে উত্তর খুঁজে নিন।

৪. বইয়ের কোন অংশ যদি বুঝতে না পারেন তবে টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে টিউটর-এর সহায়তা নিন।

৫. বইটিতে সূরা আল-নূর, বিষয় ভিত্তিক আয়াত, বিষয় ভিত্তিক হাদীস এবং অন্যান্য পাঠে আয়াত ও হাদীসগুলো আরবীতে লেখা হয়েছে। বিশুদ্ধভাবে তা আরবীতে পাঠ করার চেষ্টা করুন। তবে পরীক্ষায় পাসের জন্য আরবী লেখা আবশ্যক নয়।

৬. আল-কুরআন ও আল-হাদীস বইটির উপর বাউবির অনুষ্ঠানমালায় বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীগণ বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শুনবেন ও দেখবেন। যদি কোন কিছু বুঝতে না পারেন তবে তা সাথে সাথে খাতায় লিখে রাখবেন এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসে টিউটরের নিকট থেকে জেনে নেবেন।

পাঠ গ্রহণের সময় উপরোক্ত বিষয়গুলো মনে রাখুন এবং নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ তৈরি করার চেষ্টা করুন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের কোর্স-১ উলূমুল-কুরআন ও উলূমুল-হাদীস বইটি রচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন লেখকের আরবী, উর্দু ও বাংলায় রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। বইটিতে মুদ্রণজনিত এবং অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে। তথ্যগত কোন ভুল যদি কারো নজরে পড়ে তবে তা জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের কোর্স-১-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের জন্যে নিচের বইগুলো পড়তে পারেন-

১. তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন-বাংলা অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. তাফসীর ইবনে কাছীর: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৩. আল-ইতকান: আল্লামা সুয়ুতী
৪. উলূমুল কুরআন: আল্লামা তাকী উসমানী
৫. সহীহ আল বুখারী-অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৬. সহীহ মুসলিম-অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৭. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস : মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
৮. মেশকাত শরীফ : মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী
৯. হাদীস সংকলনের ইতিহাস : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১০. হাদীস শরীফ : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
১১. হাদীস সংকলনের ইতিবৃত্ত : আহসান সাইয়েদ

সূচিপত্র পৃষ্ঠা

ইউনিট-১	ঃ	**আল-কুরআন : পরিচিতি ও বিষয়বস্তু**	**১**
পাঠ-১	ঃ	আল-কুরআনের পরিচয়	২
পাঠ-২	ঃ	আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয়	৬
পাঠ-৩	ঃ	আল-কুরআনের নামকরণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ	১১
পাঠ-৪	ঃ	আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়	১৭
পাঠ-৫	ঃ	আল-কুরআনের গুরুত্ব	২১
পাঠ-৬	ঃ	আল-কুরআন নাযিল	৩০
পাঠ-৭	ঃ	আল-কুরআন সংরক্ষণ	৩৫
পাঠ-৮	ঃ	আল-কুরআন গ্রন্থায়ন	৪২
পাঠ-৯	ঃ	মানব জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা	৪৮
পাঠ-১০	ঃ	চরিত্র গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা।	৫৭
ইউনিট-২	ঃ	**সূরা আল-নূর ঃ অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা (১-৩৩ নং আয়াত)**	**৬০**
পাঠ-১	ঃ	সূরা আল-নূর নাযিলের পটভূমি	৬১
পাঠ-২	ঃ	নারী নির্যাতনরোধে সূরা আল-নূরের শিক্ষা	৬৬
পাঠ-৩	ঃ	সূরা আল-নূরের আলোকে ব্যভিচারের পরিণাম ও দন্ডবিধি	৭১
পাঠ-৪	ঃ	ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ : সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও এর দন্ডবিধি	৭৪
পাঠ-৫	ঃ	সূরা আল-নূরের ১ থেকে ১০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা	৭৭
পাঠ-৬	ঃ	সূরা আল-নূরের ১১ থেকে ২০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা	৮৩
পাঠ-৭	ঃ	সূরা আল-নূরের ২১ থেকে ২৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা	৮৮
পাঠ-৮	ঃ	সূরা আল-নূরের ৩০ থেকে ৩৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা	৯২
ইউনিট-৩	ঃ	**আল-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত**	**৯৬**
পাঠ-১	ঃ	আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত আয়াত	৯৭
পাঠ-২	ঃ	আল-কুরআন আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ সম্পর্কিত আয়াত	১০২
পাঠ-৩	ঃ	রাসূল (সা)-এর আনুগত্য বিষয়ক আয়াত	১০৭
পাঠ-৪	ঃ	নেতার আনুগত্য সম্পর্কিত আয়াত	১১১
পাঠ-৫	ঃ	মানব মর্যাদা সম্পর্কিত আয়াত	১১৪
পাঠ-৬	ঃ	মানবাধিকার সংক্রান্ত আয়াত	১১৯
পাঠ-৭	ঃ	দুঃস্থ মানবতার সেবা সংক্রান্ত আয়াত	১২৫
পাঠ-৮	ঃ	ঐক্য ও সংহতি সংক্রান্ত আয়াত	১৩১

ইউনিট-৪	ঃ	**আল-হাদীস ঃ পরিচিতি ও বিষয়বস্তু**	**১৩৫**
পাঠ-১	ঃ	হাদীস পরিচিতি	১৩৬
পাঠ-২	ঃ	হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৪১
পাঠ-৩	ঃ	হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি	১৪৬
পাঠ-৪	ঃ	হাদীসের শ্রেণী বিভাগ	১৫৪
পাঠ-৫	ঃ	সহীহাইনের সংকলন	১৫৮
পাঠ-৬	ঃ	সুনানে আরবাআ সংকলন	১৬৩
ইউনিট-৫	ঃ	**নির্বাচিত হাদীস-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা**	**১৬৭**
পাঠ-১	ঃ	নিয়াত ও ইখলাস সম্পর্কিত হাদীস	১৬৮
পাঠ-২	ঃ	ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত হাদীস	১৭৩
পাঠ-৩	ঃ	ইলম সংক্রান্ত হাদীস	১৮৬
পাঠ-৪	ঃ	পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত হাদীস	১৯৩
পাঠ-৫	ঃ	সালাত সম্পর্কিত হাদীস	২০১
পাঠ-৬	ঃ	যাকাত সম্পর্কিত হাদীস	২১০
পাঠ-৭	ঃ	সাওম সংক্রান্ত হাদীস	২১৯
পাঠ-৮	ঃ	হজ্জ সংক্রান্ত হাদীস	২২৯
পাঠ-৯	ঃ	উপার্জন সংক্রান্ত হাদীস	২৩৫
পাঠ-১০	ঃ	নৈতিকতা সংক্রান্ত হাদীস	২৩৯
পাঠ-১১	ঃ	যুল্‌ম-নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত হাদীস	২৪৬
পাঠ-১২	ঃ	সুদ, ঘুষ, জুয়া রোধ সংক্রান্ত হাদীস	২৫০
পাঠ-১৩	ঃ	হত্যা, সন্ত্রাস, অধিকারহরণের পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস	২৫৬
পাঠ-১৪	ঃ	চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানির পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস	২৬৩
পাঠ-১৫	ঃ	পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত হাদীস।	২৬৯

ইউনিট ১

আল-কুরআন: পরিচিতি ও বিষয়বস্তু

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সর্বশেষ আসমানী কিতাব। নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে এ গ্রন্থখানি তাঁর মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। এ গ্রন্থে মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল দিক ও বিভাগের তথা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার মূল কথা উপস্থাপিত হয়েছে। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর মূলধারা ও বিধি এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শনের জন্য এটা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ বছর ব্যাপী প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়।

কুরআন মাজীদের শব্দ-ভাষা-অর্থ-মর্ম-ভাব সবই আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট থেকে নাযিল। এর ভাষা আরবী যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। ঘটনার বৈচিত্র্য ও সমস্যার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ কিতাবের বর্ণিত বিষয় ও ঘটনা পরস্পরা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। অতীতকালীন সময় নবী-রাসূলের দাওয়াত ও সকল আসমানী কিতাবের সার-নির্যাস ও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত সকল তত্ত্ব ও তথ্য এবং শিক্ষা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য আসমানী কিতাবের কার্যকারিতা মানসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানব প্রজন্মের জন্য সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী বা পথপ্রদর্শক হিসেবে আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করেন- "বিশ্ব মানবতার দিশারী এবং তৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার মানদন্ডরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন, "আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও কল্যাণকর মহৌষধ। যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে এবং অনুসরণ করবে, সে পাবে মুক্তির পথ, সে কখনো ধ্বংস হবে না।" (হাকিম ও বায়হাকী)

কুরআনের প্রতি আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে- এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন ও শাসন-সংবিধান হিসেবেই তিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন। যারা এ কিতাবকে গ্রহণ করে তা তাদের জন্য পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সাফল্য ও সৌভাগ্যের দিশারী। আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে উভয় জগতে দূর্ভাগ্য ও অশান্তি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- ♦ পাঠ-১. আল-কুরআনের পরিচয়
- ♦ পাঠ-২. আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয়
- ♦ পাঠ-৩. আল-কুরআনের নামকরণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ
- ♦ পাঠ-৪. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়
- ♦ পাঠ-৫. আল-কুরআনের গুরুত্ব
- ♦ পাঠ-৬. আল-কুরআন নাযিল
- ♦ পাঠ-৭. আল-কুরআন সংরক্ষণ
- ♦ পাঠ-৮. আল-কুরআন গ্রন্থায়ন
- ♦ পাঠ-৯. মানব জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা
- ♦ পাঠ-১০. চরিত্র গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা।

পাঠ-১

আল-কুরআনের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআনের আভিধানিক পরিচয় বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের পারিভাষিক পরিচয় বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- আল-কুরআনের অন্যান্য নামের বিবরণ দিতে পারবেন।

আল-কুরআনের আভিধানিক অর্থ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিপূর্ণ পরিচয় জানার জন্য এর আভিধানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমরা জানি قران আরবী শব্দ। শব্দটি قرء يقرأ ক্রিয়ার বাবে فتح - يفتح -এর ক্রিয়ামূল (مصدر) فعلان -এর ওযনে। قران শব্দটি مقروء 'পঠিত' অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, কিতাব- كتاب অর্থ- مكتوب -লিখিত। এর অপর অর্থ হল-সংযোগকরণ। এটা قرن থেকে নির্গত। আর قران অর্থ مقرون বা সংযুক্ত। যেহেতু কুরাআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সংযুক্ত ও সংযোজিত, এজন্য একে কুরআন বলা হয়। তাছাড়া একটি বর্ণ অপর একটি বর্ণের সংগে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قراءة (কিরায়াত) বলা হয়।

কুরআন শব্দের উৎস সন্ধান

কুরআন শব্দটির মূল বা উৎস কি এ বিষয়ে আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ ও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যার সারকথা হচ্ছে-

প্রথমতঃ কুরআন শব্দটি ইসমে মুশতাক-নিষ্পন্ন বিশেষ্য (Derived Noun), না কি ইসমে গায়র মুশ্তাক-অনিষ্পন্ন বিশেষ্য-(Non Derived Noun.)

দ্বিতীয়তঃ 'কুরআন' শব্দটিতে হামযাহ অক্ষর আছে কি নেই।

মতামতগুলোর বিশ্লেষণ

১. বিখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাসীর (র), ইমাম শাফিঈ (র) এবং একদল বিশেষজ্ঞের মতে কুরআন শব্দটি কোন ক্রিয়ামূল বা ধাতু কিংবা অন্য কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়নি।

এটা اسم غير مشتق বা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য। এমতের সমর্থকগণ বলেন, কুরআন শব্দটি হামযাহ যুক্তও নয় এবং অন্য কোন শব্দ থেকেও গঠিত হয়নি। বরং এটা হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কুরআন শব্দটিকে যদি কিরাআত (قراءة) ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে যা পাঠ করা হয়- এমন সব জিনিসকেই কুরআন নামে অভিহিত করতে হবে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল যেমন আল্লাহর বাণী ছিল, তেমনি কুরআনও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া বাণী। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ বা পুস্তকের নাম কুরআন রাখা যাবে না। এটা একমাত্র সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের জন্যই প্রযোজ্য নাম। (লিসানুল-আরব)

২. তাফসীরকার ইবনে কাসীর (র), ইমাম শাফিঈ (র), ফাররা, আবুল হাসান বায়হাকী, খাতীব বাগদাদী (র) প্রমুখ মনীষীগণ কুরআনকে হামযাহ ছাড়া قران পড়তেন। তাঁরা বলেন, কুরআন শব্দটি কিরাআত (قراءة) শব্দ হতে উৎপন্ন হয়নি কাজেই এটা হামযাহ বিশিষ্ট নয়।

৩. অভিধান বিশেষজ্ঞ আল-যাজ্জাজ ও আল-লিহয়ানী এবং আলিমগণের একটি বড় দল কুরআনকে হামযাহসহ قران পাঠ করেন। যাজ্জাজের মতে, قران শব্দটি غفران শব্দের সম-ওযনের। যেমন - غفران رجحان ইত্যাদি এবং এটা قرا -এর ক্রিয়ামূল قرء শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ তিলাওয়াত বা পাঠ করা।

৪. আল-কুরআন (القران) শব্দের বিশ্লেষণে ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখেন, 'কারউন' (قرء) ধাতু থেকে কুরআন শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ- একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা। আর এর সম্প্রসারিত অর্থ অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা ও পাঠ করা। (উলূমুল কুরআন-তাকী উসমানী)

৫. আল্লামা যারকানী বলেন, কুরআন শব্দটি قراءة (কিরাআতুন) ধাতু থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ পাঠ করা। আরবী ব্যাকরণের নিয়মে এটা কর্মবাচ্য (Passive Voice) مقروء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয়- সেই গ্রন্থ, যা পাঠ করা হয। অর্থাৎ 'পঠিত গ্রন্থ'। (মানাহিলুল ইরফান, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪)

এ কথার প্রমাণ মেলে আল্লাহর-এ বাণীতে

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

"নিশ্চয় এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করবে।" (সূরা আল-কিয়ামাহ : ১৭-১৮)

সারকথা

কুরআন শব্দটি قرء - يقرأ - قراءة থেকে উদ্ভূত হলে এর অর্থ হবে পাঠ করা যা مقروء পঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়- সেই পঠিত গ্রন্থ।

আর قرن ধাতু থেকে নির্গত ধরা হলে-এর অর্থ হবে مقرون সংযুক্ত। কুরআনের শব্দ, আয়াত এবং সূরাগুলো পরস্পর সংযুক্ত, তাই এ অর্থে কুরআনকে সংযোজিত গ্রন্থ বলা হয়।

আর একটি মত হল এটা অনিষ্পন্ন ক্রিয়া, কোন শব্দ থেকে এটা আসেনি। তাওরাত, যাবূর, ইনজীল কিতাবের মতই এটা সর্বশেষ আসামানী কিতাবের নাম বিশেষ।

আল-কুরআনের পারিভাষিক অর্থ

আভিধানিক অর্থ জানার পর এবার আল-কুরআনের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

কুরআন কী এবং কাকে বলে? কুরআনের এই পারিভাষিক সংজ্ঞা বা পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে মনীষীগণ যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন সেসব সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা এখানে তুলে ধরা হল-

১. মুফতি আমীমুল ইহসান অত্যন্ত সহজ করে কুরআনের সংজ্ঞা দিয়েছেন-

والقران الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للا عجاز بسورة منه.

"কুরআন মাজীদ এমন আসমানী কিতাব, যা আমাদের নেতা নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হয়, যার একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম।"

২. হানাফী মাযহাবের আল-মানার গ্রন্থে আল্লামা নাসাফী (র) বলেন,

الكتاب هو القران المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متو اترا بلا شبهة-

"মহাগ্রন্থ আল-কুরআন - যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (স) উপর নাযিলকৃত এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রাসূল (স) থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।" (আল-মানার : নাসাফী)

৩. আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন ঃ

القران هو كلام الله الذى نزل به روح الامين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بالفاظه العربية ومعانيها الحقة - المبدو بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس - المنقول الينا بالتواتر وانه محفوظ من الزيادة و النقصان-

"আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাযিল করেন। এর ভাষা আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা হচ্ছে সূরাতুন নাস, যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে অকাট্য মুতাওয়াতির বর্ণনা সূত্রে। আর তা অবশ্যই যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।" (ইলমে উসূলুল ফিকহ ঃ আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ)

৪. হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (র) কুরআনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "মহান আল্লাহর সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর উপর নাযিল হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোন রূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে। আর তা হল কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টিরই নাম।" (তালখীসুল মানার ঃ আশরাফ আলী থানভী)

সারকথা

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার সেই গ্রন্থ যা তিনি অহীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার পথপ্রদর্শক রূপে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল করেন, যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ তাআলার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. কুরআন শব্দটি কোন বাব থেকে নির্গত?

ক. বাবে ফাতাহা
খ. বাবে সামিয়া
গ. বাবে কারুমা
ঘ. বাবে দারাবা

২. কুরআন শব্দের অর্থ

ক. অপঠিত গ্রন্থ
খ. পঠিত গ্রন্থ
গ. সংযুক্ত করা
ঘ. পাঠ করা

৩. কুরআন শব্দটি

ক. নিষ্পন্ন ক্রিয়া
খ. অনিষ্পন্ন ক্রিয়া
গ. ক্রিয়ামূল
ঘ. অনারবী

৪. কুরআনের ভাষা, অর্থ, মর্ম ও ভাব সবকিছুই

ক. স্বয়ং আল্লাহর
খ. স্বয়ং রাসূলের (স)
গ. আল্লাহ ও রাসূলের
ঘ. ফেরেশতা জিবরাইল (আ)-এর

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরঃ ১. ক, ২. খ, ৩. খ, ৪. ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আভিধানিক অর্থ লিখুন।
২. কুরআন শব্দটি অনিষ্পন্ন বিশেষ্য - এটা কোন মনীষীর কথা? এ মতের যুক্তি পেশ করুন।
৩. পবিত্র কুরআনের পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
৪. হাকীমুল উম্মত কে? তাঁর প্রদত্ত কুরআনের সংজ্ঞাটি লিখুন।
৫. আল-মানার গ্রন্থকারের নাম কী ? কুরআনের সংজ্ঞা উল্লেখ করে তিনি কী বলেন?
৬. আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ প্রদত্ত কুরআনের সংজ্ঞাটি লিখুন।
৭. কুরআন শব্দের বিশ্লেষণে প্রধানত অভিমত কয়টি ও কী কী?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আভিধানিক পরিচয় বিস্তারিত লিখুন।
২. আল-কুরআনের পারিভাষিক পরিচয় বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআনের কাঠামোগত পরিচয় বলতে পারবেন
- সূরা কী তার পরিচয় দিতে পারবেন
- আয়াত কাকে বলে এবং-এর পরিচয় দিতে পারবেন
- সূরা ও আয়াতের শ্রেণী বিভাগের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- মাক্কী সূরার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- মাদানী সূরার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়বস্তু বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন
- মাক্কী ও মাদানী সূরার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাব, যা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবী জীবনের ২৩ বছর ব্যাপী নাযিল হয়। এতে ১১৪টি সূরা ও প্রসিদ্ধ মতে ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে।

সূরার পরিচয়

সূরা (سورة) শব্দটি একবচন। বহুবচনে سور (সুওয়ারুন)। আভিধানিক অর্থ হলো- দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমন্ডিত, উচ্চতম অবস্থানস্থল ও মর্যাদা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

সূরার সংজ্ঞা সম্বন্ধে 'তানবীর' -এর গ্রন্থকার বলেন,

السورة الطائفة من القران المسماة باسم خاص توقيفا واقلها ثلث ايات

"সূরা হলো আল-কুরআনের একটি অংশ বিশেষ, যাকে আল্লাহর নির্দেশে নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত।" যেমন- সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান ও সূরা কাওসার ইত্যাদি। আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

আয়াতের পরিচয়

আয়াত (الآية) শব্দটি একবচন। বহুবচন ايات -এর আভিধানিক অর্থ হলো- চিহ্ন ও নিদর্শন, শিক্ষা, তাৎপর্য, উপদেশ, মু'জিযা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

আয়াতের পরিচয় দিতে গিয়ে মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন,

الا ية طائفة من كلمات القران متميزة بفصل

"কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহকে আয়াত বলা হয়, যাকে বিশেষ বিরাম চিহ্ন দ্বারা অপর বাক্য থেকে পৃথক করা হয়েছে।" প্রসিদ্ধ মতে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।

কুরআনের সূরা ও আয়াতের শ্রেণী বিভাগ

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তেইশ বছরের নবুওয়াতী-জীবন মাক্কী ও মাদানী-এ দু'পর্বে বিভক্ত। পবিত্র কুরআন ও দু'পর্বে বিভক্ত, যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন নাযিলের সময় ও স্থান অনুযায়ী মৌলিকভাবে কুরআনের আয়াত ও সূরাকে দু'ভাবেই ভাগ করা হয়ে থাকে।

মাক্কী ও মাদানী সূরার পরিচয়

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতী জীবনে মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর হিজরতের সময় পর্যন্ত ১৩ বছরের মধ্যে যে সকল সূরা বা আয়াত নাযিল হয়, সেগুলোকেই মাক্কী সূরা বা আয়াত বলা হয়।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মদীনায় হিজরত করার পর ১০ বছরের জীবনে মদীনায় কিংবা অন্য যে কোন স্থানে যে সকল সূরা ও আয়াত নাযিল হয়, সেগুলোকে মাদানী সূরা বা মাদানী আয়াত বলা হয়।

আসলে পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে আবার কিছু সূরা মদীনায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু এমনও হয়েছে, যে কোন একটি সূরা মক্কায় নাযিল শুরু হয়েছে, তবে এর কিছু আয়াত মদীনায়ও নাযিল হয়েছে। কিছু কিছু আয়াত মক্কা ও মদীনার বাইরেও নাযিল হয়েছে। তবে সর্বসম্মত মত হল হিজরতের পূর্বে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মাক্কী সূরা এবং হিজরতের পরে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সূরা রূপে অভিহিত করা হয়। কোন কোন সূরা একই সঙ্গে মাক্কী ও মাদানী। এছাড়া সময় অনুসারেও বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যথা- সাফারী (সফররত অবস্থায় নাযিল হওয়া) ও হাদারী (আবাস স্থলে বসবাস অবস্থায় নাযিল হওয়া), লায়লী- রাতে নাযিল হওয়া ও নাহারী-দিনে নাযিল হওয়া। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (স) থেকে সরাসরি এমন কোন্ বর্ণনা নেই, যার মাধ্যমে আমরা এ কথা জানতে পারি যে, তিনি কোন্ আয়াতটিকে অথবা কোন্ সূরাটিকে মাক্কী অথবা মাদানী বলে অভিহিত করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীগণ যারা কুরআনের শব্দ ও অর্থের হিফাযতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, তাঁরা কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের মধ্যে মাক্কী ও মাদানী চিহ্নিত করেছেন। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার জন্য মাক্কী ও মাদানী চিহ্নিতকরণ এবং শানে নুযূল বা পটভূমি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মূলত কুরআনের মাক্কী ও মাদানী সূরা এবং আয়াতের পার্থক্য নির্ণয় অধিকাংশ সাহাবাগণই করেছেন। তাছাড়া কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক নিদর্শন ও লক্ষণের মাধ্যমেও বিভিন্ন আয়াত ও সূরার মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয় জানা যায়। যেমন- যে সব আয়াতে বদর যুদ্ধের আলোচনা হয়েছে, পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, তা মাদানী হবে। অথবা যে সব আয়াতে মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই মাক্কী।

তাই এসব লক্ষণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে মাক্কী বা মাদানী চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার অনেক সূরা এমনও আছে যেগুলো সম্পূর্ণ মাক্কী বা সম্পূর্ণ মাদানী। যেমন- সূরা আলে-ইমরান সম্পূর্ণ মাদানী। আবার এমনও কিছু সূরা আছে, যা সম্পূর্ণ সূরা মাক্কী হওয়া সত্ত্বেও কিছু মাদানী আয়াত তার অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুরূপভাবে মাক্কী সূরার মধ্যেও মাদানী আয়াতের দিকে লক্ষ রেখে করা হয়েছে। অর্থাৎ মাক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে সে সূরাকে মাক্কী এবং মাদানী আয়াতের পরিমাণ বেশি হলে সে সূরাকে মাদানী বলা হয়েছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন্ আয়াত কোন্ সূরার অংশ কিংবা সূরা ও আয়াতের বিন্যাস সব কিছুই আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পক্ষ থেকেই সাব্যস্ত হয়েছে।

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য

রাসূলে কারীমের (স) নবী জীবনের দু'টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে হিজরতের পূর্বে নবুওয়াত পাওয়ার পর থেকে তের বছরের জিন্দেগী। তাঁর হিজরত করার পর মদীনার দশ বছরের জিন্দেগী হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। এ দু'অধ্যায়ে মহানবী (স)-কে দু'ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। এ পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ নাযিল হতে থাকে। তাই এ দু'অধ্যায়ের সূরাসমূহের দু'ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

মহানবী (স)-এর মাক্কী জীবন ছিল ব্যক্তি ও আত্মগঠনের যুগ। তাই এ যুগের সূরাসমূহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-ব্যক্তি ও আত্মগঠনের প্রক্রিয়া সম্বলিত বিষয়াদির উপস্থাপনা। আর মাদানী যুগ ছিল বিজয় ও সমাজ গঠনের যুগ। তাই এ পর্যায়ের সুরাসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজ গঠনের মূলনীতি বিষয়ক বিবরণাদির বিশ্লেষণ।

বিভিন্ন তাফসীরকার ও বিশেষজ্ঞ আলিম মাক্কী ও মাদানী সূরার পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এসকল বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু শাব্দিক আবার কিছু কিছু মর্ম ও তাৎপর্য বিষয়ক। যেমন- মাক্কী সূরাসমূহে يايها الناس (হে মানব মন্ডলী!) এবং يابنى ادم (হে আদম সন্তান) বাক্যের বহুল উল্লেখ লক্ষ করা যায়। এভাবে كلا (কখনো নয়) শব্দটি বিভিন্ন মাক্কী সূরায় ৩৩ বার উল্লেখ রয়েছে।

অপর দিকে মাদানী সূরাসমূহে يايها الذين امنوا (ওহে যারা ঈমান এনেছ!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের মর্ম বিষয়ক পার্থক্য এই যে, মাক্কী সূরাসমূহে তাওহীদ এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। তাছাড়া আখিরাতের জীবন, কিয়ামত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পাপ-পূণ্যের শাস্তি ও প্রতিদান, বেহেশত ও দোযখ এবং নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অপর দিকে মাদানী সূরাসমূহে ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি- বিধান শরী'আতের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও মাসআলা-মাসায়িলের উল্লেখ রয়েছে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন-বিধান, সন্ধি-চুক্তি, আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যনীতি তথা বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্বলিত বর্ণনা মাদানী সূরার আলোচ্য বিষয়।

নিম্নে মাক্কী ও মাদানী সূরাসমুহের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হলোঃ

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু

১. সূরাগুলো আকারে ছোট।
২. আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদের বর্ণনা।
৩. রিসালাত ও নবুওয়াতের বর্ণনা।
৪. আখিরাত বা পরকালীন জীবনবোধ সম্পর্কিত আলোচনা।
৫. কুরআনের সত্যতা প্রমাণ।
৬. শিরক ও কুফরের যুক্তি এবং উপমা ভিত্তিক বিরোধিতা।
৭. জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা।
৮. পারলৌকিক বিচার ও হিসাব নিকাশের বর্ণনা।
৯. আকাইদ ও ঈমান সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা।
১০. ব্যক্তি গঠন ও পরিশুদ্ধির নির্দেশনা।
১১. নৈতিকতাবোধ, চিন্তাশক্তি ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
১২. নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ প্রদান।
১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ ও ঝর্ণাধারার মতো ঝরঝরে, হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হবার যোগ্য অতি উন্নত ব্যঞ্জনা।
১৪. শপথ বাক্য দ্বারা সূরার প্রারম্ভ এবং বক্তব্যের উপস্থাপনা।
১৫. অধিকাংশের মতে, এ পর্বে ৯২টি সূরা রয়েছে।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু

১. সূরাগুলো আকারে দীর্ঘ।
২. ইবাদতের বর্ণনা।
৩. আহকামে শরী'আতের বর্ণনা।
৪. হালাল ও হারামের বর্ণনা।
৫. ইসলামী রীতি-নীতির বিশদ বর্ণনা।

৬. অর্থনৈতিক আইন-যাকাত, উশর, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ।
৭. ইসলামের ব্যবহারিক জীবন, আচার-ব্যবহার, বিয়ে-শাদী, তালাক ইত্যাদির বর্ণনা।
৮. সামরিক আইন, জিহাদ ইত্যাদির বর্ণনা।
৯. পররাষ্ট্রনীতি, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি বিষয়।
১০. সামাজিক-রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়াদিক আলোচনা।
১১. মুনাফিক, কাফির, জিম্মি, আহলে কিতাব, শত্রু, মিত্র, তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণবিধির বিবরণ।
১২. ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ করে সত্যদ্বীন গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।
১৩. এ পর্বের সূরাগুলোর সুদীর্ঘ-বর্ণনা ধারা ও ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
১৪. শপথের প্রাবল্য কম।
১৫. অধিকাংশের মতে, এ পর্বে রয়েছে ২২ টি সূরা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা কত?
ক. ৪৪৪৪ টি
খ. ৬২৩৬ টি
গ. ৭৭৭৭ টি
ঘ. ১১৪ টি

২. আল-কুরআনের সূরার সংখ্যা হচ্ছে-
ক. ৫০০ টি
খ. ১১৪ টি
গ. ১১৫ টি
ঘ. ৪৪ টি

৩. আয়াত অর্থ
ক. বাক্য
খ. শব্দ
গ. কথা
ঘ. বাণী

৪. পবিত্র কুরআন কত বছরে নাযিল হয়েছিল-
ক. ২৩ বছরে
খ. ২৫ বছরে
গ. ১৩ বছরে
ঘ. ১০ বছরে

৫. মক্কায় নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতী জীবন কত বছরের ছিল ?

ক. ৪০ বছর
খ. ১৩ বছর
গ. ১০ বছর
ঘ. ৬৩ বছর

৬. মহানবী (স) মদীনায় কত বছর কাটান-

ক. ১০ বছর
খ. ২০ বছর
গ. ৪০ বছর
ঘ. ৬৩ বছর

৭. মাক্কী সূরা কতটি (প্রসিদ্ধ মতে)-

ক. ৯০ টি
খ. ২২ টি
গ. ৯২ টি
ঘ. ১০০ টি

৮. মাদানী সূরার সংখ্যা (প্রসিদ্ধ মতে) কতটি ?

ক. ২২ টি
খ. ২৩ টি
গ. ২৫ টি
ঘ. ৯২ টি

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. খ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক, ৫. খ, ৬. ক, ৭. গ, ৮. ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সূরা ও আয়াত বলতে কী বুঝেন? লিখুন।
২. আল-কুরআনের সূরাসমূহের প্রধান শ্রেণী বিভাগ কী কী?
৩. মাক্কী সূরা কাকে বলে? মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. মাদানী সূরা কাকে বলে? মাদানী সূরার বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য কী ? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মাক্কী সূরার তালিকা তৈরি করুন।
২. মাদানী সূরা কয়টি ? এর একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।
৩. মাক্কী ও মাদানী সূরা কাকে বলে? মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

আল-কুরআনের নামকরণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআনের প্রসিদ্ধ নামসমূহ বলতে পারবেন
- আল-কুরআনের নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আল-কুরআনের নামসমূহ

আল-কুরআনের প্রসিদ্ধ দু'টো নাম হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-ফুরকান। এ ছাড়াও কুরআনের গুণবাচক অনেক নামের উল্লেখ দেখা যায়। কুরআনেও বিভিন্ন স্থানে একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লামা আবুল মা'আলী "আল বুরহান" গ্রন্থে আল-কুরআনের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেন। 'ফাত্হুর রাহমান' নামক কিতাবে কুরআনের ৯০টি নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইবনে জারীর আত-তাবারী পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ নাম চারটি বলে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আর তা হল-

ক. আল-কুরআন,
খ. আল-ফুরকান,
গ. আল-কিতাব,
ঘ. আয-যিকর।

কুরআন মাজীদে 'আল-কুরআন' নামটি ৬১টি বার উল্লেখ আছে।

কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র) বলেন, "আরববাসীগণ সাধারণত নিজেদের সাহিত্য কর্মের যেভাবে নামকরণ করেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের নাম সে রূপ করেননি। আরবগণ তাদের সাহিত্য কর্মের সংকলন বা সমষ্টিকে বলে থাকেন দীওয়ান। আরবগণ তাদের 'দীওয়ানের' অংশ বিশেষকে বলেন, কাসীদা (قصيدة)। কিন্তু আল-কুরআনের অংশ বিশেষের নামকরণ করা হয় -'সূরা (سورة) হিসেবে। আরবরা ছোট বাক্যকে 'বায়াত' (بيت) বলে কিন্তু কুরআনের বাক্যকে বলা হয় আয়াত (اية)। কি তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে আল্লাহর এ কিতাবকে আল-কুরআন নামকরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে পন্ডিতগণের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা হল-

১. আল্লামা তাকী উসমানী লিখেন, কুরআন নাযিলের সময় আরবের অবিশ্বাসীরা কুরআনের পবিত্র বাণী শুনতে চাইত না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ হট্টগোল ও শোরগোল করত- যাতে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌঁছে এবং বুঝতে না পারে। কাফিরদের এ হীন আচরণ ও আপত্তিকর ব্যবহারের জবাবে 'আল-কুরআন' (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে বুঝানো হচ্ছে- তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের সুমহান বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেন, কিন্তু কিছুতেই তা পারবে না। পবিত্র এ কিতাব 'পঠিত' হওয়ার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। সুতরাং দেখা যায়, আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সর্বাধিক পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ। (উলূমুল কুরআন ঃ তাকী উসমানী, পৃ. ২৪)

২. মাজদুদ্দীন ফিরূযাবাদী পবিত্র কুরআনের নামকরণের চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন-

(ক) এ গ্রন্থ বহু আয়াত ও সূরার সমষ্টি।

(খ) পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কিতাব ও সহীফাসমূহে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে তার সারসংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে,

(গ) এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনা আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার এবং সতর্কীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যথোচিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(ঘ) এ গ্রন্থ ভাষা বিশ্লষণের একটি শ্রেষ্ঠ সংকলন, তাই একে কুরআন নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফিরূযাবাদীর মতে কুরআন শব্দটি قرن (সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত) থেকে গৃহীত।

৩. আবুল হাসান আশআরী (র) সহ বেশ কয়েকজন মনীষী বলেন, "আল-কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। এদের মতে কুরআন শব্দ قرن (মিলিয়ে দেয়া) ধাতু হতে এসেছে।"

৪. বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফারবার মতে, "যেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহ একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণকারী ও সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই একে কুরআন নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর মতে কুরআন- قرائن (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিস) শব্দ থেকে এসেছে।"

৫. আল্লামা ইবনে কাসীর, ইমাম শাফিঈ (র) ও অন্যান্যদের মতে, 'আল-কুরআন' এ নামটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর নাযিল হওয়া সর্বশেষ আসমানী কিতাবের জন্যই একমাত্র নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট নাম, যা অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

৬. ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী 'কুরআন' শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, "আসমানী গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থের শিক্ষা ও সার-নির্যাস এ পবিত্র গ্রন্থে রয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলম-বিদ্যারও সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।" (আল-মুফরাদাত, পৃ. ৪০২)

পবিত্র কুরআনে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়-

وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَىْءٍ

"এ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেয়।" (সূরা ইউসুফ : ১১১)

আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে-وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

"আমি এ কিতাবকে তোমার প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে নাযিল করেছি।" (সূরা আন-নাহল : ৮৯)

তাফসীরকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, একে আল-কুরআন নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, তা পাঠ করা হয় এবং বহু আয়াত ও সূরার সংকলন। তা ছাড়া এতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনা অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের অন্যান্য নাম

আল-কুরআনের অন্যান্য প্রসিদ্ধ কয়েকটি নামের অর্থ ও তাৎপর্যসহ একটি একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

আল-ফুরকান- الفرقان (পার্থক্যকারী)

আল্লামা যারকানী (র) বলেন, ফুরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে- 'পার্থক্য ও প্রভেদকারী'। হক ও বাতিলের মধ্যে কুফর-শিরক এবং তাওহীদের মধ্যে তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনাকারী হচ্ছে এ কুরআন। তাছাড়া সত্য-মিথ্যার সীমারেখা ও মানদন্ড হচ্ছে এ কুরআন। এ কারণে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

"কতই না মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" (সূরা আল-ফুরকান : ১)

আল-কিতাব- الكتاب (মহাগ্রন্থ)

কিতাব অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এটা একটি সুলিখিত গ্রন্থ। তাই একে আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, ذٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

"এটা ঐ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা আল-বাকারা : ২)

আয-যিকর- الذ كر (স্মারক ও উপদেশ)

যিকর অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে, তাছাড়া মানুষকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই কুরআন হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনামা।

মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

"নিশ্চয় কুরআন তোমার ও তোমার জাতির জন্য সদুপদেশ।" (সূরা আয-যুখরুফ : ৪৪)

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ

"এটা কল্যাণময় উপদেশ ও স্মারক, আমি যা নাযিল করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৫০)

আত্-তানযীল- التنز يل (অবতরণকৃত)

এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর তরফ থেকে পথভোলা মানবজাতির জন্য সত্য পাথের দিশারীরূপে নাযিল হয়েছে। তাই একে 'তানযীল' বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ -

"নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া।" (সূরা আশ-শু'আরা : ১৯২)

আল-কালাম الكلام (বাণী)

কালাম শব্দের অর্থ প্রভাবিত করা ও আকৃষ্ট করা তথা বাণী। কুরআন-শ্রবণকারীর হৃদয়-মনকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে বলে একে 'আল-কালাম' বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ

"যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।" (সূরা আত-তাওবা : ৬)

আল-হুদা- الهدى (দিশা)

এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এটা সত্য পথের দিশারী ও প্রমাণ। যেমন আল্লাহর বাণী-

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَ ٱلْفُرْقَانِ

"এটা বিশ্ব মানবতার জন্য দিশারী। সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন এবং সত্য-মিথ্যার মানদন্ড।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

আন-নূর- النور (জ্যোতি-আলোকবর্তিকা)

এ জন্য বলা হয় যে, কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়, তাই একে 'নূর' বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

"আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি নাযিল করেছি।" (সূরা আন-নিসা : ১৭৪)

আশ্-শিফা- الشفاء (প্রতিষেধক)

এ জন্য এ নাম রাখা হয়েছে যে, মানবাত্মার বিভিন্ন রোগ যেমন- কুফর-শিরক, নিফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক অলসতার রোগও এর দ্বারা সারানো যায়। তাই কুরআনকে 'শিফা' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"আমি নাযিল করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ।" (সূরা বনী ইসরাইল : ৮২)

আল-মাসানী- المثانى (পুনরাবৃত্তি)

এ নামকরণের এক কারণ হচ্ছে- প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক কারণ হচ্ছে- এ গ্রন্থে ঘটনা এবং উপদেশকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এ নামের কারণ হচ্ছে কুরআন দু'বার নাযিল হয়েছে। একবার অর্থসহ, দ্বিতীয়বার অর্থ ও শব্দসহ। যেমন- আল্লাহর বাণী-

إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ "এ তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে।" (সূরা আল-আ'লা : ১৮)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ

"আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।" (সূরা আল-হিজর : ৮৭)

আস-সিরাতুল মুস্তাকীম الصراط المستقيم (সরল পথ)

কুরআনের অনুসরণ করলে সহজ ও সরলপথ পাওয়া যায় এবং জান্নাত লাভ করা যায়। এ কারণে একে জান্নাতের সরল পথ বলা হয়েছে। কুরআনে এসেছে-

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

"আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।" (সূরা আল-ফাতিহা : ৫)

আল-হিকমা- الحكمة (বিজ্ঞানময়তা)

আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। অথবা তা পুরোটাই হিকমতে পূর্ণ। তাই একে 'হিকমাহ' বলা হয়।

আল-হাকীম الحكيم (বিজ্ঞানময় গ্রন্থ)

এ নাম এ জন্যে যে, এর আয়াতসমূহ অত্যধিক সৌন্দর্যমন্ডিত, বিন্যস্ত এবং রহস্যপূর্ণ মর্ম উদ্‌ঘাটনকারী। এটা সর্বপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেন,

يسٓ . وَٱلْقُرْآنِ ٱلْحَكِيمِ -

"ইয়া-সীন, শপথ জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের।" (সূরা ইয়াসীন : ১-২)

আল-হাবলু- الحبل (রশি-রজ্জু)

যে ব্যক্তি কুরআনকে শক্ত-মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে এবং সত্য পথের সন্ধান পাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা সবাই আল্লাহর রাজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

অন্যত্র একে حبل الله المتين "আল্লাহর মজবুত রশি বলা হয়েছে।"

আর-রাহমা- (الرحمة)

পবিত্র কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর রহমত ও করুণা। তাই একে রহমাত বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"নিশ্চয় এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা আন-নামল : ৭৭)

সারকথা

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে এবং বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। এ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। লোকেরা সে সব গুণ বৈশিষ্ট্যকে এর এক এক নাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে কুরআনের মূল নাম আল-কুরআন এবং অপর নাম আল-ফুরকান। এ দুটো নামই অধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য নাম হচ্ছে গুণবাচক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. আল্লামা আবুল মা'আলী কুরআনের কয়টি নামের উল্লেখ করেন-

ক. ৫টি খ. ৫০টি
গ. ৭০ টি ঘ. ৫৫ টি

২. কুরআনের ৯০টি নামের উল্লেখ রয়েছে কোন কিতাবে?

ক. আল-বুরহান খ. ফাতহুর রহমান
গ. শরহে নাসাফী ঘ. বুখারী শরীফ

৩. কুরআন মাজীদে পবিত্র 'কুরআন' নামটি কতবার এসেছে?

ক. ৭০ বার খ. ৬৬ বার
গ. ৬১ বার ঘ. ৪ বার

৪. পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ কোনটি?

ক. আল-কুরআন খ. ইনজীল
গ. তাওরাত ঘ. যাবুর

৫. ইবনে জারীর আত-তাবারী উল্লেখিত কুরআনের প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে-

ক. কুরআন, কিতাব, যিকর ও রূহ খ. কুরআন, কিতাব, ফুরকান ও যিকর
গ. কুরআন, ফুরকান, বয়ান ও হিকমাহ ঘ. কুরআন, ফুরকান, হুদা ও বয়ান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ঘ, ২. খ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআনের নামকরণের ব্যাপারে ইবনে হাজার আল-আসকালানীর অভিমত লিখুন।
২. আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য বর্ণনায় আল্লামা তাকী উসমানীর ব্যাখ্যা লিখুন।
৩. মাজদুদ্দীন ফিরূযাবাদী কুরআনের নামকরণের কোন্ ৪টি কারণ উল্লেখ করেছেন ? তা লিখুন।
৪. কুরআনের নিম্নোক্ত নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন-

ক. আল-যিকর খ. আল-হুদা
গ. আল-মাসানী ঘ. আল-হাকীম

৬. কুরআনের অন্যসব নামকরণের তাৎপর্য কী ? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
২. আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গুণবাচক নামের তালিকা তাৎপর্যসহ লিখুন।

পাঠ-৪

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে পারবেন
- আলোচ্য বিষয়সমূহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

মানব জীবনে প্রয়োজনীয় সব কিছুই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। আবার কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো কোন কোনটি বিভিন্ন জাগতিক কর্ম তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত এবং কোন কোনটি ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত।

আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতি। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক নির্দেশনা কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো-মানব জাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার দিকে পথপ্রদর্শন করা, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং আখিরাতে সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

কুরআনের প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে-

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এ তো সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটা পথনির্দেশ।" (সূরা আল-বাকারা : ২)

আরো বলা হয়েছে-

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

"আমি তো তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" (সূরা আল-আম্বিয়া : ১০)

আরো বর্ণিত হয়েছে-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً

"অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হলো না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৯)

আরো বলা হয়েছে- هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

"এটা মানব জাতির মুক্তির দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন- إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

"এটা তো বিশ্বজগতের জন্য মুক্তির স্মারক।" (সূরা ছোয়াদ : ৮৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।" (সূরা আন-নাহল : ৮৯)

এভাবে আরো বলা হয়েছে- وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ

"এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর এতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।" (সূরা আল-আনআম : ৫৫)

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ - يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের জন্য এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চায় এর দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা আল-মায়িদা : ১৫-১৬)

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْن رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلعَزِيزِ ٱلحَمِيدِ

"এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার হতে আলোকময় জীবনে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসিত।" (সূরা ইবরাহীম : ১)

يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।" (সূরা ইউনুস : ৫৭)

মনে রাখুন

এসব আয়াতে পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় বা উদ্দেশ্য কি, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যার সারকথা হলো-

- মনাব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই হলো পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই মানব জীবনের সকল দিক নিয়েই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জাতির দুনিয়াতে চলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুরই আলোচনা কুরআনে এসেছে।
- মানুষের ব্যক্তি জীবনে এবং আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সব কিছুই কুরআনে আছে।
- মানুষের সামগ্রিক জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধ-শান্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে। মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র) পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন-

১. ইলমুল আহকাম বা সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান

এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের ইবাদত-বন্দেগী, পারস্পরিক মু'আমালাত, আচার-ব্যবহার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধ, সন্ধি, প্রভৃতি মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও বিষয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী আলোচিত হয়েছে। ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল-হারাম-মাকরূহ, মুবাহ এবং যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত। এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কুরআনে ৫০০ টি আয়াত রয়েছে।

২. ইলমুল মুখাসামা বা ন্যায়শাস্ত্র

ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এ চার শ্রেণীর পথভ্রষ্ট মানুষের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিত জ্ঞান। এ পর্যায়ে তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং মতবাদের ভ্রান্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক মতাদর্শের প্রতি জনমনে ঘৃণা জাগ্রত করা হয়েছে। এদের কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং জবাব দান করা হয়েছে।

৩. ইল্‌মুত তাযকীর-বি-আ'লা ইল্লাহ বা স্রষ্টাতত্ত্ব

বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হিসেবে মহান আল্লাহর পরিচয়, অনুগ্রহ, অবদান এবং কুদরতী নিদর্শনাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। এ পর্যায়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, সর্বোপরি স্রষ্টার সর্ববিধ গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪. ইলমুত তাযকীর-বি-আইয়্যামিল্লাহ বা সৃষ্টিতত্ত্ব

আল্লাহর সৃষ্টি-বস্তুর অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান। এ পর্যায়ে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অতীত সংঘর্ষ ও রেষা-রেষির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। সে সাথে হক ও সত্যপ্রিয়তার শুভ পরিণাম, মিথ্যা ও বাতিলের শোচনীয় পরিণতি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সত্য সম্পর্কে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে মিথ্যার জন্য সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে।

৫. ইলমুত তাযকীর বিল-মাউত বা পরকাল জ্ঞান

পবিত্র কুরআনে এ পর্যায়ে সৃষ্টি লোকের লয়, মানুষের মৃত্যু, অক্ষমতা এবং মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন-জান্নাত বা জাহান্নামের দৃশ্যের প্রত্যক্ষ বর্ণনা। রহমত ও আযাবের ফেরেশতাদের আগমন-উপস্থিতি, কিয়ামতের আলামত, হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ, দাজ্জাল-ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব, ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁকের উল্লেখ। হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান, আমলনামা, মু'মিনগণের আল্লাহর সাথে দীদার ইত্যাদির বর্ণনা। তাছাড়া আযাব ও শাস্তির নানা রকম ভীতিপ্রদ বর্ণনা। জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য ও নিয়ামতরাজির বিবরণ-এসব কিছুই রয়েছে এ পর্যায়ের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। মানব জাতিকে আত্মসচেতন ও সদাসতর্ক করার জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্যে উৎসাহিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

সারকথা

পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এ অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডারে সব কিছুরই মৌলিক বর্ণনা ও জ্ঞান আলোচিত হয়েছে। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের যাবতীয় বিষয়ের এমন পরিপূর্ণ নির্ভুল বর্ণনা আর কোথাও নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি তালিকা দেয়া যায়-

(১) আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, (২) আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের প্রমাণ, (৩) আল্লাহ তা'আলার পুতঃ পবিত্রতা, (৪) অদৃশ্য জ্ঞান (علم الغيب), (৫) শিরক, (৬) তাকওয়া, (৭) রিসালাত, (৮) রাসূলের অনুসরণ (ইতাআতে রাসূল), (৯) জিহাদ বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, (১০) সালাত, (১১) যাকাত, (১২) সাওম, (১৩) হাজ্জ, (১৪) আদল ও ইনসাফ তথা ন্যায় বিচার ও ন্যায় শাস্ত্র, (১৫) অর্থনৈতিক অসাধুতা ও দুর্নীতি তথা সুদ, (১৬) চরিত্র বা আখলাক, (১৭) অর্থনীতি, (১৮) মজলিসের শিষ্টাচার, (১০) রাসূলের সাথে আদব, (২০) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহদান ও এর মর্যাদা, (২১) বিবেক-বুদ্ধির চর্চা, (২২) কিসাস ও দিয়াত তথা দন্ডবিধি, (২৩) লুটতরাজ ও ডাকাতের শাস্তি, (২৪) চুরির শাস্তি, (২৫) অপবাদ বর্ণনার শাস্তি, (২৬) যিনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের শাস্তি, (২৭) মাপ বা ওযনে সঠিকতা, (২৮) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ।

কুরআন নাযিল হয়েছিল মানব জাতির হিদায়াতের জন্য। এর মূল বিষয়বস্তু মানুষ। মানুষের মুক্তির জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল-

ক. মানবজাতি
খ. জান্নাত-জাহান্নাম
গ. আল্লাহর কিতাব
ঘ. দুনিয়ার শান্তি

২. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়কে কতভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

ক. ৭ ভাগে
খ. ৬ ভাগে
গ. ৫ ভাগে
ঘ. ৮ ভাগে

৩. ইলমুল আহকাম মানে কী ?

ক. আইন ও বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান
খ. ফিক্‌হ সংক্রান্ত জ্ঞান
গ. রাজনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান
ঘ. সমাজ বিষয়ক আইন।

৪. আল-কুরআনে আইন ও বিধান সংক্রান্ত কতটি আয়াত রয়েছে?

ক. ৩৩ টি
খ. ৫০০ টি
গ. ১০০০ টি
ঘ. ৬০০ টি

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. গ, ৩. ক, ৪. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় কী ?
২. আল-কুরআনের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ লিখুন।
৩. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলো কয়ভাগে বিভক্ত? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

আল-কুরআনের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সর্বশ্রেষ্ঠ মার্যদাপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে বিবরণ দিতে পারবেন
- আল-কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত মহাগ্রন্থ হিসেবে প্রমাণ করতে পারবেন
- আল-কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উল্লেখ করতে পারবেন
- ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতির চূড়ান্ত মানদন্ড হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব বিচার করতে পারবেন
- অতীত আসমানী কিতাবের সারসংক্ষেপ হিসেবে কুরআনের মূল্যায়ন করতে পারবেন
- সকল চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রমাণ দিতে পারবেন
- কুরআনের ভাষা ও গুণগত মানের পর্যালোচনা করতে পারবেন
- বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কুরআনের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব বুঝাতে পারবেন
- কুরআন মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আল-কুরআনের গুরুত্ব

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অমূল্য অবদান। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা এ গ্রন্থে আলোচিত ও উপস্থাপিত হয়নি। আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণের সমন্বয় হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটা মানবের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিশারী। এ কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত। সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস এবং সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক। তাই পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অপরিসীম। এখানে আল-কুরআনের গুরুত্বের কতিপয় দিক আলোচিত হল-

সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ মহিমান্বিত আসমানী কিতাব। সর্ববিধ কল্যাণের ভান্ডার এ গ্রন্থ। কুরআন সকল দিকের বিচারেই একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। কুরআনের প্রভাব এতই গভীর যে, একে যদি কোন পর্বতের উপর নাযিল করা হত তাহলে সে পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যেত। এর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন-

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে নত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি এ দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে।" (সূরা আল-হাশর : ২১)

কুরআন অতীব মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ, এটা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত, যা পবিত্র অবস্থা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ -لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ

"নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূত:পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না।" (সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ

"তা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পুত:চরিত্র লিপিকরের হাতে লিপিবদ্ধ।"
(সূরা আবাসা : ১৩-১৬)

আল-কুরআন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার আর একটি নিদর্শন এই যে, একে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা 'আহসান' (احسن) বা সর্বোত্তম-সুন্দরতম বিশেষণে অভিহিত করেছেন এবং এতে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের অনুসরণ মানব জাতির জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে-

وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে।" (সূরা আয-যুমার : ৫৫)

আল-কুরআন মুসলিম উম্মাহর জন্য খুবই সম্মান ও গৌরবের বস্তু। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার ভাষা নিম্নরূপ-

ان لكل شئ شرفا يتبا هون به وان بهاء امتى وشر فها القران-

"মহানবী (স) বলেন, প্রত্যেক জিনিসেরই কিছু সম্মান বা গৌরবের বিষয় থাকে, সে রূপ আমার উম্মতের সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয় হল কুরআন।" (আবু-নুআয়ম: হিলওয়াতুল আউলিয়া)

মহানবী (স) আরো বলেন,

ان هذا القران حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عقد لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه-

"নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর রজ্জু, অতি উজ্জ্বল আলো এবং উপকারী মহৌষধ। যে ব্যক্তি একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য মুক্তির চুক্তিপত্র হবে এবং যে ব্যক্তি তা মেনে চলবে সে নাজাত পাবে।"

সর্বশেষ আসমানী কিতাব

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন ঐশী গ্রন্থ নাযিল হবে না। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবূর, ইনজীল নামক আরো বড় বড় তিনটি আসমানী কিতাব এবং ১০০ খানা সহীফা বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের কাছে নাযিল হয়েছিল। এগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছিল। বর্তমানে এ আসমানী কিতাবগুলো আসল ভাষা ও অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত নেই। বর্তমানের তাওরাত, যাবূর ও ইনজীল আসল নয়। আসল কিতাব বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে হতে হিব্রু এবং গ্রিক ইত্যাদি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ইংরেজি ভাষায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। বিভিন্ন বিপর্যয় এবং ইয়াহূদী-খ্রিস্টান পাদ্রীদের সুবিধামত বিকৃত করার ফলে ঐসব গ্রন্থের ওহীর আসল ভাষা ও শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য এ আল-কুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত পথনির্দেশ করবে।

এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা-

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

"এটা তো বিশ্ব জগতের জন্য স্মারক গ্রন্থ।" (সূরা ছোয়াদ : ৮৭)

চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য গ্রন্থ

অতীত যুগের সকল আসমানী গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী, জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য। আর তা ছিলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজীদ কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী-সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। এটা বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাত্মক হিদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই এটা চিরন্তন, শাশ্বত ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ। মহান আল্লাহ এ মর্মে ঘোষণা করেন-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে তিনি কোন প্রকার বক্রতা রাখেন নি।" (সূরা আল-কাহাফ : ১)

আল্লাহ আরও বলেন,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

"বল, হে মানুষ ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে।" (সূরা ইউনুস : ১০৮)

সুতরাং এসব আয়াতের মর্ম থেকে বোঝা যায়, পবিত্র কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ। এর অনুসরণ করলেই মানবজাতি পাবে মুক্তির দিশা।

পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

এ পবিত্র কুরআনই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস। পবিত্র কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ ইমারতের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে, তার সব কিছুরই মূলধারা ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বনবী এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। কাজেই কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে, জীবন দর্শনরূপে বা জীবন পথের দিশা স্বরূপ কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।" (সূরা আন-নাহল : ৮৯)

কুরআনের বাহক মহানবী (স) বলেন, ليس منا من لم يتغن بالقران "যে কুরআনকে সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে না সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।" (বুখারী)

আল-কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে জীবন বিধান হিসেবে মেনে না নিলে, তারা হয় খোদাদ্রোহী-কাফির। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।" (সূরা আল-ময়িদা : ৪৪)

চূড়ান্ত মানদন্ড

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইসলামের নীতি তথা আইন-কানুন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলীল বলে গৃহীত। এতেই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেন-

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"এ কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং বিশ্বাসীর জন্য পথনির্দেশ ও রহমাত।" (সূরা আল-জাসিয়া : ২০)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

"হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি নাযিল করেছি।" (সূরা আন-নিসা : ১৭৪)

অতীত আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার-সংক্ষেপ

অতীত নবী-রাসূলগণের দাওয়াত, হিদায়াত এবং সকল আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার-সংক্ষেপ হলো এ পবিত্র আল-কুরআন। সকল গ্রন্থের কার্যকারিতা রহিত করে দিয়ে পথভ্রষ্টতার পংকে নিমজ্জিত মানবতাকে মুক্তির প্রদীপ্ত পথ সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান দিয়ে চলছে যুগ-যুগান্তর ধরে।

আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে এ মহাগ্রন্থের বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে বলেন, এটা সেই গ্রন্থ, যা নবীদের উপর নাযিল সকল গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে। এ মহাগ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের শিক্ষা ও আদর্শের সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ

"এর পূর্বে ছিল মূসার (আ) কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এ কিতাব তার সমর্থক।" (সূরা আল-আহক্বাফ : ১২)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"তাদের বিবরণীতে বিবেকবান লোকদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য এটা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ ও রহমত।" (সূরা ইউসুফ : ১১১)

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ-نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ -بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

"নিশ্চয় এটা বিশ্ব জাহানের প্রভুর নিকট থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এটা তোমার হৃদয়ে বিশ্বস্ত ফেরেশতা জীবরাঈল অবতরণ করেছেন, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। এটা নাযিল হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।" (সূরা আশ-শুআরা: ১৯২-১৯৬)

চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ

পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ কালাম, অকাট্যভাবেই তা প্রমাণিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায়।

আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবগণ নিজেদের ভাষার সাহিত্য রস ও লালিত্য সম্পর্কে গর্ববোধ করতো। অন্য কোন ভাষাকে তারা কোন মর্যাদাই দিত না। এজন্য অনারবদের 'আজমী' বা মূক বলে অভিহিত করতো। যখন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর কুরআন অবতরণ শুরু হয়, তখন কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলংকার তাদের গর্ব-অহংকারকে ম্লান ও নিস্প্রভ করে দেয়। আল-কুরআনের বাকশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। একে আল্লাহর মহান বাণী বলে গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও জেদের বশবর্তী হয়ে একে মানুষের রচনা বলে রটাতে থাকে। একে কবিতা, যাদু ইত্যাদি বলে উপহাস করে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম নেবে, তাদের লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তো বলিষ্ঠ

অলংকারপূর্ণ ভাষার অধিকারী; তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। আল-কুরআনের এটা একটি বড় মু'জিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোন মানুষই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষ বা জিন তা পারবে না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুঁড়ে দেয়া আছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী মহল এমন কি ইয়াহূদী-খ্রিস্টান জগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআনের বিরোধীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থতার গ- ানি আনত শিরে স্বীকার করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে অকুণ্ঠ চিত্তে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে-

ليس هذا من كلام البشر

"না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়।"

অবশ্যই এ অক্ষমতার কথা কুরআন চ্যালেঞ্জ করে আগেই বলেছিল-

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাক।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ

"তারা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মত একটি সূরা রচনা করে আন।" (সূরা ইউনুস : ৩৮)

কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করে অনুরূপ কোন সূরা বা বাক্য তৈরি করতে পারেনি। কুরআনের এ অনন্যতা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, সমগ্র মানবজাতি এবং জিনজাতি একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও কুরআনের অনুরূপ একটি আয়াতও রচনা করতে পারবে না।

কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান

আল-কুরআন এক অতুলনীয়, অনুপম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাগ্রন্থ। আল-কুরআনের অত্যুচ্চ ভাব-ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ-মূর্ছনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব ঘিরে এক অতুলনীয় চিরন্তন- সাহিত্যের মানে অধিষ্ঠিত গ্রন্থ। তাই এ গ্রন্থখানি মহানবী (স)-এর শাশ্বত মু'জিযাপূর্ণ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

আল-কুরআনের এটাও একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য যে, সাহিত্যের বিচারেও আল-কুরআন মহত্তম সাহিত্য। এর তিলাওয়াতের প্রভাব এতই গভীর যে, এর দ্বারা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের হৃদয়-মন জাগ্রত হয় এবং অন্তর আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

"আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ, যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তারপর তাদের দেহ মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন, আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (সূরা আয-যুমার : ২৩)

পাশ্চাত্য পন্ডিত J. Nasih (জন নেইশ) কুরআনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন-

"মূল আরবী ভূবনে কুরআনের নিজস্ব মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও মোহনীয় শক্তি আছে। এর বাক্যরীতি সংক্ষিপ্ত ও সমুন্নত এবং এর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যসমূহ প্রায়শই সাদৃশ্যপূর্ণ, সেগুলোর প্রকাশ ক্ষমতা ও বিস্ফোরক শক্তির অধিকারী।" (The wisdom of the Quran : J. Naish)

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বড় বৈশিষ্ট্য হল-এর বাক্য, শব্দ, ভাব, ভাষা, পাঠ, উচ্চারণ খুবই সহজ সুন্দর ও সাবলীল। এটা বুঝতে, মুখস্থ করতে, মনে রাখতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। এ কারণে প্রত্যেক যুগে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ হাফিয এবং কুরআনের অসংখ্য ভাষ্যকার বিদ্যমান ছিলেন, আছেন আর কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। এটাই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার বড় পরিচায়ক।

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা

আল-কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরের হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। প্রতিটি শব্দ-বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপক যে, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসীর গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরাসি মনীষীর মন্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, "কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য শব্দকোষ, ব্যাকরণবিদগণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং আইন বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।"

আল-কুরআন এমন একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ, যাতে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা : ৩-৪)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস

সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য অপরিসীম। মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক, সৃষ্টি জগতের রহস্য, ভূতত্ত্ব, সৌর বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন, মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন-নীতিশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক দিকনির্দেশনা রয়েছে বিজ্ঞানময় এ পবিত্র কুরআনে। অফুরন্ত জ্ঞান-ভান্ডারে পরিপূর্ণ পবিত্র কুরআন সকল যুগের মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের নব নব দিগন্তের সন্ধান দিয়ে আসছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের চরম বিকাশে পবিত্র কুরআন অনুপম দিশারী। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"যাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করা হয়েছে তারা জানে, তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সত্য। এটা পরাক্রমশালী প্রশংসাই আল্লাহর পথনির্দেশ করে।" (সূরা আস-সাবা : ৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে জ্ঞানগর্ভ কিতাব, মানুষের হিদায়াত ও রহমতের উৎস হিসেবে বর্ণনা করে বলেন,

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ - هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ

"এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সত্যপরায়ণদের জন্য।" (সূরা লুকমান : ২-৩)

আল-কুরআনের বিজ্ঞানময়তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلاَفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـٰيَاتٍ لِّـأُوْلِى ٱلأَلْبَابِ - ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلاً

"নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিবসের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য, যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। তারা বলে, হে আমাদের প্রভূ! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৯০-১৯১)

সারকথা

বিশ্বমানবের চরম দূর্দিনে যখন মানবতা অবহেলিত, উপেক্ষিত এমন কি চরম অপমানিত ও নির্যাতিত। মানবতার ফরিয়াদ শ্রবণের জন্য যখন বিশ্বের বুকে কেউ ছিল না, জড়বাদ, বস্তুবাদ এবং ভোগবাদের গোলক ধাঁধায় যখন সকলেই দিশেহারা, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও আত্মবিস্মৃত, মানব জাতির এমন সংকটময় মুহূর্তে বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন তথা সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের করুণা স্বরূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়। ফলে বিপন্ন এবং অসহায় মানবতা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায়।

মূলত মানব জাতির ইতিহাস পরিবর্তনে, মানবতার পূর্ণ বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে পবিত্র কুরআনের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কুরআন মানুষের চিন্তা ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। ব্যক্তিগত, সমাজগত জীবনে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে এককথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। আর এ মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)। আর তাঁর সংবিধান হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

কুরআন আঁধার আকাশে উজ্জ্বল সূর্যরূপে নাযিল হলো। মানব জাতি সে আলোক ধারায় স্নাত হয়ে বিশ্ব প্রকৃতিকে চোখ মেলে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলো ও জানলো। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতার অশান্ত এ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বকে প্রকৃত শান্তির পথে পরিচালনা করতে পারে আল্লাহর এ অমর কিতাব আল-কুরআন। মানব জীবনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. পবিত্র কুরআন কোথায় সুরক্ষিত আছে?

ক. আসমানে
খ. মক্কা-মদীনায়
গ. মসজিদ-মাদ্রাসায়
ঘ. লাওহে মাহফুযে

২. 'কুরআন মাজীদ পবিত্র অবস্থা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না'- এটা কার বাণী?

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর
খ. হযরত উমর (রা)-এর
গ. মহান আল্লাহর
ঘ. হাদীসের বাণী

৩. সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোনটি ?

ক. বুখারী শরীফ
খ. ইনজীল
গ. বাইবেল
ঘ. আল-কুরআন

৪. অতীত আসমানী কিতাবের আসল ভাষা এখনও কি ?

ক. বিলুপ্ত হয়ে গেছে
খ. জাদুঘরে সুরক্ষিত আছে
গ. বিকৃত হয়েছে
ঘ. আসলরূপে আছে

৫. কুরআন কা'দের জন্যে নাযিল হয়েছে ?

ক. আরববাসীদের জন্যে
খ. মুসলমানদের জন্যে
গ. মুত্তাকীদের জন্যে
ঘ. সমগ্র মানব জাতির জন্যে

৬. ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রধান উৎস কী ?

ক. আল-কুরআন
খ. আল-হাদীস
গ. গণতন্ত্র
ঘ. ইজমায়ে উম্মাত

৭. 'না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়'-এটি কার কথা?

ক. রাসূলের
খ. কুরআন বিরোধীদের কথা
গ. সাহাবীদের
ঘ. হাদীসের

৮. 'কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্যে একটি বিজ্ঞান সংস্থা'-একথা কে বলেছেন ?

ক. পাশ্চাত্য পন্ডিত জন নেইশ
খ. আল্লামা ইকবাল
গ. একজন ফরাসি কবি
ঘ. হযরত আলী (রা)

৯. বর্তমান অশান্ত বিশ্বকে প্রকৃত শান্তির পথে পরিচালনা করতে পারে-

ক. আল-কুরআন
খ. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা
গ. আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা
ঘ. নতুন বিশ্বব্যবস্থা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১.ঘ, ২.গ, ৩.ঘ, ৪.গ, ৫.ঘ, ৬.ক, ৭.খ, ৮.ক, ৯.ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে আল-কুরআনের গুরুত্ব তুলে ধরুন।
৩. "আল-কুরআন একটি চিরন্তন ও শাশ্বত মহাগ্রন্থ" ব্যাখ্যা করুন।
৪. "আল-কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা" আলোচনা করুন।
৫. "আল-কুরআন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতির চূড়ান্ত মানদন্ড" পর্যালোচনা করুন।
৬. "পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সকল শিক্ষার সারসংক্ষেপ পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে" এ কথার প্রমাণ দিন।
৭. সকল চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব লিখুন।
৮. আল-কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান আলোচনা করুন।
৯. কুরআন মাজীদের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা নিরূপণ করুন।
১০. জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে আল-কুরআনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. আল-কুরআন একটি চিরন্তন শাশ্বত মহাগ্রন্থ এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ করুন।
৩. সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৬

আল-কুরআন নাযিল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- আল-কুরআন কিভাবে এবং কখন নাযিল হয় তার বিবরণ দিতে পারবেন
- আল-কুরআন নাযিলের পর্যায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- আল-কুরআন নাযিলের সময়কাল ও স্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে পারবেন
- আল-কুরআন খন্ডাকারে নাযিলের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আল-কুরআন নাযিল

আমরা জানি, নুযূলুল কুরআন অর্থ কুরআনের অবতরণ। কুরআনের অবতরণ সম্পর্কিত আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল-কুরআন বিশ্ববাসীর কাছে একদিনে বা এক সঙ্গে নাযিল হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতী জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে একটু একটু ও অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। মহানবী (স)-এর পরিচালিত সমাজ বিপ্লবের দাওয়াত এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ও বিভিন্ন উপলক্ষে কুরআন নাযিল হয়েছিল। একই সময়ে একটি গ্রন্থাকারে তা নাযিল না হওয়ার কারণ ও তাৎপর্য অনেক। অল্প অল্প ও বিভিন্ন সময়ে নাযিল হওয়ার কারণে কুরআন মাজীদ মুখস্থ ও আয়ত্ত করা রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীদের পক্ষে খুবই সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছিল। এর ফলে কুরআন অনুধাবন ও তার আইন-কানুন, বিধি-বিধান পালন, অনুসরণ ও বাস্তবায়ণ সহজ হয়েছিল। সর্বপ্রথম কুরআন নাযিল হয়েছিল ৬০৯ খ্রিস্টাব্দের রমযান মাসের ১৭ বা ২৭ তারিখ শবে কদরে। এ সময় তিনি মক্কার অদূরে হেরা গুহায় আল্লাহর ইবাদতে গভীরভাবে ধ্যান মগ্ন ছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। এ সময় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। এর পর কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ ক্রমাগত নাযিল হতে থাকে এবং তা চলতে থাকে মহানবী (স)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত। এ সময় রাসূলের (স) বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আল-কুরআন নাযিলের পর্যায়

কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার আরশে আযীমে লাওহে মাহফূযে (لوح محفوظ) সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

"এতো সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরূজ : ২১-২২)

কুরআন মাজীদ লাওহে মাহ্ফুজে কখন, কি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে তা আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক জানেন।

সেখান থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) -এর নিকট দু'টো পর্যায়ে তা নাযিল হয়।

প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহর আরশে আযীমে অবস্থিত 'লাওহে মাহফূয' বা 'সুরক্ষিত ফলক' হতে সম্পূর্ণ কুরআন একই সাথে রমযান মাসের মহিমান্বিত (ক্বদর) রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানের তথা বায়তুল ইয্যাতে নাযিল হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ نُزِّلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ

"রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

সূরা আদ-দুখানে বলা হয়েছে-

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

"আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী।" (সূরা আদ-দুখান : ৩)

সূরা আল-কদরে বলা হয়েছে - إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।" (সূরা আল-কদর : ১)
কদর রজনীতে কুরআন নাযিল হয়েছে একথাটির তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে-

১. লাওহে মাহফূয হতে সম্পূর্ণ কুরআন কদরের রাতে দুনিয়ার সংলগ্ন আকাশে নাযিল হয়েছে এবং সেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরে মহানবী (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে।

২. এ কুরআনের এক একটি অংশ প্রতি বছর কদরের রাতে দুনিয়ার নিকটতম আকাশে নাযিল হয়েছে। আর সেখানে থেকে প্রয়োজন অনুসারে সুদীর্ঘ ২৩ বছর রাসূলের (স) প্রতি নাযিল হওয়া অব্যাহত থাকে।

৩. কদরের রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। এরপর যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখনই প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে। শেষোক্ত ব্যাখ্যা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে মনে করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন, "লাওহে মাহফূয থেকে কুরআনকে পৃথিবীর আকাশে বায়তুল ইয্যাতে রাখা হয়। অতপর জিবরাঈল (আ) ক্রমশ তা রাসূলের (স) প্রতি নাযিল করতে থাকেন।" (ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বায়হাকী, নাসাঈ ও তাবরানীতে বর্ণিত হয়েছে।)

দ্বিতীয় পর্যায়
দ্বিতীয় পর্যায়ে দুনিয়ার আকাশের বায়তুল ইয্যাত থেকে মহানবীর (স) প্রতি জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে ওহীযোগে প্রয়োজন মত কুরআনের আয়াত ও খন্ড খন্ড সূরা নবী জীবনের ২৩ বছরকাল ব্যাপী নাযিল হয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা-

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

"আমি কুরআন নাযিল করেছি খন্ড খন্ড ভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা ক্রমশ নাযিল করেছি।" (সূরা বনী ইসরাইল : ১০৬)

আল্লাহ তাআলা আরও ঘোষণা করেন-

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

"কাফিরগণ বলে, সমগ্র কুরআন তার উপর একবার নাযিল হল না কেন? এভাবেই আমি নাযিল করেছি তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবূত করবার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।" (সূরা আল-ফুরকান : ৩২)

হযরত মুহাম্মদ (স) -এর উপর কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল হওয়ার কারণে কাফির ও ইয়াহূদীরা প্রশ্ন তুলেছিল। হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় "তিনি বলেন, একদা ইয়াহূদীরা বলল, হে আবুল কাসিম! সম্পূর্ণ কুরআন কেন একত্রিতভাবে নাযিল হল না যেমন তাওরাত মূসা (আ)-এর উপর একসঙ্গে নাযিল হয়েছিল? ইয়াহূদীদের এ অভিযোগের জবাবে উপরে উল্লেখিত আয়াত দু'টো নাযিল হয়।" (ইমাম সূয়ূতী : আল-ইতকান, ১ম খন্ড)

খন্ডাকারে কুরআন নাযিলের তাৎপর্য

কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর খন্ডাকারে নাযিল হওয়ার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তাফসীরকারগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে সব তাৎপর্যের কথা বিশ্লেষণ করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল-

১. ইসলাম বিরোধী-কাফির-মুশরিকদের বিভিন্নমুখী নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের মোকাবেলায় নবীর হৃদয়-মনকে দৃঢ় ও প্রশান্ত রাখা।

২. পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গে নাযিল হলে তা বহন করা কোমল হৃদয় সত্তার অধিকারী নবীর জন্য কষ্টসাধ্য হতো।

৩. শরীআতের বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী পর্যায়ক্রমে জারি করা ও পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করার জন্য।

৪. কুরআন মাজীদ হিফয করা, উপলব্ধি করা এবং সে অনুসারে জীবন গঠন করা যাতে সহজ সাধ্য হয়।

৫. সমাজ বিপ্লবের লক্ষে সংঘটিত বিভিন্ন বিবরণ পেশ করা এবং এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমগণকে সতর্ক করা। তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করা।

৬. উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা।

৭. আল-কুরআন যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, মানুষের অন্তরে এ সত্যটি বদ্ধমূল করা। বস্তুত এসব তাৎপর্য ও হিকমতের কারণেই পবিত্র কুরআন একসঙ্গে নাযিল না হয়ে ২৩ বছর ব্যাপী খন্ডাকারে নাযিল হয়।

কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত

সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন ওহী হিসেবে নাযিলের সূচনা সম্পর্কে বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন-

اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصا لحة فى النوم

"মহানবীর (স) প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী অবতরণের সূচনা হয়েছিল- ।" অতপর তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি হেরা পর্বতের একটি গুহায় রাতের পর রাত ইবাদতে ধ্যানমগ্ন থাকেন। এমতাবস্থায় একদা হযরত জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে তাঁর নিকট সূরা 'আলাকের' প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। জিবরাঈল (আ) মহানবীর (স) নিকট এসে বললেন, পড়ুন ! তিনি বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" মহানবী (স) বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে চেপে ধরলেন, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন! আমি আবার বললাম, "আমি পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে- যিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন।" (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩)

অতপর মহানবী (স) কম্পিত হৃদয়ে ঘরে ফিরে বিস্তারিত ঘটনা পত্নী "খাদীজাতুল কুবরা (রা)"কে বললেন। খাদীজা (রা) সবকিছু শুনে হযরতকে (স) সান্ত্বনা প্রদান করে স্বীয় চাচাতো ভাই ধর্ম বিশেষজ্ঞ "ওয়ারাকা ইবনে নওফেল" -এর নিকট নিয়ে যান। 'ওয়ারাকা' সবকিছু শুনে বললেন: ভয় নেই, মূসার (আ) কাছে আল্লাহ যে নামূসকে পাঠিয়েছিলেন, এ সেই নামূস অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা। আপনিই প্রতিশ্রুত শেষ নবী। আমি বেঁচে থাকলে আপনার সমর্থন করতাম। ওয়ারাকার কথায় নবী করীম (স) ও খাদীজা (রা) আশ্বস্ত হলেন।"

বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) স্বরূপে এ ওহী নিয়ে এসেছিলেন। জিবরাঈল (আ) যখন এ ওহী নিয়ে আসেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন হেরা গিরি গুহায় অবস্থান করছিলেন।

এ ঘটনার পর তিন বছর পর্যন্ত সরাসরি আর কোন ওহী নাযিল হয়নি। তিন বছর বা কারো মতে, আড়াই বছর পর আবার ওহী নাযিল শুরু হয় এবং সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পরিপূর্ণ কুরআন অবতরণ হওয়া সুসম্পন্ন হয়। ওহী বিরতি

কালকে ফাতরাত (فترة) নামে অভিহিত করা হয়। বিরতির উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম ওহী নাযিলের ফলে নবীর (স) মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে প্রভাব পড়েছিল, তা স্বাভাবিক করা। ফলে ধীরে ধীরে তিনি তা সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করবেন। এ সময়ে ওহী আসা বন্ধ থাকলে মহানবী (স) চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে আকাশের দিকে তাকাতেন এজন্য যে, কোথাও জিবরাঈল (আ)-কে দেখতে পাবেন অথবা কোন প্রকার আওয়াজ শুনতে পাবেন। পরিশেষে একদিন এমন ঘটনা হয়, তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন আর জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে এসে বললেন-

يا محمد انك رسول الله حقا "হে মুহাম্মদ ! আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।"

এ কথা শুনে মহানবী (স)-এর মন শান্ত হল এবং তিনি ফিরে এলেন। এর কিছু দিন পর আবার তিনি হেরা পর্বতের কাছে গেলে তিনি দেখতে পান হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আসনে বসে আছেন। মহানবী (সা) তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং বললেন- دثرونى دثرونى "আমাকে কম্বল দিয়ে আচ্ছাদিত করে দাও।" এমতাবস্থায় সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ قُمۡ فَأَنذِرۡ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি! উঠো, সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।" (সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির : ১-৩)

এরপর নিয়মিতভাবে ওহী নাযিল শুরু হয় এবং মহানবীর (স) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পবিত্র কুরআন ও ইসলামের পরিপূর্ণতা এবং পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে দশম হিজরিতে বিদায় হাজ্জের সময় মহান আল্লাহ বাণী নাযিল করেন-

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

এরপর বিধান সম্বলিত তথা হালাল-হারাম সংক্রান্ত কোন আয়াত আর নাযিল হয়নি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনায় দেখা যায়, সর্বশেষ ওহী নাযিল হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্‌র (স) ইনতিকালের সাত দিন আগে। তা হল-

وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

"তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোন রূপ অন্যায় করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারা : ২৮১)

অপর একটি বর্ণনায় আছে, সর্বশেষ ওহী ছিল সূরা আন-নাসর-

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।" (সূরা আন-নাসর : ১)

সারকথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কুরআন খন্ডাকারে সুদীর্ঘ ২৩ বছর সময়কাল ব্যাপী পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। আর তা সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশক্রমে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে বিন্যাস করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. কত খ্রিস্টাব্দে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়-

ক. ৬০৯ খ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে
গ. ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ৬৯০ খ্রিস্টাব্দে

২. কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয় ?

ক. ২৫ বছর খ. ২৩ বছর
গ. ২৭ বছর ঘ. ১৩ বছর

৩. কুরআন কীভাবে নাযিল হয়েছিল?

ক. খন্ডাকারে খ. কিতাব আকারে
গ. গ্রন্থাবদ্ধ অবস্থায় ঘ. সহীফা আকারে

৪. সর্বপ্রথম কোন সূরার কত আয়াত নাযিল হয় ?

ক. সূরা মুয্যাম্মিলের পাঁচ আয়াত খ. সূরা মুদ্দাসসিরের পাঁচ আয়াত
গ. সূরা ফাতিহার সাত আয়াত ঘ. সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১.ক, ২.খ, ৩.ক, ৪.ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআন গ্রন্থাকারে এক সঙ্গে নাযিল হয়নি কেন?
২. কুরআন নাযিলের পর্যায় ও পদ্ধতি লিখুন।
৩. কুরআন নাযিলের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।
৪. ফাত্‌রাতুল ওহী (فترة الوحى) বলতে কী বোঝায় ?
৫. কুরআনের সর্বশেষ আয়াত কোনটি ? এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতামত লিখুন।
৬. খন্ডাকারে কুরআন নাযিলের তাৎপর্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন নাযিলের পর্যায় ও পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. কুরআন কেন খন্ডাকারে নাযিল হয়েছিল ? বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৭

আল-কুরআন সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুরআন সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন
- কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- কুরআন সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে পারবেন।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন এবং তিনিই স্বয়ং এ কিতাবের সংরক্ষণকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।" (সূরা আল-কিয়ামাহ : ১৭)

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ - فِى كِتَابٍ مَّكْنُونٍ - لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ

"অবশ্যই এটা সম্মানিত কুরআন, যা লিখিত আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত:পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না।" (সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯)

অপরদিকে মহানবীর (স) আমলে-তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং সকল যুগেই এর সুসংরক্ষণের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে আসছে। বর্তমানে আমাদের কাছে যে কুরআন শরীফ রয়েছে, তা হুবহু সেই গ্রন্থ, যা আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর উপর নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যেভাবে একে নিজের সামনে অন্যদের দ্বারা লিখিয়েছিলেন, যেভাবে সাহাবীগণকে হিফয করিয়েছিলেন, তিনি নিজে পাঠ করেছিলেন এবং সাহাবীগণকে পাঠের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই অবস্থায় এবং সেই বিন্যাসেই এখনো তা বিদ্যমান রয়েছে। এর বিন্যাসে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি, কোরূপ কমবেশি হয়নি। কোন বর্ণ বা বাক্যেও কোন প্রকার রদবদল ঘটেনি। স্বয়ং পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলের (স) হাদীসে এর সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

فَى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ - مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ

"এটা সংরক্ষিত আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পূত-চরিত্র লিপিকরদের হাতে লিখিত।" (সূরা আবাসা : ১৩-১৬)

আর তাই আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত আসমানীগ্রন্থ হিসেবে চির ভাস্বর ও দেদীপ্যমান অবস্থায় আছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমিই কুরআনকে নাযিল করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষণকারী।" (সূরা আল-হিজর : ৯)

কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন মাজীদ প্রধানত দু'টি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়-

১. স্মৃতি ভান্ডারে তথা মুখস্থকরণের মাধ্যমে বক্ষে ধারণ করে সংরক্ষণ

অন্য আসমানী গ্রন্থাবলীর তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য কলম ও কাগজের তুলনায় অধিক নির্ভর করা হয় স্মৃতিভান্ডার তথা হাফিযদের স্মরণ শক্তির উপর। হৃদয়ে ধারণের ব্যাপারে

আল্লাহ পাক বলেন,

بَلْهُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِى صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ

"বরং যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।" (সূরা আল-আনকাবুত : ৪৯)

হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে বলা হয়েছে- ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء

"আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাকে পানিও মুছে ফেলতে পারবে না।" (সহীহ্ মুসলিম)

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্তেই ওহী লেখক দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এ ধারা পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিপিবদ্ধ আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে।

পবিত্র কুরআন লিখন ও সংগ্রহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ও প্রামাণ্য বিবরণ আছে। মহানবী (স)-এর সময়ে কাগজ ও মুদ্রণ শিল্প সহজ ছিল না। মানুষ বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখে রাখত। কাগজ পাওয়া গেলে তখন তাতেই লেখা হতো। তাছাড়া খেজুর পাতায়, বিভিন্ন কাঠের ফলক, উটের চেপটা হাড়, পাতলা চামড়া বা গাছের বাকলের উপর লোখ হতো। এছাড়া পাথর বা কাপড়কেও লোখার কাজে ব্যবহার করা হতো। কুরআন লেখার কাজেও লোকেরা এসব জিনিস ব্যবহার করতো। যখন যা সামনে পাওয়া যেত, কুরআন নাযিলের পর তাতেই তা লিকে রাখা হতো এবং সাহাবীগণকে তা মুখস্থ করানো হতো। এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে-

وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ - فِى رَقٍّ مَّنْشُورٍ

"শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে উন্মুক্ত পত্রে।" (সূরা আত-তুর : ২-৩)

লিসানুল আরব ও কামুস অভিধানে আছে, رق এমন পাতলা চামড়াকে বলা হয়, যাতে লেখা যায়।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে আছে-

انما كان فى اللاديم اولا قبل ان يجمع فى عهد ابى بكر . ثم جمع ابوبكر القران فى قراطيس

"হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালের সংগ্রহের পূর্বে প্রথমত চামড়ার টুকরায় লিখে রাখা হতো। পরবর্তীতে হযরত আবু বকরের (রা) সময় আরবে কাগজের প্রচলন হয় এবং তিনি সম্পূর্ণ কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।" (মুআত্তা)

এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী হলো-

رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً - فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

"আল্লাহর নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ, যাতে আছে সঠিক বিধান।" (সূরা আল-বায়্যিনাহ: ২-৩)

এ থেকে বুঝা যায়, মহানবী (স) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং পবিত্র কুরআন পাক-পবিত্র ও উত্তম কাগজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফাতহুল বারী গ্রন্থের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য। "আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বলেছেন, পবিত্র কুরআন যথারীতি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে।"

নিম্নের আয়াত থেকেও বুঝা যায় কুরআন লিখিত ছিল-

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

"তারা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এ গুলো সকাল-সন্ধ্যা তাঁর নিকট পাঠ করা হয়।" (সূরা আল-ফুরকান : ৫)

এতে প্রমাণিত হয়, অবিশ্বাসীরাও এ ব্যাপারে জানত যে, কুরআন লিখিত আকারে সংরক্ষিত এবং গ্রন্থাকারে রয়েছে। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় দেখা যায় তিনি তাঁর ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে কুরআনের লিখিত কপি লুকাতে দেখে বলেন, اعطونى الكتاب الذى عندكم اقرأه

"তোমাদের কাছে লিখিত যে অংশটুকু আছে, তা আমাকে দাও আমি তা পাঠ করবো।"

আবু দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

كان النبى صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الايت فيدعو بعض من يكتب له ويقول له - ضع هذه الاية فى السورة التى يذكر فيها كذا او كذا-

"মহানবী (স)-এর উপর যখন কোন আয়াত নাযিল হতো, তখন তিনি কোন ওহী লেখককে ডেকে পাঠাতেন এবং আয়াতটি কোন সূরায় রাখা হবে, তিনি নিজে তা বলে দিতেন।"

হাদীসের আরো অনেক প্রামাণ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হতো, তখনই তা লিখিয়ে নিতেন এবং কোন আয়াত কোন সূরায় কোথায় হবে তার বিন্যাস পদ্ধতিও বলে দিতেন। এ কাজটি তিনি ওহীর মাধ্যমে জেনে করতেন। কাজেই কুরআন লিখন-বিন্যাস কারো গবেষণার ফসল নয়। 'আল-বুরহান' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

كتابة القران ليست محدثة فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته

"কুরআন লিখন কোন নতুন ব্যাপার নয়, রাসূল (স) নিজে কুরআন লেখার নির্দেশ দিতেন।"

কুরআন সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে মনীষী হাকিম স্বীয় গ্রন্থ 'মুস্তাদরাকে' উল্লেখ করেছেন, কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের তিনটি পর্যায় দেখা যায়-

প্রথম পর্যায় ঃ মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ ছিল নিম্নরূপ-

কুরআন কণ্ঠস্থকরণ

কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে মহানবী (স) কণ্ঠস্থ করে নিতেন এবং তা জিবরাঈল (আ)-কে হুবহু শুনাতেন। সাথে সাথে সাহাবীদেরকেও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতি ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন। কুরআনুল কারীম মুখস্থ করাকে অশেষ সাওয়াবের ও ফযীলতের কাজ বলে বিশ্বাস করতেন। যার ফলে মুসলমানগণের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করার নীতি আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। মহানবীর (সা) সময়ে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করার কথা পবিত্র কুরআনেও আছে।

ওহী নাযিলের প্রথম পর্যায়ে নবী করীম (স) কুরআনের আয়াতগুলো সাথে সাথে দ্রুত পাঠ করতে থাকতেন, যাতে সেগুলো অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রিয়নবী (স)-এর ব্যস্ততা দেখে আল্লাহ পাক বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

"তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করো না। এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো।" (সূরা আল-কিয়ামা : ১৬-১৮)

উল্লেখ্য, সে সময়ে আরব জাতির স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ ও বিস্ময়কর। এ স্মরণ শক্তি ছিল তাদের স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত বিষয়। ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও প্রতিভা ও স্মরণ শক্তি আরো প্রখর

হয়ে ওঠে। তাঁদের এ অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিপুলভাবে বেড়ে যায়। বিশেষত কল্যাণ ও মুক্তির সনদ কুরআন ও হাদীস মুখস্থ রাখার অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর ক্ষমতা লাভ করেন তাঁরা। (মানাহিলুল ইরফান- ১ম খন্ড)

বস্তুত নবী যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে আরবদের এ স্মরণ শক্তিকে বেশি কাজে লাগানো হয়েছে। এর ফলে সাহাবীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক লোক কুরআনের হাফিয ছিলেন। 'হাফিযে কুরআন' সাহাবীদের কণ্ঠে কুরআনের বাণী সর্বদা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকত। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগে সকল দেশে পৃথিবীতে হাজার হাজার কুরআনের হাফিয বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনো আছেন।

পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ

অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স) প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরাঈলের (আ) সাথে 'কুরআনের তাদারোছ' পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীদেরকে শুনাতেন আর সাহাবীগণও তাঁকে শুনাতেন। এ কারণে কুরআনে কোন ভুল-ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদান

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং শিক্ষাদানের অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। আর এ আগ্রহকে তাঁরা চরমভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। প্রত্যেকেই এ নেক কাজের প্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। পবিত্র কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে হাজার হাজার সাহাবী সকল মগ্নতা ত্যাগ করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিয়মিত রাত জেগে তারা নফল নামাযে তিলাওয়াত করতেন। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা - يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ آنَاءَ ٱللَّيْلِ তারা রাতে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১৩)

মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই মদীনায় নয়টি মসজিদ কায়েম হয়েছিল। সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়াও বহু সাহাবী মানুষকে কুরআন শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিলা বিয়ের মহরানা স্বরূপ স্বামীর নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণের দাবি জানাতেন। বস্তুত এভাবে পারস্পরিক ব্যাপক চর্চা, তালীম ও শিক্ষাদানের বিপুল আগ্রহ ও তাৎপরতার দ্বারা কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে।

সূরা মুয্যাম্মিলের আয়ত থেকে বুঝা যায়-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ

"তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল : ২০)

তাছাড়া সাহাবীগণের বিরাট অংশ কুরআনের চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন দাওয়াতী মিশন নিয়ে বিভিন্ন জনপদে গিয়ে কুরআনের ব্যাপক শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। 'আসহাবে সুফ্ফা' মসজিদে নববীর আবাসিক বিদ্যালয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তত্ত্বাবধানে এবং বড় বড় সাহাবীদের নেতৃত্বে কুরআনের উচ্চতর চর্চা ও গবেষণা করতেন। মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কুরআন শিক্ষাদান ও তিলাওয়াতের আওয়াজ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, অবশেষে মহানবী (স)-কে নির্দেশ প্রদান করতে হয়েছিল যে, সবাই যেন আরো আস্তে কুরআন পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তিলাওয়াতের মধ্য থেকে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। (মানাহিলুল ইরফান, খ. ১, পৃ. ২৩৪)

আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের বক্তব্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়-

ان الا نصار يعلمو ننا كتاب ربنا وسنة نبينا

"আনসারগণ আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের শিক্ষা দান করেন।" (উলূমুল হাদীস : ১৭)

কুরআনের বাস্তব আমল

মহানবী (স)-এর যুগ কুরআনকে মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং মহানবী (স) স্বয়ং নিজে এবং সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী আমল ও বাস্তব জীবনে রূপায়িত করারও আন্তরিক চেষ্টা করতেন। ফলে কুরআনের প্রতিটি কথা, আদেশ ও ফরমান সাহাবীগণ কর্তৃক কার্যকর ও বাস্তবে রূপায়িত হতো। আর নবীজীকে বলা হত জীবন্ত কুরআন।

লেখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ

মহানবী (স)-এর যুগেই রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুচারুরূপে "ওহী লিখন দফতর"-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখন কার্যটি সুসম্পন্ন হয়। ওহী লিখন দফতরের সদস্য সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ জন। (তাদভীনে কুরআন)

ওহী লেখকগণ সর্বদা লেখার উপকরণসহ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চারপাশে অবস্থান করতেন। কুরআনের কোন অংশ যখনই নাযিল হত, মহানবী (স) তা তখনই লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কুরআন লিখনের কাজে যেন কোন প্রকার শিথীলতা না আসে সে জন্য তিনি সাময়িকভাবে হাদীস লিখনের কাজ বন্ধ করে দিলেন। ওহী লিখন দফতরের প্রধান সচিব ছিলেন সাহাবী যায়দ ইবনে সাবিত (রা)। তবে এ সময় পূর্ণ কুরআন একই নুসখা বা পান্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

কুরআন লিখনের উপকরণ

মহানবী যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ প্রধানত গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফোম বস্ত্র, তখনকার মতো আবিস্কৃত এক প্রকার কাগজ।

কুরআনের সুবিন্যস্ততা

যদিও কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় নাযিল হয় এবং তা বিভিন্নভাবে লিখিত হয়, তবুও তা ছিল সুবিন্যস্ত। কোন সূরার নামকরণ, তারতীব, কোন আয়াত সূরার কোথায় বসবে সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম খলীফার যুগে কুরআন সংরক্ষণ

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের যেসব পান্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিলন, তা একই গ্রন্থে ছিল না; বরং বিভিন্ন বস্তুর উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছিল।

এদিকে মহানবীর তিরোধানের ফলে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক পর্বে ইসলাম বিরোধী চক্র ও ভন্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয শাহাদাতবরণ করেন। সুতরাং হযরত উমর (রা) কুরআন একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করলে হযরত আবূ বকর (রা) তা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেন। 'যায়দ ইবনে সাবিত'-কে প্রধান সচিব করে 'কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন' গঠন করেন। এভাবে কুরআনের প্রামাণ্য পান্ডুলিপি পুস্তকাকারে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় খলীফার আমলে কুরআন সংরক্ষণ

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআন পঠনে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয় এবং বিভিন্ন আরবী উপভাষায় কুরআন পড়ার অনুমতি থাকায় মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে কুরআন পঠনে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এ

অবস্থা অবলোকন করে হযরত উসমান (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যায়দ ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি মূল পান্ডুলিপির অনুকরণে একই পঠন রীতিতে কুরআনের "মাসহাফ" তৈরি করেন, যা মাসহাফে উসমানী নামে প্রসিদ্ধ। তার অনুলিপি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণের সমস্ত অংশ বা কপি যার কাছে যা ছিল, তা তলব করে নেওয়া হয় এবং তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত হয়।

চতুর্থ পর্যায়

পরবর্তীকালে কুরআনের সংরক্ষণ

পরবর্তীকালে কুরআনের পাঠ সহজতর করার জন্য হরকত সংযোজন করেন 'হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ'। তারপর থেকে কুরআনে আর কোন কিছু অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়নি। সে থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন হাফিযদের স্মৃতি ভান্ডার এবং মুদ্রণ ও লিপিবদ্ধ আকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

সারকথা

বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য অবদান হচ্ছে পবিত্র আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর হিফাজতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরপক্ষে মহানবীর (সা) আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এর লিপিবদ্ধ করণের কাজ চলতে থাকে। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলে কুরআনের গ্রন্থায়ন কর্ম চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

কুরআনের সংরক্ষণ মহানবীর (স) যুগ হতে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সুচারুরূপে ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে চলে আসছে। তাই আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত ঐশীগ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. আল-কুরআন সর্বপ্রথম কখন লেখা হয় ?

ক. সাহাবীগণের যুগে
খ. মহানবী (স)-এর যুগে
গ. হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে
ঘ. ১০০ হিজরী সালে।

২. কুরআন সংরক্ষণের কয়টি পর্যায়ের কথা উল্লেখ আছে ?

ক. ৫ টি
খ. ৪ টি
গ. ৩ টি
ঘ. ২ টি

৩. বিশ্ব মানবের মুক্তির সনদ কি ?

ক. আল-কুরআন
খ. আল-হাদীস
গ. নবী-রাসূল
ঘ. জিবরাঈল (আ)

৪. জীবন্ত কুরআন কে ছিলেন ?

ক. হযরত আবু বকর (রা)
খ. হযরত মুহাম্মদ (স)
গ. হযরত উসমান
ঘ. হযরত আয়েশা (রা)

৫. আল-কুরআনে হরকত সংযোজন করেন-

ক. মহানবী (স)
খ. হযরত উমর (রা)
গ. ইমাম আবু হানীফা (র)
ঘ. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১.খ, ২.খ, ৩.ক, ৪.খ, ৫.ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ان علينا جمعه وقرانه 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই' ব্যাখ্যা করুন।
২. কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো কী কী? বর্ণনা করুন।
৩. কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি ও ইতিহাস বর্ণনা করুন।

পাঠ-৮

আল-কুরআন গ্রন্থায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- কুরআন কিভাবে গ্রন্থবদ্ধ হয় তার বিবরণ দিতে পারবেন
- মহানবী (র)-এর আমলে কিভাবে কুরআনে গ্রন্থবদ্ধ হয় তার প্রমাণ দিতে পারবেন
- হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে কুরআন গ্রন্থায়নের বর্ণনা দিতে পারবেন
- হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কার কুরআনের পান্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন
- হযরত উসমান (রা)-এর আমলে একই পঠনরীতিতে কুরআন গ্রন্থায়নের বিবরণ দিতে পারবেন
- কোন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে হযরত উসমান (রা) কুরআন গ্রন্থায়ন করেছিলেন, তার প্রমাণ দিতে পারবেন।

আল-কুরআনের গ্রন্থায়ন

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়নের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ তিনবার সংকলিত হয়েছে। যেমন-

১. প্রথমবার হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের আমলে
২. দ্বিতীয়বার প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) সময়ে
৩. তৃতীয়বার তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে।

মহানবী (স)-এর আমলে

মহানবী (স)-এর আমলে তথা কুরআনের ওহী নাযিল হওয়াকালীন সময়ে পবিত্র কুরআনকে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপদান করা সম্ভব হয়নি। কেননা তখনও ক্রমাগতভাবে কুরআন নাযিল হচ্ছিল। এ সময় কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো। ওহী লেখকদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। তাঁরা পালাক্রমে রাসূলের (স) কাছে থাকতেন এবং যখন যা নাযিল হতো, তা লিখে রাখতেন।

কুরআন ও হাদীসের অগণিত বর্ণনা থেকে এর প্রমাণ মেলে। হযরত আলী (রা) বলেন,

ان القران كان مجموعا مؤلفا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم

"রাসূলুল্লাহ্‌র (স) সময়েও কুরআনের সংগৃহীত, সংকলিত ও লিখিত পান্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল।"

ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন-

انما الف القران على ما كانوا يسمعونه من النبى صلى الله عليه وسلم.

"সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ্‌র (স) নিকট হতে কুরআন শ্রবণ করতেন, সেভাবেই কুরআন লিপিবদ্ধ করা হতো।"

ইমাম নববী (র) বলেন,

ان القران كان مؤلفا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم على ما هوفى المصاحف اليوم -

"রাসূলের (স) সময়ে যে কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল বর্তমান কুরআন শরীফ সেভাবেই বিদ্যমান আছে।"

ইমাম আহমদের মুসনাদে একটি বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীগণ বলেন,

بين اظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا

"আমাদের নিকট যথারীতি কুরআন লিখিত ছিল। এর সাহায্যে আমরা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করতাম, আমাদের স্ত্রী-পুত্র ও খাদেমদেরকে শিক্ষা দিতাম।"

তাফসীরে মাজমাউল কুরআনে আছে - "পবিত্র কুরআন বর্তমানে যেভাবে আছে রাসূলের (স) সময়েও ঠিক সেভাবেই ছিল।"

তিনি আরো বহু প্রমাণ দিয়ে মন্তব্য করেন, "এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (স) সময়ও কুরআনের গ্রন্থায়ন কর্ম বিদ্যমান ছিল।"

স্বয়ং রাসূলের নিকটও কুরআনের পান্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ইমাম বুখারী এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরেছেন। যেমন, ইবনে আব্বাস ও ইবনুল হানফিয়া বর্ণনা করেন-

ماترك النبى صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين

"রাসূলুল্লাহ্ (স) মলাটের মধ্যে গ্রন্থায়িত পুরো কুরআনের পান্ডুলিপি ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি।" (বুখারী)

আল্লামা আইনী (র) বলেছেন, "সাহাবীগণ চামড়ায় কুরআন লিখতেন এবং তা কাঠের দু'টি মলাটের মধ্যে রেখে দিতেন।" (ফাতহুল বারী) এভাবে সকলের কাছে ঐ কুরআন লিখিত ছিল। জনগণ তা দেখে দেখে পাঠ করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং গবেষণা করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সময়ে কারা কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন এবং ওহী লিখন বিভাগের সদস্য ছিলেন এর বিস্তারিত বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত ও হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায়।

'তাদভীনে কুরআন' নামক গ্রন্থে প্রামাণ্য দলীলসহ কুরআন গ্রন্থায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত সাহাবীদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ জন বলে উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা ইরাকী (র) এ ৪২ জনের নামও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- (১) হযরত আবূ বকর (রা); (২) হযরত উমর (রা); (৩) উসমান (রা); (৪) আলী (রা); (৫) উবাই ইবনে কা'ব (রা); (৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ; (৭) যুবাইর ইবনে আওয়াম; (৮) খালিদ ইবনে সাঈদ (রা); (৯) আবান ইবনে সাঈদ; (১০) হানযালা ইবনে রাবী; (১১) মুআইকিব ইবনে আবি ফাতিমা; (১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম; (১৩) শুরাহবীল ইবনে হাসানা; (১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা; (১৫) আমের ইবনে যুবাইর; (১৬) আমর ইবনে আস; (১৭) সাবিত ইবনে কায়স; (১৮) মুগীরা ইবনে শু'বা; (১৯) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ; (২০) মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান; (২১) যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.)।

উপরের বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নবী কারীম (স)-এর আমলে কুরআন নাযিলের সাথে সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবীগণ কুরআন মুখস্থ করার সাথে সাথে এ লিপিবদ্ধকরণের মহতী কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে লিপিবদ্ধকরণ

মহানবীর (স) ইনতিকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলাম বিরোধী চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এ সময়ে ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে কুরআনের বহু হাফিয সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। ১১ হিজরী সালের যিলহাজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে ধর্মত্যাগী ভন্ড নবীদের সঙ্গে মুসলমানদের এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)। ধর্মত্যাগীদের দলপতি ছিল মুসাইলিমা কাযযাব। এ যুদ্ধে এত বেশি হাফিয়ে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন যে, মক্কা ও মদীনার হাফিযের সংখ্যা অনেক হ্রাস পায়। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাত বরণ করতে থাকলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তদুপরি কুরআনের অংশ বিশেষ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূরদর্শী সাহাবী হযরত উমর (রা) খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-কে কুরআন সংগ্রহ করে একটা গ্রন্থাকারে গ্রন্থায়নের সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমরের (রা) পরামর্শকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রবীণ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। মহানবী (স) যে কাজটি করে যেতে পারেননি, তা করার সীমাহীন গুরুত্ব ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি কুরআন সংকলনের মহতী কাজে হাত দেন।

হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী (স) -এর "ওহী লিখন দফতরের" প্রধান সচিব হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা)-কে প্রধান করে একটি "কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন" গঠন করেন। তাঁদের উপর কুরআন গ্রন্থায়নের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তিনি মুসলিম জাহানের সর্বত্র ফরমান জারি করেন যে, যার কাছে কুরআনের যে অংশই রয়েছে, তা এ কমিশনের নিকট জমা দান করতে। 'কমিশন' মহানবীর (স) জীবদ্দশায় লিখিত পান্ডুলিপি অনুসরণে কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একখানি প্রামাণ্য পান্ডুলিপি পুস্তকাকারে প্রস্তুত করেন। এব্যাপারে এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যে, এক একটি আয়াতের ব্যাপারে বহু হাফিযের সাক্ষাৎকার ও সাহাবীদের লিখিত পান্ডুলিপির সাথে বার বার মিলিয়ে নিতে বহু সময় ব্যয় করতে হয়। সর্বদিক দিয়ে সকল সাহাবীর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা লিখিত হয়। আল্লামা সূয়ূতী (র) বর্ণনা করেন-

"রাসূল (স)-এর সময় বিক্ষিপ্ত আকারে কুরআনের পান্ডুলিপি মওজুদ ছিল। তারপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর হুকুমে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) সেগুলোকে একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে এক সূতায় গেঁথে দেন।" (আল-ইতকান খ.১, পৃ. ৮৩)

তারপর একে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিফাযত করা হয়। পরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের (রা) ইনতিকালের পর নবীপত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) নিকট তা সংরক্ষিত থাকে।

হযরত আবু বকরের (রা) সময়কার পান্ডুলিপিটির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ-

১. প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লিখা হয়েছিল। তাই তা অনেকগুলো সহীফায় বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পান্ডুলিপি বলা হতো।

২. মহানবীর (স) নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক আয়াতগুলো সূরাসমূহের মধ্যে ধারাবহিকভাবে বিন্যাস করা হয়েছিল। সূরাগুলো ধারাবাহিক করা হয়নি; বরং প্রতি সূরা আলাদা আলাদা লেখা হয়েছিল।

৩. এ পান্ডুলিপিতে 'কুরআনের সাতটি' পঠনরীতিই সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

৪. এ পান্ডুলিপি 'হিরী' লিখন প্রণালীতে লেখা হয়েছিল।

৫. যে সব আয়াতের তিলাওয়াত মানসুখ হয়নি, কেবল সে আয়াতগুলোই ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল।

৬. এ পান্ডুলিপিটি এমন নির্ভুল ও বিশুদ্ধভাবে সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়, যাতে প্রয়োজনে সবাই এ মূল কপি থেকে নিজ নিজ নুসখা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা)-এর আমলে এ মূল নুসখা থেকে এই পাঠন রীতির নুসখা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

কুরআন গ্রন্থায়নে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) অবদান

তৃতীয় ফলীফা হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। ব্যাপকাকারে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষা-ভাষীর লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। স্বভাবতই অনারব লোকেরা আরব-কুরায়শদের ভঙ্গিতে আরবী ভাষায় কোন কোন শব্দ উচ্চরণ করতে পারত না। ফলে আঞ্চলিক উচ্চরণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে পার্থক্য দেখা দেয়। তাছাড়া কুরআন শরীফ সাত হরফ বা সাতটি আঞ্চলিক নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্র (স) কাছ থেকে উক্ত সাত পঠনরীতিতে কুরআন তিলাওয়াত শিখেছিলেন। আর যে সাহাবী যেভাবে শিখেছেন, তিনি সেভাবেই অন্যদের শিখাতেন। এভাবে বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি বহু দূর দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও কোথাও বিভিন্ন পদ্ধতির গঠন নিয়ে বিভ্রান্তি ও মতভেদ সৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

হযরত উসমানের (রা) সময় কারী ও হাফিয সাহাবীদের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। অনেকেই ইনতিকাল করেন। এ সময় হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) যুদ্ধ উপলক্ষে আযারবাইজান ও আরমেনিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কুরআন পাঠে পার্থক্য লক্ষ্য করেন। পরে তিনি মদীনায় ফিরে এসে খলীফা উসমান (রা)-এর নিকট কুরআন পাঠের পার্থক্য ও বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পান্ডুলিপির স্বল্পতা ও দুস্প্রাপ্যতা সম্পর্কে দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। তিনি খলীফাকে বলেন, "পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের ন্যায় কুরআনেও রদবদল দেখা দিতে পারে। ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের ন্যায় মুসলমানগণও বিভ্রান্তি ও মতভেদের শিকার হতে পারে। তাই কুরআনের অনুলিপি তৈরির ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাহলে সকল মুসলিম দেশে একই পান্ডুলিপি ও একই পঠনরীতি অনুসৃত হবে। কেননা ইসলামের বিজয় ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। মুসলমানগণের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) ও প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় যাদের কাছে কয়েকটি সূরার খন্ড খন্ড পান্ডুলিপি ছিল- তাঁদের ব্যাপারেও ভয় ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের ঐ খন্ড খন্ড অংশকেই হয়ত তাঁরা সম্পূর্ণ কুরআন বলে মনে করবে অথবা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা পঠনরীতি অনুসরণ করবে। এ সব অবস্থায় ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের ন্যায় কুরআনেরও নানা পার্থক্য দেখা দিতে পারে। উল্লিখিত অবস্থা সামনে রেখে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক বিবেচনা করে কুরআনের আরো অধিক সংখ্যক পান্ডুলিপি সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা, সেগুলোকে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও অঞ্চলে প্রেরণ করা উচিত। সর্বোপরি লিখন পদ্ধতি ও পঠনরীতির পার্থক্যের জন্য মতানৈক্য দেখা দেয়ার যে ভয় রয়েছে, তাও দূর করা অপরিহার্য।"

খলীফা হযরত উসমান (রা) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের উপরোক্ত প্রস্তাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার জন্য সভা আহবান করেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে শুনিয়ে বলে, আমাদের কিরাআত তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের কথা কুফরির দিকে ধাবিত করতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কী মতামত দেন?"

সাহাবীগণ বলেন, আপনি এ ব্যাপারে কী চিন্তা করেছেন? হযরত উসমান (রা) বলেন, "আমার প্রস্তাব হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে একটি সর্বসম্মত মাসহাফ প্রস্তুত করা অপরিহার্য, যাতে কিরাআত পদ্ধতির মধ্যে কোন মতভেদের সম্ভাবনা না থাকে।" সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে হযরত উসমানের ঐ অভিমত সমর্থন করেন। এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তারা অংগীকার করেন। তারপর খলীফা হযরত উসমান (রা) সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক জরুরি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, "আপনারা মদীনাতে আমার কাছে যাঁরা আছেন- তাঁরাও কুরআন শরীফের পাঠের ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ এবং মত বিরোধ করেন। এতেই বোঝা যায়, যারা আমার নিকট থেকে বহু দূর-দূরান্তে বসবাস করছেন, তারা এ ব্যাপারে আরো বেশি বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। কাজেই আসুন, আমরা সকলে মিলে কুরআন শরীফের এমন একটি মাসহাফ প্রস্তুত করি, যাতে কারো পক্ষে মতভেদ করার কোনই অবকাশ থাকবে না এবং সকলের পক্ষে তা অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।"

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ খলীফা হযরত উসমানের (রা) এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

হযরত উসমান (রা) কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী- যারা রাসূলের (স) এবং প্রথম খলীফার সময়ে ওহী লিখন ও গ্রন্থায়ন কমিশনের সদস্য ছিলেন- তাঁদের সমন্বয়ে যায়দ ইবনে সাবিতের (রা) তত্ত্বাবধানে একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থাকে কতগুলো মূলনীতির ভিত্তিতে কুরআনের অভিন্ন ও বিশুদ্ধ নুসখা তৈরি করতে বলা হয়।

প্রাথমিকভাবে এ সংস্থার চারজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন-

১. যায়দ ইবনে সাবিত (রা)
২. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)
৩. সাঈদ ইবনুল আস (রা) এবং
৪. আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রা)

দায়িত্ব প্রাপ্ত এ চারজনের মধ্যে যায়দ ইবনে সাবিত ছিলেন মদীনাবাসী। অন্যরা ছিলেন কুরায়শ বংশের। পরে এ সংস্থার সাথে আরো বহু সাহাবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ জন। এঁদের মধ্যে উবাই ইবনে কা'ব, কাসীর ইবনে আফলাহ, মালিক ইবনে আবি আমের, আনাস ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

খলীফা হযরত উসমান (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত আবু বকরের (রা) সময়কার 'কুরআনের মূল পান্ডুলিপিটি' চেয়ে আনেন। এ পান্ডুলিপি অনুসরণ করে নতুন পান্ডুলিপি তৈরির জন্য নির্দেশ দান

করেন। আর কুরআনের লিখন ও পঠন পদ্ধতিতে মতপার্থক্য দৃষ্টি হলে কুরায়শী রীতিতে লেখার পরামর্শ দেন। কেননা পবিত্র কুরআন কুরায়শী ভাষায়ই নাযিল হয়েছিল।

কুরআন গ্রন্থায়নে এ সংস্থার মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ

ক. প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) আমলের মূল পান্ডলিপির অনুকরণে সূরার ক্রমানুসারে একই মাসহাফে সন্নিবেশন। কেননা ঐ পান্ডুলিপিতে প্রত্যেকটি সুরা আলাদা নুসখায় লিখিত ছিল।

খ. কেবল একই পঠন পদ্ধতিতে কুরআনের 'মাসহাফ' প্রস্তুত করতে হবে।

গ. কুরআনের সর্বসম্মত ও প্রামাণ্য মূল পান্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে প্রেরণ করা হয়। আর তারই অনুসরণ করার জন্য সরকারিভাবে নির্দেশ জারি করেন।

ঘ. আবু বকরের (রা) সময়ের মূল পান্ডুলিপিখানিও পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই করে দেখা হয়।

ঙ. মূল পান্ডুলিপি রেখে বাকি যার কাছেই কুরআনের যে অংশ বা পান্ডুলিপি ছিল, তা তলব করে নেওয়া হয়। অধিকতর সতর্কতার জন্য তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয়া হয়।

এভাবেই কুরআন মাজীদ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গ্রন্থবদ্ধ হয়। তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ আবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামী জাহান তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা 'কুরআন সংকলনকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। হাফিয ইবনে কাসীর এ ব্যাপারে তাঁর "ফাদাইলুল কুরআন' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার পর লেখেন-

هو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا فى القران

কুরআন পঠনে যাতে পার্থক্য দেখা না দেয়, সে জন্য "হযরত উসমান (রা) লোকজনকে একই কিরাআতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।"

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত উসমান (রা)-এ পান্ডুলিপি হযরত আবু বকর (রা)-এর পান্ডুলিপির অবিকল অনুলিপি ছিল। হযরত আবু বকরের (রা) পান্ডুলিপিটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পান্ডুলিপির অবকিল অনুলিপি ছিল। আল-কুরআনের এ পান্ডুলিপির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকল সাহাবী একমত ছিলেন। সুতরাং খলীফা উসমানের (রা) এ মহৎ কাজটি সমগ্র উম্মাহ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন।

আমাদের নিকট যে কুরআন মাজীদ বর্তমান, তা সেটারই অবিকল অনুলিপি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে চির অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করলেন।

সারকথা

বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য অবদান হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরপক্ষে মহানবীর (স) আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এবং পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) এর শাসন আমলে কুরআনের গ্রন্থায়ন কাজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়নের ব্যাপারে ভিন্ন সূত্র থেকে মনীষী হাকিম 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন মাজীদ তিনবার গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। রাসূল (স)-এর আমলে, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এর সময়ে এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) এর আমলে। কুরআনের এ গ্রন্থায়ন আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবী (স) কর্তৃক সাজানো আয়াত ও সূরাসমূহের ধারাবাহিকতায় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। বর্তমানে কুরআন মাজীদের সূরাগুলো ঠিক ঐভাবেই সজ্জিত রয়েছে, যেভাবে লাওহে মাহফুযে কুরআন সংরক্ষিত আছে। তাই কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. আল-কুরআন কতবার গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে ?

ক. ৭ বার
খ. ৩ বার
গ. ১ বার
ঘ. ৬ বার।

২. কুরআন গ্রন্থায়নকারী সাহাবীগণে সংখ্যা ছিল ?

ক. ১০ জন
খ. ৪০ জন
গ. ৪২ জন
ঘ. ৩৯ জন।

৩. ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়-

ক. মহানবী (স)-এর যুগে
খ. হযরত উমর (রা)-এর যুগে
গ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে
ঘ. হযরত উসমান (রা)-এর যুগে

৪. প্রাথমিকভাবে হযরত উসমান (রা) কুরআন গ্রন্থায়নের জন্য নিয়োগ দেন-

ক. ৫ জন
খ. ৪ জন
গ. ১০ জন
ঘ. ১২ জন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১.খ, ২.গ, ৩.গ, ৪. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মহানবী (স)-এর আমলে কুরআন গ্রন্থায়ন ব্যবস্থা কেমন ছিল ?
২. কুরআন গ্রন্থায়নকারী সাহাবীদের সংখ্যা কত জন ? তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের তালিকা প্রস্তুত করুন।
৩. প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে কুরআন গ্রন্থায়নের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কেন ? বর্ণনা করুন।
৪. হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক গ্রন্থায়নকৃত পান্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৫. এক ও অভিন্ন ভাষায় কুরআন গ্রন্থায়নে হযরত উসমান (রা)-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
৬. 'জামিউল কুরআন' কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে লিখুন।
৭. হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন গ্রন্থায়ন সংস্থার মূলনীতি কী ছিল? আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন গ্রন্থায়নের ইতিহাস লিখুন।

পাঠ-৯

মানব জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের শিক্ষা তুলে ধরতে পারবেন
- পারিবারিক জীবনে কুরআনের নির্দেশনা বলতে পারবেন
- সামাজিক জীবনে কুরআনের বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন
- রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআনের নির্দেশনা উল্লেখ করতে পারবেন
- আন্তর্জাতিক জীবনে কুরআন শিক্ষার মূলনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- অর্থনৈতিক জীবনে কুরআনের নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে কুরআনের মূলনীতি তুলে ধরতে পারবেন
- জীবন যাত্রায় ও জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন।

সমস্যা সংকুল এ পৃথিবীতে মানুষের পদচারণার সূচনা লগ্ন হতে জীবনাবসান পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি পদক্ষেপে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক-জীবন অবধি জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগে সমস্যার অন্ত নেই। মানবজাতিকে এ সমস্যার আবর্ত হতে মুক্ত করে সুষ্ঠু-শান্তিময় জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। জীবন সমস্যার সমাধান হিসেবে তাদেরকে দান করেছেন আসমানী কিতাবসমূহ। এ ধারায় সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করে মানবজীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেছেন। এ পবিত্র মহাগ্রন্থে জীবন-সমস্যার সমাধানের যে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বনবী (স) তাঁর জীবনে তা অনুসরণ, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন করে বিশ্বমানবতার কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ রেখে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

"আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।" (সূরা আল-কাহফ:৫৪)

তাঁর আরো ঘোষণা-

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট এক জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এর দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।" (সূরা আল-মায়িদা : ১৫-১৬)

কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে-إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

"নিশ্চয় এ কুরআন কেবল সে পথেরই সন্ধান দেয়, যা সুদৃঢ়।" (সূরা বনী ইসরাইল : ৯)

বস্তুত কুরআন মাজীদ বিশ্ব মানবতার সর্ববিধ সমস্যার পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেশ করেছে।

ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা সমাধানে আল-কুরআন

ব্যক্তি জীবনে মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও লক্ষ্য নির্ধারণের ওপর নির্ভর করে তার জীবনের শান্তি, উন্নতি আর মুক্তি। আল-কুরআন বলে দেয় মানুষের সে সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধান। শিরক, বিদ'আত,অবিশ্বাস, কপটতা, নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি কুরআন দিকনির্দেশ করে। সর্বপ্রকার অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার, পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে পূত:পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনাচারের প্রতি কুরআন ব্যক্তিকে আহবান জানায়। অপরদিকে ব্যক্তিগত জীবনে মানবের দেহ-মন ও আত্মার সমন্বয় সাধন না হলে মানবের ব্যক্তি জীবন সমস্যাসংকুল ও বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। এ দেহ-মন ও আত্মাকে পরিচালিত করার নির্দেশনায় কুরআন ঘোষণা করেছে-

أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" (সূরা আর-রাদ: ২৮) সুতরাং সকল কাজে যদি মানুষ তার মহান প্রভু আল্লাহকে স্মরণে রেখে প্রতিনিয়ত চলে, তবে তার ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই প্রশান্তিময় হয়ে ওঠে। ব্যক্তি হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয়। কারণ, তার ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সবই সঠিকভাবে চলতে পারে এবং মানুষের কল্যাণ হতে পারে। আল-কুরআন বলে-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا -قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

"শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অত:পর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।" (সূরা আশ- শামস : ৭-১০)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ

"যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই করে।" (সূরা আল-জাসিয়া : ১৫)
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً

"আমি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (সূরা আদ-দাহর : ৩) এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন -

مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।" (সূরা আল-ইসরা : ১৫)

মহানবী (স) বলেন,

ان الله لا ينظر الى صوركم وامو الكم ولكن ينظر الى قلو بكم واعما لكم

"আল্লাহ তোমাদের কারো আকার-আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কাজসমূহ।" (আবু হুরাইরা থেকে মুসলিম)

পারিবরিক জীবন সমস্যা সমাধানে আল-কুরআন

সামাজিক জীবনের প্রাথমিক সংঘ পরিবার। পরিবার ব্যবস্থা ছাড়া সভ্যতা মূল্যহীন। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহ পরিবার ব্যবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বহু বিধান নাযিল করেছেন। কুরআন মাজীদ পূত:পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে যৌন চাহিদা মেটানো এবং মানব বংশ বিস্তার করার জন্য সুষ্ঠু, সুন্দর ও সমৃদ্ধময় পারিবারিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরত্বারোপ করেছে। বহু গামিতা-অমিতাচার, ব্যভিচার, সমকামিতা,

পতিতাবৃত্তি, লিভ্ টুগেদার ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক অভিশাপ চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার মানব সভ্যতার জন্য মরণব্যাধি। তা মানব সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্যও তা মারাত্মক এবং ভয়াবহ। এজন্য ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব চরিত্র সমুন্নত রেখে সুখী জীবনের দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। মানব মর্যাদা ও মানব বংশ বৃদ্ধি ক্ষেত্রে রক্তের পবিত্রতা সংরক্ষণ করেছে।

কুরআন ঘোষণা করেছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً

"হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জুড়িকে এবং যিনি তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা : ১)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসাও ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম : ২১)

মানব পরিবার গঠন করার পদ্ধতি ঘোষণা করে আল-কুরআন বলে-

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"তোমরা বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে।" (সূরা আন-নিসা : ৩)

পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তিতে বসবাস করা এবং সুখী জীবন-যাপন করা। আল-কুরআন এ ব্যাপারে আরো বলেছে-

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।" (সূরা আল-আরাফ : ১৮৯)

মূলত একজন মানুষ তার পরিবারে যে শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তা বোধ করে, তা আর কোথাও লাভ করে না। বিবাহের আরো অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্রের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও জীবনের নিরাপত্তা। কুরআন বলছে-

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

"সুতরাং তাদের বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর ন্যায়সংগতভাবে দিবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিনী নয় ও উপ-পতি গ্রহণকারিণীও নয়।" (সূরা আন-নিসা : ২৫)

বিয়ে ব্যতীত কোন নারীর সাথে যৌন মিলন ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। তাই ইসলাম নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সুরক্ষার জন্য এ বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী পরিবার হচ্ছে মানুষের শিক্ষাগার, নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল, পবিত্রতার আঙিনা, সুখ-শান্তির আবাসস্থল।

মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্র, পুত্র-কন্যা, ভাই-বো প্রমুখ স্বজনদের সমন্বয়ে গঠিত পরিবারে প্রত্যেক সদস্যেরই পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে বলে কুরআন ঘোষণা করেছে-

فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

"অতএব আত্মীয়কে দিবে তার হক।" (সূরা আর-রূম : ৩৮)

কুরআনের এ নির্দেশনার দ্বারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা পরিবারের সদস্যদের অধিকার হতে বঞ্চনার অবসান ঘটল এবং মানব জাতি পারিবারিক জীবনে জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল।

সামাজিক জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে অগণিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সে সব সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ সমাধান পেশ করেছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। সুষ্ঠু-শান্তিময় সমাজ জীবনের পরিপন্থী যাবতীয় অনাচার-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য কুরআন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। অপরদিকে সকলের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়া হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার জন্য কুরআনের নির্দেশনা রয়েছে।

যেমন, কুরআন বলেছে- وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ

"নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী।" (সূরা আন-নিসা : ৩৬)

সমাজ জীবনের মূল কথা হচ্ছে সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করা। পবিত্র কুরআন দ্বর্থহীনভাবে একথা বলেছে-

وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

"তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা আল-কাসাস : ৭৭)

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন বলেছে-

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

"কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত।" (সূরা আল-হাজ্জ : ৩২)

সমাজের মানুষের প্রতি পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে কুরআন বলেছে-

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত মুমিনদের প্রতি বিনয়ী হও।" (সূরা আশ-শুআরা : ২১৫)

সমাজের অভাবী, বঞ্চিত, দুঃখী ও বিপন্ন মানবতার প্রতি সমাজের অন্য সদস্যদের কর্তব্য রয়েছে।

কুরআন বলেছে - وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ "এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না।" (সূরা আদ্-দুহা : ১০) এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

"এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক ।" (সূরা আল-যারিয়াত : ১৯)

সমাজের পরস্পরের প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আল-কুরআন এ ব্যাপারে বলেছে-

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং খারাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করবে না।" (সূরা আল মায়িদা : ২)

ইসলামী সমাজের আচরণবিধি উল্লেখ করে ঘোষণা করা হয়-

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১০)

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ইসলামী সমাজের কর্মনীতি। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

সমাজে মানুষ শুধু আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলবে। সমস্ত কাজ তাঁরই জন্য করবে। বস্তুত কুরআনের উপস্থাপিত সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠা হলে সমাজ জীবনে কোন সমস্যাই থাকতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন

সমাজের বৃহত্তর অঙ্গন হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সরকার ও প্রজা সাধারণের মধ্যে মধুর সম্পর্ক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পারস্পরিক সংহতির উপর। আল-কুরআন সরকার ও সরকার প্রধানকে জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য "শূরা" ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের নির্দেশনা দান করেছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশনা বিশ্ববাসীর নিকট চির কাঙ্ক্ষিত আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা রূপেই বিধৃত হয়ে আসছে।

মানুষ আল্লাহর খলীফা। তাই মানুষের নিজের আইন রচনা করার অধিকার নেই। তার একমাত্র কাজ হল বিশ্বপ্রভুর দেয়া প্রত্যেকটি নির্দেশ ও বিধান পালন করা। কুরআন বলেছে-

أَلاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمْرُ

"জেনে রেখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। (সূরা আল-আরাফ : ৫৪)

কেননা তিনি উত্তম বিধানদাতা। আল্-কুরআনে এসেছ - وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

"আল্লাহই সর্বোত্তম বিধানদাতা।" (সূরা ইউনুস : ১০৯)

মানব রচিত আইন মেনে চলা কুফরি ও শিরক। আল-কুরআনের ঘোষণা-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)

রাজনৈতিক শক্তি ব্যতীত কোন আদর্শই সমাজে বস্তবায়িত হতে পারে না। তাই ইসলাম রাজনীতিকে প্রত্যেক নবী ও ঈমানদার লোকদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। কুরআন বলেছে-

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না।" (সূরা আশ-শূরা : ১৩)

সকল নবীর দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েম অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিটি বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। কুরআনের ভাষায় যাকে বলে দ্বীন কায়েম, আজকের যুগে তাকে বলা হচ্ছে রাজনীতি। রাজনীতির মাধ্যমে সমাজের ক্ষমতা, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি সংস্কৃতি পরিবর্তন করা যায়। আর নবীরা এসেও এ কাজটি করেছিলেন। আর এ হচ্ছে সমাজ থেকে মানব রচিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান কায়েম করা। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে-

وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً

"এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা আল-ইসরা : ৮০)

মহানবী (স) মক্কায় তের বছর দীনের প্রচার করলেন। কিন্তু দীনের কোন বিধান সমাজে কায়েম করতে পারেননি। তাঁর হাতে তখন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মদীনায় গিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়ে মাত্র ১০ বছরে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান বাস্তবায়ন করেছেন। এজন্য মহানবী (স) বলেন,

ان الله لينزع بالسلطان مالا ينزع بالقران

"নিশ্চয় আল্লাহ রাষ্ট্র শক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজ সম্পন্ন করেন, যা কুরআন দ্বারা করেন না।"

আল্লাহর অনেক বিধান কায়েমের জন্য রাষ্ট্র শক্তি অপরিহার্য। যেমন, হত্যা, যিনা, চুরি, ডাকাতি-যুদ্ধ ইত্যাদির বিধান।

পরাধীন জাতি রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। "হযরত মূসা বললেন, হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি পবিত্র ভূমি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা দখল কর, পেছনে হটবে না, অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আল-মায়িদা : ২১)

প্রত্যেক নবী-ই রাজনীতি করেছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আল-কুরআন বলেছে-

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً

"তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন এবং শাসক বানিয়েছেন।" (সূরা আল-মায়িদা : ২০)

আন্তর্জাতিক জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন

মানব সমাজের বৃহত্তম অঙ্গন হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। মানুষের আন্তর্জাতিক জীবনের শান্তি-সুখ নির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর। কেননা পৃথিবীতে রয়েছে রকমারি ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ্যতা ও জাতীয়তা। তাই পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও মানবপ্রেমের নীতি অনুসরণ করতে বলেছে ইসলাম। এ মর্মে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ

"হে মানব! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)

সকল জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থানই হচ্ছে ইসলামের মূলকথা। সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা ও আদমের সন্তান। অতএব বিশ্বের সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করাই আল্লাহর বিধান। বিনা অপরাধে দুনিয়ার যে কোন মানুষকে কষ্ট দেয়া মহাপাপ, আর সে যে কোন ধর্ম, বর্ণ ও জাতির হোক না কেন। ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলনীতি হলো-

১. **সন্ধি ও সহ-অবস্থান** ঃ যে কোন জাতি বা রাষ্ট্র সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে, তাদের সাথে সন্ধি করতে হবে। যুদ্ধ নয় শান্তিই হচ্ছে ইসলামের নীতি। কুরআন বলেছে-

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا "তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়বে।" (সূরা আল-আনফাল : ৬১)

২. **আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান** ঃ কোন মানুষ বা জাতি যদি অত্যাচারীদের থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় ও সাহায্য চায়, তবে তাকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করা ইসলামের শিক্ষা।

৩. **চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন** ঃ কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি হলে অবশ্যই চুক্তি মেনে চলতে হবে।

৪. **বাড়াবাড়ির সমুচিত জবাবদান** ঃ কোন রাষ্ট্র যদি বাড়াবাড়ি করে তার সমুচিত জবাব দিতে হবে, নচেৎ পৃথিবীতে অশান্তি বেড়ে যাবে।

৫. **চুক্তি বহির্ভূত জাতির সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ** ঃ যে সব জাতি সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সাথে সদাচরণ করার সাথে সাথে চুক্তি বহির্ভূত জাতির সাথেও সদাচরণ করা ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি।

৬. **আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা** ঃ নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুৎ হওয়া যাবে না। মুসলিম সামজ হবে বিশ্বের জন্য ন্যায়নীতির মডেল।

৭. **মজলুম মুসলমানকে সাহায্য করা** ঃ পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমান নির্যাতিত হলে তাদেরকে সাহায্য করাও ইসলামী আন্তর্জাতিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য।

وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ

"আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" (সূরা আল-আনফাল : ৭২)

৮. **দ্বি-মুখীনীতি পরিহার** ঃ মুখে যা বলা হবে, কাজে তাই করা হবে। চুক্তি ও সন্ধি যা করা হবে, বাস্তবেও তা পালন করা হবে। এর ব্যতিক্রম করা অপরাধ। এটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের জন্যও প্রযোজ্য।

৯. **পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ** ঃ মানুষের উপর হতে মানুষের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, যুলুম, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, অশান্তি, দুঃখ ও দুর্দশা বন্ধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করতে হলেও তাতে কিছু মাত্র আপত্তি থাকতে পারে না। আল-কুরআন বলে–وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯১)

সুতরাং ইসলামের এ আন্তর্জাতিক জীবনবোধকে অনুসরণ করলে বিশ্বে কোন সমস্যা থাকতে পারে না।

অর্থনৈতিক জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন

জড়বাদী সভ্যতা অর্থনৈতিক সমস্যাকে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে অভিহিত করেছে। ইসলাম যদিও অর্থনৈতিক সমস্যাকে একমাত্র বা বড় সমস্যা স্বীকার করে না; তবু ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব কম নয়। তাই আল-কুরআন বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছে একটি শোষণহীন সুষম অর্থব্যবস্থা।

আল-কুরআনে নির্দেশ রয়েছে যে, সম্পদের উপর কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের একক অধিকার নেই; বরং তা সমাজের সকরের মধ্যে আবর্তিত হবে। আল-কুরাআনের আলোকে বিত্তবান লোকদের সম্পদে সমাজের সে সকল-লোকেরও অধিকার রয়েছে, যারা অভাব ও প্রয়োজনের তাকীদে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে বাধ্য হয় এবং যারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও লজ্জা এবং মান-সম্মানের ভয়ে অপরের কাছে হাত পাতে না। আল-কুরআন বলেছে-

وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

"এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার।" (সূরা আয-যারিয়াত : ১৯)

যাকাত, ওশর, খারাজ, ফাই, গণীমত, সাদাকা, জিযিয়া প্রভৃতি কুরআনিক অর্থনীতির মূলভিত্তি। ইসলামে সুদ-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে হারাম, পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ, অপহরণ ও আত্মসাৎকে হারাম করা হয়েছে।

কুরআনের অর্থ ব্যবস্থার নীতি হচ্ছে- كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যে ঐশ্বর্য আবর্তন না করবে।" (সূরা আল-হাশর : ৭)

আর এ নীতি অনুসরণ করেই ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে আল-কুরআন

মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনেও কুরআনে রয়েছে সুষ্ঠু ও পরিশিলীত ভাবধারা এবং মূল্যবোধ ভিত্তিক প্রগতিশীল ব্যবস্থা। সকলের জন্য শিক্ষাকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে। তাওহীদভিত্তিক ও আখিরাত কেন্দ্রিক বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে তৈরি কুরআনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর অত্যন্ত সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্য। জ্ঞানার্জন করা সকল ফরযের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কারণ জ্ঞান ব্যতীত মহান আল্লাহকে চেনা যায় না। আল্লাহর ইবাদত করা যায় না। আল্লাহর নবীর উপর প্রথম নাযিলকৃত বাণী হলো-

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ

"পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক : ১)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বল ! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?" (সূরা আয-যুমার : ৯)

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا ۗ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী তারাই যারা তাঁকে ভয় করে।" (সূরা আল-ফাতির : ২৮)

না জেনে ইসলামের কথা প্রচার করা নিষেধ- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করোনা।" (সূরা আল-ইসরা : ৩৬)

কাজেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে আল-কুরআন

মানব কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। মানবের রয়েছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন-ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাবলীর নির্ভুল ও সঠিক সমাধান দান করেছে আল-কুরআন। কুরআন বলেছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ

"হে মানব! তোমাদের নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য।" (সূরা ইউনুস : ৫৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"আমি নাযিল করেছি কুরআন যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।" (সূরা আল-ইসরা : ৮২)

وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।" (সূরা আত-তাগাবুন : ১১) مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ "যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় ।" (সূরা আল-কাফ : ৩৩)

"তোমরা যে কিতাব মানুষকে শিক্ষা দাও আর নিজেরা পড়, তা অবলম্বন করে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়ে যাও।" (সূরা আলে-ইমরান : ৭৯) আল্লাহর কিতাব বুঝে তা অনুসরণ করেই আল্লাহর নৈকট্য ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে পৌঁছা যায়।

একক মহান সত্তা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ভিত্তি মূলে তৈরি হয়েছে ইসলামের ধর্মীয় জীবনের গতিধারা। আর এরই সাথে যুক্ত হয়েছে রিসালাত, আখিরাত ও অদৃশ্যে বিশ্বাস। আর বিশ্বাস বা ঈমানের উপর মানবের চিরন্তন মুক্তি অবধারিত।

সারকথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে জীবন সমস্যার সকল দিকের সঠিক সমাধানের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক তথা সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে এ মহাগ্রন্থে। আমরা যদি আল-কুরাআনের সেই সব দিকনির্দেশনা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করি, তাহলে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা পায়-
- ক. বৈরাগ্য জীবনযাপনে
- খ. লেখা-পড়ার মাধ্যমে
- গ. বিবাহিত জীবন-যাপনের মাধ্যমে
- ঘ. পারিবারিক জীবন যাপনে

২. ইল্‌ম অর্জন করা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য-
- ক. সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক
- খ. ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক
- গ. সকলের জন্য বাধ্যতামূলক
- ঘ. সকল উত্তর সঠিক।

৩. ইসলাম কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সমর্থন করে-
- ক. একনায়কতান্ত্রিক
- খ. শূরা ভিত্তিক
- গ. রাজতন্ত্র ব্যবস্থা
- ঘ. গণতান্ত্রিক

৪. সকল মানুষ একজন নর-নারী হতে সৃষ্টি হয়েছে-এ ধারণা আমরা পাই-
- ক. আল-কুরআন হতে
- খ. হযরত উমরের (রা) কথা হতে
- গ. আল-হাদীস হতে
- ঘ. ইসলামী আইন হতে

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১.গ, ২.ক, ৩.খ, ৪.ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানব জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা সংক্ষেপে নিরূপণ করুন।
২. মানুষের ব্যক্তি জীবন গঠনে ও ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের নির্দেশনা কী? বর্ণনা করুন।
৩. পারিবারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করুন।
৪. সামাজিক জীবনের সমস্যা নিরসনে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ব্যাখ্যা করুন।
৫. রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনে কুরআনের শিক্ষা কী? বিশ্লেষণ করুন।
৬. আন্তর্জাতিক জীবন গঠনে আল-কুরআনের নীতি উপস্থাপন করুন।
৭. অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের নীতি উল্লেখ করুন।
৮. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আল-কুরআনের শিক্ষা লিখুন।
৯. ধর্মীয় জীবন গঠনে কুরআনের নির্দেশনা লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মানব জীবন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআনের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
২. সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমস্যা সমাধানে আল-কুরআনের নির্দেশনা উপস্থাপন করুন।
৩. আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআনের শিক্ষা তুলে ধরুন।
৪. অর্থনৈতিক জীবনে কুরআনের শিক্ষা কী ? লিখুন।
৫. ধর্মীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে কুরআনের নির্দেশনা তুলে ধরুন।

পাঠ-১০

চরিত্র গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- মানব চরিত্র গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষার বিবরণ দিতে পারবেন
- কুরআনের শিক্ষার আলোকে জীবন গঠন করতে পারবেন।

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আল-কুরআনের নীতিমালার মধ্যে চারিত্রিক উৎকর্ষের দিক নির্দেশনা অন্যতম। মানুষের প্রকৃত উন্নতি ও সফলতা নিহিত রয়েছে চারিত্রিক উৎকর্ষের মধ্যে। মৌলিক মানবীয় সদগুণাবলী ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে ইহ-পরকালীন শান্তি ও মুক্তি সফলতার উচ্চ-শিখরে আসীন হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহর (স) চরিত্রের প্রধান ভিত্তি হল আল-কুরআন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স) চারিত্রিক সকল গুণ আল-কুরআনের শিক্ষার ছাঁচে গঠিত হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

كان خلقه القرأن

'পরিপূর্ণ কুরআন হচ্ছে তাঁর চরিত্র।'

সদাচার, সত্যবাদিতা, সৎকার্য, পরের মঙ্গল কামনা, খিদমতে খালকের প্রেরণা, আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ, আচার-আচরণে শালীনতা, চিন্তা-চেতনায় দৃঢ়তা, মন-মানসের পবিত্রতা, ইবাদতে নিষ্ঠা, ধর্ম-প্রচারের অদম্য আগ্রহ, সঙ্গী-সাথীদের মংগল কামনা, জীবের প্রতি দয়া, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণাবলীতে ভূষিত হওয়ার জন্য পবিত্র কুরআন বারবার আহবান জানিয়েছে।

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে মানব জাতির চরিত্রে বহু ত্রট্টটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ সব ত্রট্টটি-বিচ্যুতি দূর করার ব্যবস্থা করলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

"এ কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারো।" (সূরা ইবরাহীম : ১)

কুরআনের অপর নাম ফুরকান অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। বাস্তবিকই আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যুগে যুগে মানব চরিত্র সংশোধন, উন্নত ও সকল প্রকার কলুষ হতে মুক্ত করার জন্য একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র দান করেছেন। যাদের তাকদীর ভাল, তারা কুরআনী ব্যবস্থাপত্র ও বিধি-নিষেধ মেনে চলে ইহকালেও অমর হয়েছেন এবং পরকালেও আরাম-আয়েশ লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যারা কুরআনের নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মানেনি, তারা শয়তানী চক্রে পড়ে জীবন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পদদলিত, মথিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সমগ্র মানব জাতির জন্য কুরআন বহন করে এনেছে সৎপথে জীবন-যাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ-শন্তি ভোগ করার ব্যবস্থা।

চরিত্র গঠনে আল-কুরআনের নির্দেশনা

এবার মানব চরিত্র সংশোধন ও উন্নত করার জন্যে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কতকগুলো বিধি-নিষেধ এখানে উপস্থাপন করা হল-

১. অহংকার ও গর্ব না করার জন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

২. লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। লোভ-লালসাকে হারাম করা হয়েছে। (সূরা আন-নূর ২৮)

৩. স্বার্থের লোভে গরীব, ইয়াতীম ও অসহায়ের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করাকে নিজের পেট আগুন দ্বারা পূর্ণ করার মত জঘন্য ও মারাত্মক কাজ বলা হয়েছে। (সূরা আন-নিসা : ১০)

৪. জিনিসপত্র কেনা-বেচার সময় মাপে কম না দেয়ার জন্য হুঁশিয়ার করা হয়েছে। যারা মাপে কম দেবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন সম্পত্তি, দেহের শক্তি ও চিন্তা-শক্তির দ্বারা হলেও অপরকে যথাসম্ভব সাহায্য-সহানুভূতি করা একান্ত প্রয়োজন। "আল্লাহ্ পাক পরোপকারীকে বড়ই ভালবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯৫)

৬. বৃথা কাজ-কর্ম, ধ্যান–ধারণা ও আলাপ-আলোচনা ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমরা ভদ্র ও উন্নত জীবন-যাপনে সক্ষম হই। (সূরা আল-মুমিনুন : ৩-৯) আমাদের প্রতিটি কাজ ও কথার জন্য আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

৭. আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত প্রয়োজনমত ভোগ করে শোকর করার জন্য বলা হয়েছে। কৃপণতা ও বৈরাগ্য অবলম্বন না করার জন্য নির্দে দেয়া হয়েছে। (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৮)

৮. স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনসহ স্নেহ-মমতা ও হাসি খুশিতে বসবাস করার জন্য বলা হয়েছে। একে অন্যের দোষ-ত্রট্টি ও অন্যায়কে যথাসম্ভব ক্ষমা করে মহত্ব ও বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪)

৯. ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ পৃথিবীতে ধন-সম্পত্তি ও মালপত্র সংগ্রহ করার পেছনে সর্বদা লেগে না থাকার জন্য বলা হয়েছে। (সূরা আত-তাওবা : ৩৮) আখিরাতের কাজকর্ম করার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১০. পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সেবা করত দোয়া সংগ্রহ করা জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাইল : ২৩-২৪)

১১. এমনকি অপর ধর্মাবলম্বী লোকজনের সাথেও ধর্ম নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (সূরা আল-হাজ্জ : ৫৬)

১২. মিথ্যা কথা বলা, অপরকে ঠকানো, ফাঁকি দেয়া ইত্যাদি খারাপ কাজ হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

১৩. চুরি করা মহাপাপ। চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষ যেন নিজ নিজ ধন-সম্পদ নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সে আদেশ করা হয়েছে। (সূরা আল-মায়িদা : ৩৮)

১৪. সুদ খাওয়া মহাপাপ। সুদের কারবার না করার জন্য হুঁশিয়ার করা হয়েছে। নবী (স) সুদ খাওয়া, দেয়া ও সুদের লেখক, সাক্ষী সকলের জন্য সমপরিমাণ পাপ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। (সূরা আল-বাকারা : ২৭৬)

১৫. মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। (সূরা আন-নাহল : ১২৫)

১৬. বিপদে-আপদে ভীত না হয়ে সাহস, শক্তি ও ধৈর্যধারণ করে জীবনের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। (সূরা আল-বাকারা : ১২৭)

১৭. কাউকেও বিদ্রূপাত্মক নামে না ডাকার প্রতি তাগিদ করা হয়েছে।

১৮. অহেতুক তর্ক ও আলাপ-আলোচনা হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

১৯. সকল প্রকার লোভ-লালসা দমন করার জন্য বলা হয়েছে এবং ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, "ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।" আল-কুরআনে আল্লাহ্ আরো উল্লেখ করেন, "যে অণু-পরিমাণ সৎকাজ করেছে, সে তার প্রতিদান পাবে।"

২০. মুক্ত ও পরিষ্কারভাবে নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান-সম্পদকে কাজে খাটাবার আহবান জানান হয়েছে। আল্লাহ্র কুদরত, নিয়ামত, রহমত, হায়াত-মাউত ইত্যাদি স্মরণ করে তাঁর অনুগত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করে যুক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। (সূরা কাহাফ : ২৯)

২১. এ বিশ্বের যত কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে-সব কিছুর প্রতি চিন্তা করত আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতে হবে। এতে নিজের গবেষণা-শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অন্তরের সীমাবদ্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাব দূর হবে।

সারকথা

মানবজাতির চরিত্র সংশোধন ও উন্নত করার জন্য আল্লাহ্‌র কুরআন এক অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। এ পবিত্র কিতাব যাঁর উপর নাযিল হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমি একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী রাসূল পাঠিয়েছি।" হযরত মুহাম্মাদ (স) উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলেই পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়েই বহু অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। পবিত্র কালামের ধারক ও বাহক হিসেবে নবী (স) সে অনুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাঁর জীবন-চরিত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে কেউ পাঠ করে সেই মুগ্ধ হয়। নবী(স)-এর অবর্তমানেও দেশবরেণ্য ও খ্যাতনামা অমুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা নবীজী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অভিমত প্রদান করেছেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, "মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর পূর্ণতা দান করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

মানব চরিত্র সংশোধন ও গঠনের এ মহান ব্রতে বিশ্বনবী (স)-এর প্রধান অবলম্বন ছিল পবিত্র কুরআন। বস্তুত কুরআনই হলো মানব চরিত্র গঠনের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১. মহানবী (স)-এর উত্তম চরিত্রের প্রধান ভিত্তি হল-
- ক. আল্লাহর সান্নিধ্য
- খ. আল-হাদীস
- গ. আল-কুরআন
- ঘ. মহানবী (স)-এর বাণী।

২. ফুরকান শব্দের অর্থ হল-
- ক. পাঠ করা
- খ. পৃথক করা
- গ. সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা
- ঘ. সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী

৩. অহংকার ও গর্ব না করার শিক্ষা আমরা পাই-
- ক. আল-কুরআনে
- খ. মহানবীর (স) অনুমোদনে
- গ. ইমাম আবু হানীফার মাধ্যমে
- ঘ. মনীষীগণের আচরণে

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১.গ, ২.ঘ, ৩.ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষ বিধানে আল-কুরআনের কয়েকটি নীতি উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ বিধানে আল-কুরআনের শিক্ষা আলোচনা করুন।

ইউনিট ২

সূরা আল-নূর ঃ অনুবাদ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা (১-৩৩ নং আয়াত)

সূরা আল-নূর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ২৪তম সূরা। এ সূরা নাযিল হয়েছিল এক কঠিন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি ও পরিবেশে। শক্তির দাপটে নবোত্থিত ইসলামী শক্তিকে পরাজিত করতে না পেরে ইয়াহূদী, মুশরিক ও মুনাফিকগোষ্ঠী মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের উপর মিথ্যা কলংক লেপনের মাধ্যমে-এর গতিরোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই হীন চক্রান্ত সফল হয়নি। আল্লাহ তাআলা ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক সংশোধনমূলক এবং অপরাধ প্রতিরোধমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী এ সূরায় নাযিল করেন। এর দ্বারা সমাজকে সংশোধন ও বিনির্মাণ করা হয়। সূরায় আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ, ব্যভিচারের শাস্তি, ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান, পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের সুস্থতা এবং পূণর্গঠনের বিধান। এ সূরায় সমাজ-সভ্যতাকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনার চর্চা ও চরিত্রহীনতা প্রতিরোধের বিধান দেয়া হয়েছে। মিথ্যা রটনা, উড়ো কথায় কান দেওয়া, নারী-পুরুষের চরিত্র অপবাদ দেওয়া জঘন্য অপরাধ। শুভ ধারণা, চোখের নিয়ন্ত্রণ, নারীর ইজ্জত-আবরু ও চলাফেরার শালীনতা, অপরের গৃহে প্রবেশের নিয়মাবলী, পারিবারিক জীবনের শিষ্টাচার, সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষার নানা প্রসঙ্গ ও নিয়ম-নীতি পরিষ্কারভাবে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণে বিবাহ প্রথায় উৎসাহ প্রদান, পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণ, দাস প্রথা বিমোচনের বিধান, বৃদ্ধ মহিলাদের আচরণবিধি, প্রতিবন্ধীদের সাথে ব্যবহার ও খাঁটি ঈমানদারদের জীবনাচারের পরিচ্ছন্ন ধারণা দেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী রাজনীতির মূলনীতি ও কর্মসূচি তুলে ধরা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১ সূরা আল-নূর-এর নাযিলের পটভূমি
- পাঠ-২ নারী নির্যাতনরোধে সূরা আল-নূর-এর শিক্ষা
- পাঠ-৩ সূরা আল-নূরের আলোকে ব্যভিচারের পরিণাম ও দন্ডবিধি
- পাঠ-৪ ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ : সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও এর দন্ডবিধি
- পাঠ-৫ সূরা আল-নূরের ১ থেকে ১০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
- পাঠ-৬ সূরা আল-নূরের ১১ থেকে ২০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
- পাঠ-৭ সূরা আল-নূরের ২১ থেকে ২৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা
- পাঠ-৮ সূরা আল-নূরের ৩০ থেকে ৩৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

পাঠ-১

সূরা আল-নূর নাযিলের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সূরা আল-নূর নাযিল হওয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সূরা আল-নূরের নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ-এর ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।

সূরা আল-নূর নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি পঞ্চম হিজরী সনে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূরাটি বনী মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মদীনায় নাযিল হয়। পঞ্চম হিজরীতে বনী মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে অভিযান থেকে ফেরার কিছুদিন পরই এ সূরা নাযিল হতে থাকে। ইফকের ঘটনাটিও পঞ্চম হিজরীতেই সংঘটিত হয়েছিল, যা এ সূরার একটি মূল আলোচিত বিষয়। এ সকল প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চম হিজরী সনে এ সূরাটি নাযিল হয়।

নামকরণ

নামহীন বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই যে কোন কিছুর নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মাধ্যমেই কোন বস্তুর বিমূর্ত বিষয় মূর্ত হয়ে উঠে। তাই নামকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুরাসমূহের নাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর নামকরণ মানব রচিত সাহিত্য কর্মের মত নয়। এ নামগুলো প্রতিটি সূরার জন্যে এক একটি প্রতীক স্বরূপ। সূরা আল-নূরের নামকরণের ভিত্তি হচ্ছে 'নূর' শব্দটি। এ শব্দটি এ সূরার পঞ্চম রুকুর প্রথম আয়াত থেকে গৃহীত। তাফসীরবিদগণ এ সূরার নামকরণে কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল-

ক. মহান আল্লাহ নূর

মহান আল্লাহ তাআলা হলেন নূর, আর একথাটি অত্র সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় বলা হয়েছে 'আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে নূর। এখানে নূর বলতে হিদায়াতের নূর বা আলোকে বুঝানো হয়েছে। ফলে এর নাম 'সূরা আল-নূর' রাখা হয়েছে।

খ. সমাজকে নূর বা আলো প্রদানকারী

নূর অর্থ আলো বা জ্যোতি। নূর বলতে এমন বিষয় বা বস্তুকে বুঝায় যার সাহায্যে অন্য বস্তু আলোকিত, বিকশিত ও উদ্ভাসিত হয়।

ইসলামের আগমনের পূর্বে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে ব্যভিচার, অনাচার, অবিচার এবং অসামজিক কাজকর্ম সংঘটিত হতো, যার ফলে মানব সমাজ অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সূরা আল-নূর এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর আইন করে জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর সন্ধান দেয়। তাই এ সূরাকে সূরাতুন নূর বা আলোর সূরা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

গ. বিষয়বস্তুর আলোকে

তাফসীরবিদগণ মনে করেন, সূরা আল-নূরে এমন কতিপয় বিধান ও হিদায়াত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যা মেনে চললে মানব জীবন আলোকময় হয়ে উঠে। এ সব বিধিবিধান মূলত হিদায়াতের নূর বা আলো এবং এ নূরের কেন্দ্রবিন্দু হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আর এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল-নূর।

পটভূমি

বদরের যুদ্ধের পর যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা আমাদের জানা আবশ্যক। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পেছনে যে কারণসমূহ রয়েছে তা জানা না থাকলে এ সূরার গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী বিপ্লবর যে উত্থান শুরু হয়, খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত সে বিপ্লব এত বেশি ব্যাপকতা লাভ করে যে, আরবের মুশরিক, ইয়াহূদী, মুনাফিক ও প্রতীক্ষমান লোকেরা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, ইসলামী শক্তির এ উত্থানকে অস্ত্র দ্বারা আর বাধা দিয়ে লাভ নেই। তথাপি খন্দকের যুদ্ধে ইসলামের শত্রুরা এক জোট হয়ে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু তারা মদীনা উপকণ্ঠে একমাস কাল মাথা ঠুকেও মুসলমানদের কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ অভিযান ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তারা স্বদেশে ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবী (স) ঘোষণা দেন-

ما تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم

'এরপর কুরায়শরা আর তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না বরং তোমরাই তাদের উপর আক্রমণ করবে।' (ইবনে হিশাম, খ. ৩, পৃ. ২৬৬)

রাসূল (স)-এর এ উক্তি দ্বারা একথারই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছে। মুসলমানরাই এখন শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করবে।

বদর থেকে খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত এ সময়কালের মধ্যে মুসলমানরাই কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। যদিও কাফিররা সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি ছিল। ইসলামের এই ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতিতে তারা ভীত হয়ে পড়ে। অস্ত্র ও জনবলের দিক দিয়ে শক্তিশালী কাফির-মুশরিক বাহিনী এটা বুঝতে পারে যে, অস্ত্র ও শক্তির দ্বারা মুসলমানদেরকে প্রতিহত করা যাবে না। তাই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্যে তারা বিভিন্ন পথ বেছে নেয়। তারা মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস 'নৈতিক শক্তি'কে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা রাসূল (স) ও সাহাবা কিরামের নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের চেষ্টা করতে থাকে। কেননা এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে যা অস্ত্র দ্বারা রোধ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে তারা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য, শৃংখলা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করে যার সামনে মুশরিকদের শিথিল ও বিশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থাপনা সর্বাবস্থায় তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুশরিকদের দুর্বল চরিত্র ও সামাজিক ব্যবস্থা তাদের মাঝে হীন মনমানসিকতারই জন্ম দেয়। আর এ কদর্যপূর্ণ মন-মানসিকতার কারণেই তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীদের বিভিন্নভাবে হেয় করতে থাকে এবং তাঁদের চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে আরম্ভ করে। আর এজন্য ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মদীনার মুসলিমদের মধ্যে নানারূপ ফিত্নার সৃষ্টি করে ইসলামের শত্রুট্ট ইয়াহূদী ও মুশরিকরা বেশি-বেশি ফায়দা লুটার লক্ষ্যে তাদের সকল কর্ম কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে।

এ নতুন চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের প্রকাশ ঘটে পঞ্চম হিজরীর যিলকাদ মাসে। এ সময় মহানবী (স) পালক পুত্র গ্রহণের জাহেলী প্রথার চূড়ান্ত অবসানের জন্যে নিজেই তাঁর পালক পুত্র যায়দ ইবন হারিসার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিয়ে করেন। এতে মদীনার মুনাফিকরা রাসূলের (স) বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার এক সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে। আর ইয়াহূদীরাও মুনাফিকদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে মিথ্যা দোষারোপের এক মহাতুফান সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে- তারা দ্বিতীয় আক্রমণ চালায় বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়, যা ছিল কঠিনতর এক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র। বনী মুস্তালিক ছিল বনী খোজায়া নামক গোত্রের একটি শাখা। পঞ্চম হিজরী সনের শাবান মাসে নবী করীম (স) এদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হন। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিপুল সংখ্যক মুনাফিক নিয়ে এ যুদ্ধে নবী করীম (স)-এর সঙ্গী হয়। 'মুরাইসী' নামক স্থানে পৌঁছে নবী করীম (স) শত্রুট্টর উপর হামলা পরিচালনা করেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই সমগ্র গোত্রটিকে তাদের সম্পদসহ গ্রেফতার করে ফেলেন। এ অভিযান থেকে অবসর লাভের পর মুসলিম বাহিনী মুরাইসীতে তাঁবু খাঁটিয়ে অবস্থান করার সময় একদিন হযরত উমর (রা)-এর জনৈক কর্মচারী এবং খাজরাজ গোত্রের জনৈক সহযোগীর মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া হয়। তাদের একজন আনাসারদেরকে এবং অপরজন মুজাহিরদেরকে ডাকে। এতে উভয় দিকে লোক সমবেত হতে থাকে। মহানবী (স)-এর হস্তক্ষেপে উপস্থিত ক্ষেত্রেই বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক-সর্দার) তিলকে তাল বানিয়ে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলে। সে আনসার বাহিনীকে এই বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, এই মুহজিররা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের ও কুরায়শ কাঙ্গালদের উদাহরণ এরূপ যে, "কুকুর পাল যেন তোমাকেই খেয়ে ফেলে"। এ সবকিছু তোমাদেরই সৃষ্টি। তোমরা নিজেরাই ওদের এখানে নিয়ে এসে বসিয়েছ। তোমরাই এদেরকে নিজেদের বিত্ত-সম্পত্তিতে অংশীদার বানিয়েছ, এখন তোমরাই যদি এদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও তখন দেখবে এদের আর কোথাও আশ্রয় মিলবে না।

অতপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কসম খেয়ে বলল, মদীনায় পৌঁছার পর আমাদের মধ্যে যে সম্মানিত সে সম্মানহীনকে বহিস্কার করবে। (সূরা মুনাফিকুন) নবী করীম (স) যখন এ সব কথাবার্তা শুনতে পেলেন, তখন হযরত উমর (রা) মহানবী (স)-কে পরামর্শ দিলেন যে, এ ব্যক্তিকে খুন করে ফেলা উচিত, কিন্তু নবী করীম (স) বললেন-

فكيف يا عمر، اذا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه

'হে উমর! তা কেমন করে হয় ? তা করলে তো লোকেরা বলবে, মুহাম্মদ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করছে।'

তারপর নবী করীম (স) সে স্থান ত্যাগ করে সবাইকে অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কোথাও অবস্থান না করে বিরামহীনভাবে চলতেই থাকলেন। পথিমধ্যে উসায়েদ ইবন হুজাইর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী আজ তো আপনি আপনার নীতির বিপরীত অসময়ে চলবার নির্দেশ দিলেন। জবাবে তিনি বললেন- তোমাদের সঙ্গীটি কি সব কথা বার্তা বলছে তা তুমি শুনতে পাচ্ছ না? তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'কে সে সঙ্গী"? নবী করীম (স) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনি যখন মদীনায় এসেছিলেন, তখন এ ব্যক্তিকে আমরা নেতা বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার জন্য নেতৃত্বের মুকুট তৈরি হয়েছিল। আপনার আগমনে তার সকল আশা নস্যাৎ হয়ে যায়। এ কারণে তার মনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল সে এখন তাই উদগীরণ করছে মাত্র।

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো শেষ হয়নি। এরই মধ্যে একই সফরে আরেকটি ভয়াবহ অঘটন ঘটে যায়। ঘটনাটি এমন যে, নবী করীম (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ যদি পরিপূর্ণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এর মোকাবিলা না করতেন তা হলে মদীনার এই নবোত্থিত মুসলিম সমাজ এক সর্বাত্মক আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যেতো। ঘটনাটি ছিল এরূপ: এ পাপাত্মা মুনাফিক হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) বিরুদ্ধে এক চরম আপত্তিকর ও অবমাননাকর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বসলো। এ অপবাদকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেই মহান আল্লাহ অপবাদের ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর বিধানসহ সূরা আল-নূরের বেশ কতিপয় আয়াত নাযিল করেন। আর এ অপবাদের ঘটনাটিই হল মূলত অত্র সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি।

হযরত আয়েশার (রা) ঘটনা

বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য সমস্ত হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি নিম্নরূপ-

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (স) যখন বনী মোস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী-এর যুদ্ধে গমন করেন। উম্মুল মু,মিনীনগণের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) এ যুদ্ধে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। ইত:পূর্বে নারীদের পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই এ সফরে হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্যে উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হতেন এরপর উটের চালক আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পথে এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কোন এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার করার পর শেষ রাতের দিকে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। সবাইকে প্রস্তুত হতে বলা হল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে গেলেন। ঘটনাক্রমে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। তিনি গলার হার খোঁজ করতে গিয়ে বেশ কিছু সময় বিলম্ব করে ফেলেন। ইতোমধ্যে কাফেলা তাকে রেখে সে স্থান ত্যাগ করে। তাঁর উট চালকও যথারীতি যাত্রা শুরু করেন। সে ধারণা করেছিল যে, হযরত আয়েশা (রা) হাওদার ভেতরেই আছে। কেননা হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন ক্ষীণকায়, তাঁর দেহের ওজন ছিল অত্যন্ত হালকা। তাই বাহকগণ তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারেননি। তারা মনে করেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা) হাওদার মধ্যেই রয়েছেন একং তাঁকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) সে স্থানে ফিরে এসে দেখেন কাফেলা সেখান থেকে চলে গেছে। তখন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, তিনি কাফেলার পেছনে না দৌড়ে স্ব-স্থানে চাদর মুড়িয়ে বসে থাকলেন। তিনি ভাবলেন, প্রিয় নবী (স) যখন তাকে না পাবেন না, তখন তাঁর খোঁজে তিনি নিশ্চয় এখানেই লোক পাঠাবেন। সেজন্য তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করাই সমীচীন মনে করলেন। তখন সময় ছিল শেষ রাত। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

প্রিয় নবী (স)-এর যাবতীয় কাজ ছিল অত্যন্ত সুশৃংখল। কাফেলার কোন কিছু যেন ভুলক্রমে রাস্তায় পড়ে না থাকে তার জন্য তিনি একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতেন, সে সবার শেষে রওয়ানা হতো। কোন কিছু পড়ে থাকলে সে তা

কুড়িয়ে নিয়ে আসত। এ সফরে হযরত সাফওয়ান ইবন মুয়াত্তালকে (রা) তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। ফেরার পথে অতি প্রত্যুষে সাফওয়ান একজনকে চাঁদর মুড়িয়ে ঘুমিয়া থাকতে দেখেন। তিনি কাছে এসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-কে দেখতে পান, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। হযরত সাফওয়ানের (রা) মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্যটি শোনা মাত্রই হযরত আয়েশা (রা) জেগে উঠেন। হযরত সাফওয়ান (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উটটি হযরত আয়েশার (রা) সামনে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) উটের পিঠে পর্দা করে বসে পড়লেন। হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে সামনের দিকে হাটতে লাগলেন এবং দুপুরের সময় মূল কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন। এটাই ছিল প্রকৃত ঘটনা।

মিথ্যা অপবাদ রটনা

মুনাফিকরা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো। তাই তারা তিলকে তাল বানিয়ে মিথ্যা রটনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা) নামে মিথ্যা অপবাদের ঝড় তুলে। মুনাফিকদের এ ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্মজালে কতক সরল প্রাণ মুসলমানও জড়িয়ে পড়ে। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিসতাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ ছিলেন এদের অন্তর্ভুক্ত। রটে যাওয়া অপবাদে স্বয়ং মহানবী (স) খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার (রা) তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এ আলোচনার ঝড় বইতে থাকল। অবশেষে মহান আল্লাহ হযরত আয়েশার (রা) পবিত্রতা বর্ণনায় ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশ গ্রহণকারীদের নিন্দায় সূরা আল-নূরের ১১ থেকে ২০তম আয়াত পর্যন্ত দশটি আয়াত নাযিল করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই ঘটনার সৃষ্টি করে একই ঢিলে একাধিক পাখি শিকার করতে চেয়েছিল। প্রথমত: সে রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর ইজ্জতের উপর হামলা করল। দ্বিতীয়ত: সে ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও মর্যাদাকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করল।

তৃতীয়ত: সে এমন এক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করল যে ইসলাম যদি মুসলমানদের মধ্যে সত্যি কোন পরিবর্তনের সূচনা না করত, তা হলে মুহাজির ও আনসার এবং আনসারদের উভয় গোত্রেই পরস্পরের সাথে কঠিন লাড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ত। আল্লাহ তাআলা এরূপ একটি বিপদ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করলেন।

সারকথা

সূরা আল-নূর পবিত্র কুরআনের ২৪তম সূরা। ইসলাম শুধু বাহ্যিক কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম বিশেষ নয়। বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ সূরা তারই একটি অকাট্য প্রমাণ। সূরা আল-নূরের ৬৪টি আয়াতে মানব জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরাটি সামাজিক বিশৃংখলা নিরসনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষ করে ব্যভিচার ও মিথ্যা অপবাদের মত মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এ সূরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। একটি শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই মানুষের কাম্য, আর ইসলাম চায় এ জাতীয় একটি কল্যাণকর সমাজ উপহার দিতো। এ লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যে সব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন সূরা আল-নূর তারই সমষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. সূরা আল-নূর পবিত্র কুর-আনের কততম সূরা?
ক. ১০৮তম খ. ৯২তম
গ. ২৪তম ঘ. ৪৪ তম

২. সূরা আল-নূরের আয়াত সংখ্যা-
ক. ৬৪ টি খ. ৭৪টি
গ. ৮০ টি ঘ. ৫৪ টি

৩. মুসলমানদের বিজয়ের মূল হল-
ক. ঈমানী শক্তি খ. নৈতিক শক্তি
গ. সামরিক কৌশল ঘ. আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র

৪. সূরা আল-নূর কত হিজরীতে নাযিল হয় ?
ক. ৭ম হিজরী খ. ৪র্থ হিজরী
গ. ৫ম হিজরী ঘ. ৬ষ্ঠ হিজরী

৫. সূরা আল-নূরের নামকরণে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৭টি ঘ. ৩টি

৬. বনী মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়-
ক. ৫ম হিজরীতে খ. ৮ম হিজরীতে
গ. ৭ম হিজরীতে ঘ. ৬ষ্ঠ হিজরীতে

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. গ, ২. ক, ৩. ক, ৪. গ, ৫. ঘ, ৬. ক

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. সূরা আল-নূর-এর নামকরণ আলোচনা করুন।
২. হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনার কারণ লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. সূরা আল-নূর নাযিল হওয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করুন।
২. ইফকের ঘটনা বর্ণনা করুন। হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা রটনার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২

নারী নির্যাতনরোধে সূরা আল-নূর-এর শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিধানাবলী বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যভিচারের শাস্তি কি তা বলতে পারবেন
- ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি বলতে পারবেন
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ প্রদানের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- পর্দা সম্পর্কিত ইসলামী বিধান বলতে পারবেন
- অপরের ঘরে প্রবেশের বিধান এবং দাস-দাসীদের অধিকার বর্ণনা করতে পারবেন।

সূরা আল-নূরে সমাজ সংস্কারমূলক অনেকগুলো নীতি এবং বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এ সকল সামাজিক বিধি-বিধান নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম সমাজকে কলুষমুক্ত রাখা, সমাজে এর বিস্তার রোধ করা। আর যদি সমাজ কোন কারণে কলুষিত হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তার প্রতিবিধান করা। একমাত্র আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থতা ফিরে আসতে পারে। কেননা সুষ্ঠু ও সুস্থ সমাজ জীবন নির্ভর করে সুষ্ঠু সামাজিক বিধি-বিধানের উপর। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-নূরের প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন যাতে সমাজ কোন অনৈতিক ও চরিত্র বিধ্বংসী বাধিতে আক্রান্ত হতে না পারে। আর যদি আক্রান্ত হয়েই যায় তা হলে যেন তা প্রতিরোধ ও নির্মূল করা যায়। এ সূরার শেষার্ধে এমন সব বিধি-বিধান ও উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে সমাজে দোষ ত্রুটি, পাপ ও অন্যায়ের উৎসসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। নারী নির্যাতন ও ব্যভিচার রোধে সূরা আল-নূরে বর্ণিত সামাজিক সংস্কারমূলক বিধানাবলী এখানে আলোচনা করা হল-

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত বিধান

ব্যভিচার একটি অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্যপূর্ণ সামাজিক অপরাধ। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটি একটি মহাপাপ, যা সমাজকে কলুষিত করে। পরিবারের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধনের দিকে নারী পুরুষের মধ্যে তীব্র অনীহার সৃষ্টি করে। তা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সমাজের যুবক-যুবতীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পশুর ন্যায় চরম পাশবিক যৌনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর দরুন পবিত্র মানবীয় বংশধারার বিশেষত্ব হারিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এ কাজের খারাপ পরিণতি অনুধাবন করতে পারবে, এর মানবীয় মর্যাদা বিধ্বংসী ভূমিকা বুঝতে সক্ষম হবে, সেই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার গভীর তাৎপর্য, এর জন্য প্রণীত শাস্তির বিধানের যৌক্তিকতা। ব্যভিচারের শাস্তি শুধু ইসলাম ধর্মেরই বর্ণিত হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমগ্র মানব সমাজেই এর শাস্তির বিধান ছিল এবং আছে। আল-কুরআনে সূরা আল-নিসার তৃতীয় রুকুতে ব্যভিচারকে একটি সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (সূরা নিসা আয়াত ১৫-১৬) আলোচ্য সূরায় ব্যভিচারকে একটি ফৌজদারী অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য শাস্তিস্বরূপ একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে।" (সূরা আন-নূর : ২)

উল্লেখ্য যে, ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ অবিবাহিত হলে সে অবস্থায় এ শাস্তির বিধান প্রযোজ্য। আর বিবাহিত হলে সে ক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান রয়েছে।

ইসলামের বিধান মতে, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার ন্যায় এটিও একটি বড় অপরাধমূলক কাজ। সূরা আল-ফোরকানের ৬৮নং আয়াতে শিরক, বিনা কারণে নর-হত্যা ও ব্যভিচারকে একই পর্যায়ের জঘন্য অপরাধরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন-

لا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا

'নর হত্যার পর যিনার তুলনায় অধিক অপরাধের কাজ আর কোনটি আছে বলে আমার জানা নেই।'

ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তি কতিপয় শর্ত স্বাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা যাবে, যা পরবর্তী পাঠে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্কিত বিধান

ব্যভিচার শুধু অপরাধই নয় বরং তা অনেক অপরাধের সমষ্টি। তাই ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের সঙ্গে সৎ সতী-সাধ্বী মুমিন নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। এমনকি তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যভিচারের মত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের জন্যে উক্ত বিবাহ সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেনান তাওবা ও নৈতিক সংশোধনের পর তাদেরকে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য করা হবে না।

মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি সম্পর্কিত বিধান

কেউ কাউকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিলে তা প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হয়। সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে ইসলামী শরীআত এহেন অপবাদকে কঠোর অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে। আর এ শাস্তি স্বরূপ ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ যাতে কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না পায়। সে জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত বিধান

কোন স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অথবা স্ত্রী স্বামীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়, তবে তার জন্য ইসলামী শরীআতে লি'আনের বিধান রয়েছে।

আর লি'আন হল- অপবাদ প্রদানকারী স্বামী বা স্ত্রী তার অপবাদের সত্যতার পক্ষে চারবার শপথ করবে এবং পঞ্চম বার বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়- তাহলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ণিত হোক। অনুরূপভাবে যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেও তার পবিত্রতা প্রমাণের জন্য চারবার শপথ এবং পঞ্চমবার উক্ত কথাটি বলবে। এক্ষেত্রে যদি অপবাদদানকারী শপথ করতে অস্বীকার করে তাহরে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করার বিধান রয়েছে।

ভিত্তিহীন খবর প্রচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ

হযরত আশেয়া (রা)-এর উপর মুনাফিকদের আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের শাস্তির বিধান ও সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যে সব লোক সমাজে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ ছড়ায় আর নিজেদের কথার সত্যতার পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাদের জন্য আশিটি বেত্রাঘাত-এর বিধান রয়েছে। আর অন্য যে কোন বিষয়ে তাদের সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা হল পাপী, অন্যায়কারী ও সত্য বিচ্যুত।

এ ব্যাপারে ইসলাম একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছে আর তা হল-সমাজে সামগ্রিক সুসম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শুভ ধারণা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্দোষ মনে করতে হবে। দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে এ মর্যাদাই পেতে থাকবে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটানো যাবে না।

অপরের গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত বিধান

সাধারণভাবে লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যেন অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে অবাধে প্রবেশ না করে। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে সামাজিক রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিধান হল, কারো সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে প্রথমে অনুমতি নিবে এবং সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। বিনা অনুমতিতে এবং সালাম না দিয়ে কারো গৃহে প্রবেশ করা অন্যায়। কারণ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে কারো একান্ত ব্যক্তিগত অবস্থা অপরের নিকট প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। পর নারীর প্রতি বেপর্দা অবস্থায় দৃষ্টিপাত হতে পারে। অবাধ মেলামেশার কারণে যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অনুমতি ও সালাম ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করাকে আল্লাহ্ কড়াভাবে নিষেধ করেছেন। এ বিধানটিও নারী নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান

ইসলামের বিধান মোতাবেক নারী পুরুষ উভয়ই পরস্পরের প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি বিনিময় করা অবৈধ। অর্থ্যাৎ একজন পুরুষের জন্য নিজের স্ত্রী এবং মুহাররমাত (যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা অবৈধ এমন মহিলা) ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে এবং একজন স্ত্রীলোক নিজের স্বামী ও মুহাররম (যে সমস্ত পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয় এমন পুরুষ) ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে কামভাব নিয়ে চোখ ভরে দেখা অবৈধ। নারী-পুরুষ উভয়ে তাদের দৃষ্টিকে অবশ্যই নিচু ও সংযত রাখবে। এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপকে ইসলামী শরীআত চোখের ব্যভিচার হিসেবে অভিহিত করেছে। এ বিধান পালিত হলে অবশ্যই সমাজে নারী নির্যাতন কমবে এবং ধর্ষণ ও ব্যভিচার প্রতিরোধ সহজতর হবে।

নারীদের পর্দা সম্পর্কিত বিধান

নারীদের পর্দা সম্পর্কিত বিধান এই যে, নারীরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবে। তবে এ সময় তাকে সংযত হয়ে শালীন ও মার্জিত পোশাক পরে তথা মাথা ও শরীরকে বড় ওড়না বা চাদর দ্বারা আবৃত করে পর্দাসহ চলতে হবে। নিজেদের সাজ-সজ্জা ও রূপ-লাবণ্য লুকিয়ে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই তা বাইরের অপর পুরুষের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। শব্দ করে এমন কোন অলংকার পরিধান করে বা খুব আট–ষাট পোশাক পরিধান করে অথবা শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা থাকে এমন পোশাক পরিধান করে ঘরের বাইরে যাওয়া অবৈধ। বস্তুত নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনীর বাইরে নিদেজের সাজ-সজ্জা ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে নারীদের চলাফেরা ও কাজ কর্ম করতে নিষেধ নেই। তবে ইচ্ছা করে বা বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করা বা সৌন্দর্য লোলুপ দৃষ্টি পর নারীদের থেকে ফিরিয়ে নেবে এবং নারীরা পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আর এতে নারী নির্যাতনও হ্রাস পাবে।

পুরুষদের পর্দা সম্পর্কিত বিধান

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা মেনে চলা ফরয। পুরুষ তার চোখ পরনারী থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে ও সংযত রাখবে। নিজেকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হেফাজত রাখবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

"মুমিনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা আন-নূর : ৩০)

হাদীসে এসেছে- "চোখের ব্যভিচার হল পরনারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকানো।"

বৃদ্ধা নারীদের পর্দা সংক্রান্ত বিধান

বৃদ্ধা নারীদের পর্দা সংক্রান্ত বিধানে কিঞ্চিত শৈথিল্য আরোপ করা হয়েছে। তারা যদি নিজেদের ঘরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা রাখে, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তারা যেন পর-পুরুষের নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়। বরং বার্ধক্য অবস্থায়ও যদি তারা স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য ও অলংকারাদি সংগোপনে রাখতে অভ্যস্ত হয় তবে তা তাদের জন্য উত্তম।

অবিবাহিত নারী পুরুষদের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিধান

সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষদের অবিবাহিত থাকাকে অপছন্দনীয় কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা বিবাহের উপযুক্ত অথচ বিবাহ হয়নি, তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রীত দাস-দাসীদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদের বিবাহ সম্পাদন করার জন্য মালিক প্রভুদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা- অবিবাহিত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল কাজের উদ্ভাব হয়ে থাকে। কাজেই বিবাহের উপযুক্ত হলে প্রত্যেক নারী-পুরুষকেই বিবাহিত জীবন যাপন করা কর্তব্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

النكاح من سنتى . من رغب عن سنتى فليس منى

"বিবাহ হল আমার নীতি। আর যে ব্যক্তি আমার নীতি উপেক্ষা করবে সে আমার অনুসারী নয়।"

পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত বিধান

পতিতাবৃত্তি একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। ইসলাম বেশ্যাবৃত্তি এবং যারা এ পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে। তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া নারীদের বা দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করা, তাদের দ্বারা দেহব্যবসায় বা পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব দেশে দাসীদের দ্বারা এহেন জঘন্য কাজ করানো হতো। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে নারীদেরকে এ পেশায় নিয়োজিত রেখে অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে এবং পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে আধুনিক সমাজে নারী নির্যাতন করা হচ্ছে। ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তি প্রবর্তন করে মানবতার জন্য অবমাননাকর জঘন্য কাজ পতিতাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

সারকথা

সূরা আল-নূরে অবাধ যৌনাচার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য যৌক্তিক ও কার্যকর বিধান দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমাজ ব্যভিচার, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ও এ জাতীয় সামাজিক অপবাধ থেকে কলুষমুক্ত থাকবে। পরিবার, সমাজ ও পরিবেশকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও বেকারমুক্ত রাখার জন্য ইসলামের বিধানাবলী খুবই উপযোগী।

এ সূরায় নারী নির্যাতন, যৌন অপরাধ ও অশ্লীলতা প্রতিরোধমূলক যেসব বিধানের কথা আলোচিত হয়েছে তা হল নিজ নিজ দৃষ্টি ও নিজ-নিজ রূপ সৌন্দর্যকে সংযত রাখা এবং দেহ মনের পবিত্রতা, লজ্জাস্থানের নিয়ন্ত্রণ, অপরের ঘরে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, পর্দার বিধান, নার-নারীর অবিবাহিত থাকাকে নিরুৎসাহিত করা ও যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার ব্যবস্থা। আর অপরাধ সংঘটিত হলে যেসব দন্ড-বিধান কার্যকর করে সমাজকে সুস্থ রাখার বিধান রয়েছে তাহল- ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদন্ড, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে লি'আন ও বেত্রদন্ড এবং বেশ্যা বা পতিতাবৃত্তির নিষিদ্ধতার বিধানাবলী। মূলত এসব বিধান বাস্তবায়ন করে-নারী-পুরুষের সমন্বিত মর্যাদা রক্ষা করা যায় এবং একটি পূত:পবিত্র ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক. শান্তি
খ. উচ্ছৃঙ্খলতা
গ. দরিদ্রতা
ঘ. পশ্চাদপদতা

২. সূরা আল-নূর নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে-
ক. সমাজ সংস্কার করা
খ. নারী নির্যাতন রোধ করা
গ. নারী সমাজকে মর্যাদা দান করা
ঘ. সব উত্তরই সঠিক

৩. বিশ্ব সমাজের কাছে ব্যভিচার একটি-
ক. অবৈধ কাজ
খ. নিন্দনীয় কাজ
গ. শাস্তিযোগ্য অপরাধ
ঘ. মহাপাপ

৪. বিবাহ করা-
ক. ফরয কাজ
খ. সুন্নত
গ. মাকরূহ
ঘ. সব ক'টি উত্তরই ঠিক।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. ঘ.

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. ব্যভিচারের শাস্তির যৌক্তিকতা আলোচনা করুন।
২. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আলোচনা করুন।
৩. সূরা আল-নূরে নারীর মর্যাদা সংরক্ষণ ও নারী নির্যাতনরোধে যে সকল বিধান নাযিল করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।
৪. পর্দা সম্পর্কিত বিধানটি আলোচনা করুন।
৫. সূরা আল-নূরে যে সকল সামাজিক বিধান বর্ণিত হয়েছে তা লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. নারী-নির্যাতন এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ প্রতিরোধে সূরা আল-নূরের বিধান আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

সূরা আল-নূরের আলোকে ব্যভিচারের পরিণাম ও দন্ডবিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ব্যভিচারের দন্ড কার্যকর করার শর্তাবলী বলতে পারবেন
- অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের শাস্তির বিধান আলোচনা করতে পারবেন
- বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা দিতে পারবেন।

ব্যভিচারের ভয়াবহতা ও শাস্তির বিধান

ব্যভিচার একটি অশ্লীল কাজ ও সামাজিক অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্যতম পাপ। মানব জাতির স্থিতি, মানব সমাজের সংহতি, মানবের যৌন সুস্থতা, নারীর নিরাপত্তা, মানব বংশ ধারার নিষ্কলুষতা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানব ইতিহাসের সকল সভ্য সমাজ নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ককে আবহমানকাল থেকে অপরাধ মনে করেছে। এ জন্য কঠিনতম শাস্তির বিধান রয়েছে। ইসলামী আইন ব্যভিচারকে একটি দন্ডযোগ্য ফৌজদারী অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। মানব জাতির স্থিতি ও সমাজের শৃংখলা রক্ষার জন্য অপরিহার্য হল- নারী ও পুরুষের সম্পর্ক একমাত্র বৈধ, আইন সম্মত ও নির্ভরযোগ্য সম্বন্ধ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু অবাধ মিলনের সুযোগ দেওয়া হলে এ সম্পর্ককে পবিত্রতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। ইসলাম মানব সমাজকে ব্যভিচারের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শুধু আইনগত দন্ড-বিধানের উপরই নির্ভর করে না। বরং সে জন্য ব্যাপকভাবে সংশোধনমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। যেমন-নারী-পুরুষের পর্দা করা, সংযত হয়ে চলা, অবাধ মেলা-মেশা না করা, শালীন ও মার্জিত পোশাক পরা। বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন, অবিবাহিত থাকাকে নিরুৎসাহিত করা, অন্যের ঘরে প্রবেশে বিধি-নিষেধ আরোপ ইত্যাদি।

আর এই আইনগত দন্ড কেবল শেষ ও চরম ব্যবস্থা হিসেবেই গ্রহণ করে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া এ দন্ডবিধান কার্যকর করার অধিকার অপর কাউকে দেওয়া হয়নি। ইসলামের সকল দন্ডবিধিও শাস্তি দেয়ার অধিকার শুধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের। ইসলামী আইন ব্যভিচারের শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ বলে ঘোষণা করেছে। যেহেতু ব্যভিচার একটি মহাঅপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই ইসলামী আইনে এর শাস্তিও সবচাইতে গুরুতর বলা হয়েছে।

ইসলাম সব সময়ই এ কাজকে ঘৃণার চোখে দেখেছে। এর বীভৎসতা ও মারাত্মক প্রতিক্রিয়াকে অত্যন্ত প্রকট করে দেখিয়েছে। এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে এবং তীব্র নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছে। এর নিকটে যেতেও কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। এ অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করে এমন সব কাজের আশেপাশে ঘোরাফেরা করা এবং এ পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সর্বতোভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে-এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।" (সূরা আল-ইসরা: ৩২) 'কাছেও যেয়ো না'-দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যিনার প্রাককালীন কার্যাবলী এবং ব্যভিচার সহজ ও সম্ভব করে তোলে এমন সব কর্ম হতে দিও না এবং তোমরা নিজেরাও তা করো না। এর ঘৃণ্যতা ও নিষিদ্ধতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে এ আয়াতে-

يوَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ

"তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তারা তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না।" (সূরা আল-ফুরকান : ৬৮)

এখানে ব্যভিচারকে দুটি মহাপাপের সঙ্গে উল্লেখ করে ব্যভিচারের ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকারী হওয়ার শর্তাবলী

আমরা জানি, ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কেবল 'সে ব্যভিচার করেছে', এতটুকুই যথেষ্ট নয়। বরং ব্যভিচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য ইসলামী আইন কতিপয় কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। যাতে সামান্য ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি 'হাদ্দ' মওকুফ হয়ে যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১। ইসলামী শরীআতের অন্যান্য বিষয়ে দুইজন সাক্ষী যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বা 'হাদ্দ' প্রয়োগ করার জন্যে চারজন সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি। সূরা আল-নিসায়, এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরো যে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে, তা হচ্ছে-সাক্ষ্যদাতা যদি মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার উপর 'হাদ্দে কযফ' বা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি জারি করা হবে। অর্থাৎ এরূপ মিথ্যা সাক্ষীদাতাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে। ফলে সামান্য সন্দেহ থাকলেও কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদানে অগ্রসর হবে না।

২। মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া যাবে না।

৩। সরকারীভাবে ব্যভিচার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এমন সব নির্লজ্জতা বন্ধ করতে হবে। ব্যভিচারকে সহজ ও সম্ভব করে এমন সব সুযোগ স্থগিত করতে হবে। অন্যথায় ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

৪। এ শাস্তি সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ছাড়া অপর কাউকে ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং শাস্তি দেওয়ার অধিকার দেয় না। ইসলামী আইন ব্যভিচারের শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ বলে ঘোষণা করেছে। যদি ব্যভিচারের সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, কিন্তু পুরুষ-নারীর অবৈধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিচারক তাদের অপরাধ অনুপাতে দন্ডমূলক শাস্তি বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন।

অবিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি

যে নারী বা পরুষ বিবাহিত নয়, যদি ব্যভিচারের অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে একশতটি বেত্রাঘাত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন-

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

'ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেকে একশত কশাঘাত করবে।" (সূরা আন-নূর : ২)

বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি

সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী আইনে এর শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করা। কারণ বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া জঘন্যতম অপরাধ, তাই এর শাস্তিও কঠিন রাখা হয়েছে।

সারকথা

আমরা জানি-ব্যভিচার একটি জঘন্যতম দন্ডনীয় অপরাধ। মানব সমাজের সুস্থতার জন্যে ইসলাম ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করেছে এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছে। বিবাহের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যারা এ জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়, তা হলে এ শাস্তি উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে কার্যকর হবে। অবিবাহিত নারী-পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে এর শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। আর বিবাহিত হলে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. ব্যভিচার প্রমাণের জন্যে ক'জন সাক্ষীর প্রয়োজন?
ক. ৩ জন
খ. ৫ জন
গ. ৪ জন
ঘ. ২ জন

২. হাদ্দে কাযফ-এর শাস্তি কখন আরোপ করা হবে ?
ক. মিথ্যা কথা বললে
খ. ব্যভিচার করলে
গ. মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে
ঘ. কাউকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিলে।

৩. অবিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে-
ক. ৮০ টি বেত্রাঘাত
খ. ১০০ টি বেত্রাঘাত ও দেশান্তর
গ. ১০০ টি বেত্রাঘাত
ঘ. পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা

৪. ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করবেন-
ক. মুফতীগণ
খ. স্থানীয় লোকজন
গ. সমাজপতিগণ
ঘ. রাষ্ট্রীয় প্রশাসন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তির বর্ণনা দিন।
২. ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হওয়ার শর্তাবলী লিখুন।
৩. বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. ইসলামী শরীআতে ব্যভিচারের শাস্তির বর্ণনা দিন এবং ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হওযার শর্তাবলী লিখুন।

পাঠ-৪

ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ: সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও এর দন্ডবিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ-এর দন্ডবিধি উল্লেখ করতে পারবেন
- ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ বা কাযফের শাস্তি প্রয়োগের শর্তাবলী বর্ণনা করতে পারবেন
- মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহতা

কোন লোককে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করাকে ইসলামী পরিভাষায় কাযফ বলে। ঠাট্টাচ্ছলে বা বিদ্রূপ করে কেউ যদি কাউকে বলে, হে ব্যভিচারী ! অথবা বলে, আমি অমুককে ব্যভিচার করতে দেখেছি। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এই কথাগুলো 'মিথ্যা অপবাদ' পর্যায়ে গণ্য। বস্তুত ইসলামী সমাজে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী নির্দোষ কোন পুরুষ কিংবা নারীর বিরুদ্ধে যদি কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, একমাত্র তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কারণ একজন চরিত্রবান মুমিন পুরুষ বা মহিলার নামে এরূপ উক্তি খুব সাধারণ এবং নগণ্য ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তির উপর এরূপ অপবাদ দেওয়া হয়, এ অপবাদ তার উপর এবং সাথে সাথে গোটা সমাজের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে জনগণের সন্মুখে সে অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রে চিত্রিত হয়। তার লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। হাসি ঠাট্টাচ্ছলে বলা হলেও এ ধরণের কথার জন্য সমাজে জঘন্য ও কুৎসিত চরিত্রের কালো ছায়াপাত ঘটে। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস, অনাস্থা, অভক্তি এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিষস্রোত গোটা সমাজকে পংকিল ও বিষে জর্জরিত করে তোলে। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। স্ত্রী তার স্বামীর চরিত্রের প্রতি আস্থা ও ভক্তি অবিচল রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা তাদের পুত্র বা কন্যার প্রতি এবং পুত্র-কন্যা তাদের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের জন্মের বৈধতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সাংঘাতিকভাবে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এই কারণে ইসলাম এই ধরণের দায়িত্বহীন কথা-বার্তা বলাকে চিরদিনের জন্য অকাট্যভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়, যে এরূপ কাজ করে, তার উপর অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। তাকে বিশ্বাস অযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছে। দুনিয়া ও আখিরাতে তার কঠিনতম আযাবে পরিবেষ্টিত হওয়ার ভয়ও দেখান হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ঘোষণা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ-

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা সাধবী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।" (সূরা আল-নূর : ২৩)

মহানবী (সা.) বলেন-

اجتنبوا السبع المو بقات قالو يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق واكل الربوا واكل مال اليتيم و التولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (بخارى)

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে দূরে সরে থাকবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি ধ্বংসকারী কাজ কী কী? তিনি বললেন: (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা, (৩) আইনের ভিত্তি ছাড়া মানুষ হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের ধনসম্পদ হরণ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা (৭) চরিত্রবতী সহজ-সরল মুমিন মহিলাদের ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

যে ব্যক্তি তার অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না তার শাস্তির ব্যাপারে কুরআন তিনটি নির্দেশ প্রদান করেছে।

এক. তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হবে
দুই. তার সাক্ষ্য কখনও গৃহীত হবে না
তিন. সে ফাসেক হিসেবে চিহ্নিত হবে।
পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"যারা সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।" (সূরা আন-নূর : ৪)

কাযফের শাস্তি প্রয়োগের জন্য শর্তাবলী

কাযফ বা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা হল-

১. দোষারোপকারী প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এ অপরাধ করলে তাকে অন্য কোন শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামী শরীআতের নির্ধারিত এ শাস্তি তার উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

২. দোষারোপকারী সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। কোন পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের উপর এ ধরণের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপভাবে হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর মাধ্যমে নেশা গ্রস্ত (ক্লোরোফরম) ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করা যাবে না।

৩. কারো পীড়াপীড়িতে কাউকে এরূপ অপবাদ দিলে তাকে এর জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। এ অপবাদ তাকে স্বেচ্ছায় দিতে হবে।

৪. হানাফী ফিকহ মতে দোষারোপকারীকে বাক-শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। বোবা ব্যক্তি যদি ইশারা-ইংগিতে অপবাদ দেয়। তবে তার উপর কাযাফের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, বোবা ব্যক্তির ইশারা-ইংগিত যদি সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক হয়- যা দেখে সে কি বলে, তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, তবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে।

৫. অপবাদদাতা ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্যে স্বচক্ষে দেখেছে এমন চারজন সাক্ষী এক সঙ্গে আদালতে উপস্থিত করতে হবে। অন্যথায় তাকে কাযাফ-এর শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬. যার উপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

৭. তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।

৮. তাকে মুসলমান হতে হবে।

৯. তাকে স্বাধীন হতে হবে, ক্রীতদাস হলে চলবে না।

এ শাস্তি কার্যকর করার তাৎপর্য

ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগের 'দন্ড' কার্যকর করার তাৎপর্য এই যে, ব্যভিচারের অভিযোগ তোলা আসলেই জঘন্যতম অপরাধ। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যায়। তাকে সারাটা জীবন কলংকের বোঝা বহন করতে হয়। এই অবস্থা আরও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়-যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মহিলা হয়। এই কলংক শুধু তাকেই ক্ষতি করে না, তার গর্ভজাত সন্তানের মুখকেও কালিমালিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে খতম করে দেয়। এ

জন্য ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগকারীর উপর কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে। এভাবে নারী নির্যাতনের পথকে ইসলাম রুদ্ধ করে দিয়েছে।

সারকথা

কোন নারী-পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ উত্থাপনকে ইসলাম ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। একে শরীআতের পরিভাষায় কাযাফ বলে। কারো প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে খুবই ভয়াবহ। তাই এর প্রতিরোধের জন্য ইসলামের দন্ড বিধান হল-আনীত অভিযোগের উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে অভিযোগকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের দন্ড দিতে হবে এবং তাকে আজীবন সাক্ষীর অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. কাযাফ বল হয়-

ক. ব্যভিচারকারীকে
খ. ব্যভিচারের শাস্তিকে
গ. ইসলামী আইন প্রয়োগ করাকে
ঘ. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদকে।

২. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কাযাফ-এর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে- এটি কার নির্দেশ?

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নির্দেশ
খ. ইমাম বুখারী (র)-এর নির্দেশ
গ. কুরআন-এর নির্দেশ
ঘ. হাদীস-এর নির্দেশ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ঘ, ২. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ বলতে কী বুঝায়? বর্ণনা করুন।
২. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য কী কী শর্ত রয়েছে ? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫

সূরা আল-নূরের ১-১০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সূরা আল-নূরের ১ থেকে ১০ নং আয়াতের সরল অনুবাদ করতে পারবেন
- লি'আন কী এবং লি'আনের বিধান বর্ণনা করতে পারবেন
- তাযীর কী এবং তাযীরের শাস্তি বর্ণনা করতে পারবেন
- হাদ্দ কী তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

١. رَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং যার বিধানকে আমি অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছি। এতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী; যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٢. انِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا۟ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে। আর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহে ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ।

٣. الَّا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ব্যভিচারী ব্যাভিচারিনীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিনী- তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করবে না, মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٤. بِنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।"

٥. .ذِينَ تَابُوا۟ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

٦. الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

هادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

٧. خَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

আর পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।

٨. دْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে যদি চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

٩. ٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ

আর পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।

١٠. وَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

আর তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়।

শব্দার্থ ও টীকা

سورة -একবচন, বহুবচনে سور، سورات
আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

১. পার্থক্য করা, পৃথক করা বা ভিন্ন করা। যেহেতু প্রতিটি সূরা অন্য সূরা থেকে পৃথক তাই একে সূরা বলা হয়।

২. উচ্চতা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেহেতু পবিত্র কুরআনের পাঠকের মর্যাদা প্রতিটি সূরা পাঠ শেষে উঁচু হয় ও বৃদ্ধি পায়, তাই একে সূরা বলা হয়।

৩. খন্ড, অংশ, টুকরা। এ অর্থে আল-কুরআনের প্রতিটি সূরা কুরআনের এক একটি অংশ বা খন্ডস্বরূপ। যেমন-সূরা আল-বাকারায় এসেছে- فأتوا بسورة من مثله

"তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এসো।" এখানে সূরা অর্থ আল-কুরআনের একটি খন্ড বা অংশ।

৪. আরবীতে 'সূর' দুর্গকেও বলা হয়। একটি দুর্গ কয়েকটি মহল ও ঘরকে ঘিরে রাখে। এ হিসেবে আল-কুরআনের অধ্যায়সমূহকে সূরা বলার তাৎপর্য এই যে, প্রতিটি সূরা কতগুলো আয়াতকে যেন দুর্গের ন্যায় ঘিরে রেখেছে, তাই একে সূরা বলা হয়।

৫. সূরা অর্থ বিধান সম্বলিত বাক্য। যেমন- سورة أنزلنها অর্থাৎ আমি বিধান সম্বলিত এই বাণী নাযিল করেছি।

৬. পুস্তকের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ। আল-কুরআনের পরিভাষায় প্রতিটি সূরা কুরআন মাজীদের এক একটি অধ্যায়ের নাম।

انزلنا আমি নাযিল করেছি, নাযিল করেছি। فرضنا আমি এর বিধানাবলীকে ফরয করেছি, অবশ্য পালনীয় করেছি।

أية -এর একাধিক অর্থ রয়েছে-

১. চিহ্ন বা নির্দশন। যেমন আল্লাহ বলেন, ان اية ملكه (তাঁর রাজত্বের নিদর্শন হল)

২. মোজিযা বা অলৌকিকত্ব। যথা আল্লাহ বলেন- فلما جاء هم موسى بأتنا "অতঃপর মূসা যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে মোজিযা নিয়ে আসল।"

৩. উপদেশ বা শিক্ষা। যেমন- সূরা মারইয়ামে বর্ণিত হয়েছে- ولنجعله اية للناس "আমরা এটাকে মানুষের শিক্ষা বা উপদেশ স্বরূপ গ্রহণ করি।"

৪. আয়াত অর্থ আল-কিতাব তথা আল-কুরআন - যেমন সূরা আল-জাসিয়াতে বর্ণিত হয়েছে - يسمع ايات الله تتلى عليه "তিনি তার উপর তিলাওয়াতকৃত আল্লাহর আয়াতসমূহ তথা আল-কুরআন শুনেন।"

৫. আদেশ-নিষেধ অর্থে আয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- সূরা আল-বাকারায় আল্লাহ বলেন كذلك يبين الله اياته "অনুরূপভাবে আল্লাহ তার আদেশ-নিষেধগুলো বর্ণনা করেন।"

৬. আল-কুরআনের প্রবচন (আয়াত) অর্থেও আয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- সূরা আলে-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে-

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَاتٞ مُّحۡكَمَاتٌ

"তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত মুহকাম।" (সূরা আলে ইমরান : ৭)

আয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ

আয়াত বলতে সেই বাক্যকে বুঝায় যার একটি শুরু এবং একটি সমাপ্তি আছে এবং আল-কুরআনের কোন সূরার মধ্যে তা বিদ্যমান। অন্য একটি সংজ্ঞানুযায়ী আয়াত কুরআনের ঐ অংশ যার প্রারম্ভ পূর্ববর্তী হতে এবং সমাপ্তি পরবর্তী হতে বিচ্ছিন্ন। আল-কুরআনের আয়াতগুলো ছেদ চিহ্ন দ্বারা পরস্পর বিযুক্ত হয়ে থাকে।

فاجلدوا - তোমরা বেত্রাঘাত কর, কশাঘাত কর, دين - জীবন ব্যবস্থা, জীবন বিধান, জীবন যাত্রা প্রণালী, অভ্যাস, পরিণাম, আনুগত্য, এখানে دين الله - বলতে আল্লাহ পাকের বিধানকে বুঝানো হয়েছে, كنتم تؤمنون - তোমরা ঈমান এনে থাক বা বিশ্বাস কর, وليشهد - প্রত্যক্ষ করা উচিত, উপস্থিত থাকা উচিত, طائفة - দল, কোন কিছুর অংশ বিশেষ, খন্ড, এক মত ও এক ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী।

لا ينكح - সে বিবাহ করে না حرم - নিষিদ্ধ করা হয়েছে, يرمون - অপবাদ আরোপ করে, দোষারোপ করে, মিথ্যা অপবাদ রটায়, محصنات - সতী-সাধ্বী নারীরা, لم يأتوا - তারা উপস্থিত করতে পারে না। شهداء সাক্ষীসমূহ, ثمانين - আশি شهادة -সাক্ষ্য।

تابوا - তারা তাওবা করল, প্রত্যাবর্তন করল, اصلحوا - তারা সংশোধন হল, ভাল হল, غفور - ক্ষমাশীল, ازواج - স্ত্রীগণ, انفسهم - নিজেরাই, صادقين - সত্যবাদীগণ, প্রত্যয়ীগণ।

لعنة الله - আল্লাহ্‌র লা'নত, আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত, عليه -তার উপর, كاذبين - মিথ্যাবাদী।

يدرؤا - দূরীভূত করা হবে, অব্যাহতি দেওয়া যাবে, غضب الله - আল্লাহ্‌র গযব, ক্রোধ, ঘৃণা ও অভিসম্পাত, لولا যদি না, فضل অনুগ্রহ, رحمة - রহমত, করুণা, অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি।

تواب - অধিক তাওবা গ্রহণকারী, حكيم -অতীব প্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞানময়, সুবিজ্ঞ, কুশলী, মহাবিজ্ঞানী।

মিথ্যা অপবাদ ও শাস্তি সম্পর্কিত কতিপয় ইসলামী পরিভাষা

ملاعنة/لعان (লি'আন/মুলা'আনা)

'লিআন' একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত ও বদদোয়া করা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয় বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকবার শপথ করা এবং সব শেষে মিথ্যুক হলে নিজেকে অভিশাপ দেওয়ার নাম লি'আন। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করে অথবা তার প্রসবকৃত সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার ঔরসজাত নয়, অপরদিকে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে এবং মিথ্যা অপবাদের

শাস্তি দাবি করে, তখন স্বামীকে তার দাবির সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথা নিয়মে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে, তখন তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের 'শাস্তি' প্রয়োগ করা হবে।

لعان (লি'আন) এর পদ্ধতি

প্রথমে স্বামীকে বলা হবে, সে যেন তার দাবির অনুকূলে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে। আর সে যদি যথানিয়মে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তখন নিজেকে সত্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য চারবার শপথ করবে এবং পঞ্চমবার বলবে- 'সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক'। স্বামী যদি এসব শপথ করা থেকে বিরত থাকে, তবে সে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উক্ত ভাষায় পাঁচবার শপথ ও নিজেকে লা'নত না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। যদি সে মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে তবে তার উপর অপবাদের দন্ড প্রয়োগ করা হবে।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি কুরআনে বর্ণিত নিয়মে চারবার শপথ করে ও পঞ্চমবার লা'নত করে, তবে স্ত্রীর কাছ থেকেও কুরআনে বর্ণিত নিয়মে চারবার শপথ ও পঞ্চমবার লা'নত করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর অভিযোগ স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। যদি সে অপরাধ স্বীকার করে, তবে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

আর যদি উক্ত ভাষায় শপথ করতে সম্মত হয় এবং শপথ করে তবে লি'আন পূর্ণতা লাভ করবে এবং ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তি থেকে উভয়ই বেঁচে যাবে। আর তাদের মধ্যে লি'আনের পূর্ণতার কারণে একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। তখন স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। তারপর তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ আর কখনও হতে পারবে না।

تعزير (তা'যীর)

এটি একটি আরবী শব্দ। ইসলামে যে সব অপরাধের কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি বা কাফফারার ব্যবস্থা নির্ধারিত নেই, সে সব অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারপতি বা আইনসভা কর্তৃক আরোপিত শাস্তিকে তা'যীর বলে। মিথ্যা সাক্ষ্যদান, ঘুষ গ্রহণ, সুদী কারবার বা লেনদেন করা, আমানতের খিয়ানত করা, পণ্য- দ্রব্যে বা ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা, অপরাধীদের গোপনে সাহায্য করা, কারো প্রতি যিনা ছাড়া অন্যকোন অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ করা, সালাত, সাওম, যাকাত প্রভৃতি ফরয কাজ ত্যাগ করা, স্বামী-স্ত্রী বা মাহরাম (যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয়) ছাড়া কোন পুরুষ ও মহিলা নিবিড় স্থানে বসে গল্প গুজব করা বা ঘোরাফেরা করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য অনির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগকে তা'যীর বলে।

তা'যীর বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে

প্রথমত : সরকারীভাবে কঠোর ভর্ৎসনা, ভীতি-প্রদর্শন আধুনিক ভাষায় মুচলেকা দান ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : বড়-বড় অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তি। যেমন - বেত্রাঘাত, আটক, আর্থিক জরিমানা, চাকরিচ্যুতি বা সাময়িক বরখাস্ত, দেশ থেকে নির্বাসন এবং অপরাধী সম্পর্কে প্রচার চালানো এগুলো অনির্ধারিত শাস্তি। বিচারক অপরাধ অনুসারে তার শাস্তি প্রদান করবেন।

حد (হাদ্দ)

হাদ্দ একটি আরবী শব্দ। আল-কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস সাতটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা নির্ধারণ করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসন-কর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'হাদ্দ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত হয়নি, বরং শাসন কর্তা বা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের ধরণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্যে যথেষ্ট মনে করেন, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারেন, যাকে শরীআতের ভাষায় তা'যীর বলে।

ইসলামে শাস্তিযোগ্য অপরাধ

যে সব অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তা মোট সাতটি - (১) চুরি (২) কোন সতী সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ (৩) মদ্যপান (৪) সন্ত্রাস বা ডাকাতি (৫) হত্যা (৬) ইসলাম ধর্মত্যাগ (৭) ব্যভিচার।
এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধ স্ব-স্ব স্থানে গুরুতর ও ভয়াবহ। জগতের শান্তি-শৃংখলার জন্যে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি। কিন্তু সবগুলোর মধ্যে ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানব সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন আঘাত হানে তেমনটি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে ঘটে না।

এ পাঠের শিক্ষা

১. ব্যভিচার সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা ধ্বংসকারী একটি জঘন্য অপরাধ, যা সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পরিবারের ভাঙ্গন এবং বিবাহের প্রতি নারী পুরুষের মধ্যে তীব্র অনীহা সৃষ্টি করে।

২. ব্যভিচার নৈতিকতার দিক থেকে পাশবিক, ধর্মীয় দৃষ্টিতে মহাপাপ এবং একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। সূরা আল-নূরে এটাকে ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য করে এর শাস্তির বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছে।

৩. ইসলামে বিবাহিত নর-নারীকে ব্যভিচারের অপরাধে 'রাজম' অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান নির্ধারিত রয়েছে।

৪. ইসলামী আইন সরকার ছাড়া আর কাউকে ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয় না। একমাত্র আদালতই পারে কাউকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করতে। জনগণকে এ শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, বরং আয়াতে শাসকবৃন্দ ও বিচারপতিগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

৫. ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সঙ্গে সতী নারী-পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ করে সামাজিকভাবে তাদেরকে বয়কট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তাওবা ও নৈতিক সংশোধন করার পর সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে না। এ দোষ হতে সে পবিত্র হয়ে যাবে।

৬. কোন ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা জঘন্য অপরাধ। এ মিথ্যা অপরাধ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে এ অপবাদের শাস্তি হিসেবে অপবাদদাতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. লি'আন শব্দের অর্থ হচ্ছে-
ক. সরকারীভাবে বিচার করা
খ. কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া
গ. স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি অভিশম্পাত করা
ঘ. অন্যায় করা

২. তা'যীর বলতে বুঝায়-
ক. অপরাধীকে বেত্রাঘাত করা
খ. অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া
গ. অপরাধ যাচাই করা
ঘ. অপরাধের জন্য অনির্ধারিত শাস্তি

৩. যে সব অপরাধের শাস্তি শরীআতে নির্ধারিত রয়েছে তাদের সংখ্যা
ক. ৪ টি
খ. ৫ টি
গ. ৩ টি
ঘ. ৭ টি

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. গ, ২. ঘ, ৩. ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. ব্যভিচারের শাস্তি ও এর আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।
২. লি'আন কাকে বলে? এর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৩. তা'যীর কাকে বলে? লিখুন।
৪. হাদ্দ কাকে বলে? ইসলামী শরীআতে কোন কোন অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে তা লিখুন।
৫. টীকা লিখুন. سورة، أيات، محصنات، لعان، تعزير، حد

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. সূরা আল-নূরের ১-৫ পর্যন্ত আয়াতের সরল অনুবাদ করুন।
২. সূরা আল-নূরের ৫-১০ পর্যন্ত আয়াতের সরল অনুবাদ করুন।
৩. লি'আন কাকে বলে? লি'আনের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. তা'যীর ও হাদ্দ বলতে কী বুঝায়? হাদ্দ ও তা'যীরের শাস্তির বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

সূরা আল-নূরের ১১-২০ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সূরা আল-নূরের ১১ থেকে ২০ নম্বর আয়াতের সরল অনুবাদ করতে পারবেন
- ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের পরিণাম বলতে পারবেন
- ইফকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট ছিল তা প্রমাণ করতে পারবেন।

١١. إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلَّىٰ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; তোমরা একে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকাজের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।

١٢. لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ

যখন তারা একথা শুনল তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণ নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না কেন? আর কেনই বা বলল না যে, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ।

١٣. لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।

١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যদি না থাকত, তা হলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে সেজন্য মহাশাস্তি তোমাদের স্পর্শ করতো।

١٥. إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ

যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছজ্ঞান করছিলে যদিও আল্লাহ্‌র কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

١٦. وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ

আর যখন তোমরা একথা শুনেছিলে তখন কেন বলে দিলে না 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র, মহান। এতো এক গুরুতর অপবাদ।'

١٧. مُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, যদি তোমরা মুমিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করোনা।

١٨. يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

٢٠. وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আর আল্লাহ অতীব দয়ালু পরম করুণাময়।

শব্দার্থ ও টীকা

ان - অবশ্যই, الذين - যারা, جاءوا بالإفك - মিথ্যা অপবাদ রচনা করল, إفك - মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা অভিযোগ, মনগড়া কথা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

افك - এ শব্দের আভিধানিক অর্থ -মূল কথাকে উল্টিয়ে দেওয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত যা ইচ্ছে তা বলে দেওয়া, জঘন্য মিথ্যা অপবাদ, সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যরূপে বদলিয়ে দেওয়া এবং ন্যায়-পরায়ণ আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে ফাসিক ও ফাসিক ব্যক্তিকে আল্লাহভীরু-পরহেযগার হিসেবে আখ্যায়িত করা।

عصبة -দল, এখানে মুনাফিকদের দলকে বুঝানো হয়েছে, لا تحسبو - তোমরা মনে করো না, ধারণা করো না। فحشاء - সীমাসংঘন, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, ঘৃণিত, লজ্জাকর কার্য, কুকর্ম, অশ্লীলতা যা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এজন্য ইসলামে যাবতীয় অশ্লীল কার্য থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ এসেছে।

يعلم - তিন (আল্লাহ) জানেন। لا تعلمون - তোমরা জান না। رؤوف - অধিক দয়াবান رحيم- দয়াবান, দয়ালু, হেশীল, আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম।

আয়াতসমূহের শানে নুযূল

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (স) যখন বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসীর যুদ্ধে গমন করেন, তখন উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ইত:পূর্বে নারীদের পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই এ সফরে হযরত আয়েশা (রা) -এর জন্য উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হতেন, এরপর উটের চালক আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। এটাই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পথে এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কোন এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতের দিকে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। সবাইকে প্রস্তুত হতে বলা হলো। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে গেলেন। ঘটনাক্রমে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। তিনি গলার হার খোঁজ করতে গিয়ে বেশ কিছু সময় বিলম্ব করে ফেলেন। ইতোমধ্যে কাফেলা তাঁকে রেখে সে স্থান ত্যাগ করে। তাঁর উট চালকও যথারীতি যাত্রা শুরু

করেন। সে ধারণা করেছিল যে, হযরত আয়েশা (রা) হাওদার ভেতরেই আছেন। কেননা হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন ক্ষীণকায়, তাঁর দেহের ওজন ছিল অত্যন্ত হালকা। তাই বাহকগণ তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারেননি। তারা মনে করেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা) হাওদার মধ্যেই রয়েছেন এবং তাঁকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) সে স্থানে ফিরে এসে দেখেন কাফেলা সেখান থেকে চলে গেছে। তখন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন- তিনি কাফেলার পেছনে না দৌড়ে স্ব-স্থানে চাদর মুড়িয়ে বসে থাকলেন। তিনি ভাবলেন, প্রিয় নবী (স) যখন তাকে পাবেন না, তখন তাঁর খোঁজে নিশ্চয় এখানেই লোক পাঠাবেন। সেজন্য তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করাই সমীচীন মনে করলেন। তখন সময় ছিল শেষ রাত। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

প্রিয় নবী (স)-এর যাবতীয় কাজ ছিল অত্যন্ত সুশৃংখল। কাফেলার কোন কিছু যেন ভুলক্রমে রাস্তায় পড়ে না থাকে তার জন্য তিনি একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতেন, সে সবার শেষে রওয়ানা হতো। কোন কিছু পড়ে থাকলে সে তা কুড়িয়ে নিয়ে আসত। এ সফরে হযরত সাফওয়ান ইবন মুয়াত্তালকে (রা) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফেরার পথে অতি প্রত্যুষে সাফওয়ান একজনকে চাঁদর মুড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। তিনি কাছে এসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-কে দেখতে পান, তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠেন- 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। হযরত সাফওয়ানের (রা) মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্যটি শোনা মাত্রই হযরত আয়েশা (রা) জেগে উঠেন। হযরত সাফওয়ান (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উটটি হযরত আয়েশার (রা) সামনে এসে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) উটের পিঠে পর্দা করে বসে পড়লেন। হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে পায়ে হেটে সামনের দিকে হাটতে লাগলেন এবং দুপুরের সময় মূল কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন। এটাই ছিল প্রকৃত ঘটনা।

মিথ্যা অপবাদের রটনা

মুনাফিকরা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত। তাই তারা তিলকে তাল বানিয়ে মিথ্যা রটনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা পাপাত্মা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা) নামে মিথ্যা অপবাদের ঝড় তোলে। মুনাফিকদের এ ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্মজালে কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও জড়িয়ে পড়েন। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান ও মিসতাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রটে যাওয়া অপবাদে স্বয়ং মহানবী (স) খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার (রা) তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনার ঝড় বইতে থাকল। অবশেষে মহান আল্লাহ হযরত আয়েশার (রা) পবিত্রতা বর্ণনায় ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশ গ্রহণকারীদের নিন্দায় সূরা আল-নূরের ১১ থেকে ২০তম আয়াত পর্যন্ত দশটি আয়াত নাযিল করেন।

এ পাঠের শিক্ষা

১. মুনাফিকরা নিকৃষ্ট লোক, তারা সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মুসলমান নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে কিন্তু সময়মত তাদের আসল চেহারার প্রকাশ ঘটায়। তাই মুনাফিকদের প্রচারণায় বা রটনায় মুমিনদের কান দেওয়া উচিত নয়।

২. কোন ঘটনা প্রচার করার পূর্বে তা সত্য কি মিথ্যা তা ভালভাবে যাচাই করা আবশ্যক।

৩. ইফকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর পবিত্র চরিত্রের উপর মুনাফিকরা কালিমা লেপন করার জন্য এ মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা।

৪. কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া জঘন্য অপরাধ। ইসলামী আইনে এটি ফৌজদারী দন্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত। একজন মানুষের মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু যাতে হানি না হয়, সে জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে।

৫. যদি কারও সম্পর্কে কোন মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়, আর সেটা রটতে থাকে তবে প্রতিটি মুমিনের উচিত, রটনাকারীকে এ বিষয়ে বলাবলি না করে চুপ থাকার উপদেশ প্রদান করা এবং নিজেও এ ব্যাপারে চুপ থাকা।

৬. দলিল-প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা বা তার পুনরাবৃত্তি করা মুমিনদের জন্যে উচিত নয়।

৭. যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তার কামনা করে, তারা অভিশপ্ত। তাদের জন্যে রয়েছে ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

৮. মুসলিম সমাজে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরস্পর শুভ ধারণা পোষণ করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্দোষ মনে করতে হবে। দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে এ মর্যাদা পেতে থাকবে। প্রমাণ ছাড়া কাউকে অপরাধী মনে করা ইসলামে বৈধ নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. ইফক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-
ক. মূল কথাকে উল্টিয়ে দেয়া
খ. ভাবার্থ পরিবর্তন করা
গ. ছোটকে বড় করে বর্ণনা করা
ঘ. কোন কিছুর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা

২. মুমিনদের মধ্যে যারা মিথ্যা রটনায় লিপ্ত থাকে তারা হল-
ক. ফাসিক
খ. কাফির
গ. মুনাফিক
ঘ. অভিশপ্ত

৩. 'প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে' এটি কার শিক্ষা ?
ক. সাহাবীদের
খ. হাদীসের
গ. আল-কুরআনের
ঘ. ইমামগণের

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. ক, ৩. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. ইফকের ঘটনাটি লিখুন।
২. মিথ্যা রটনায় কারা জড়িত ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩. টীকা লিখুন : فحشاء، إفك، عصبة
৪. এ পাঠের শিক্ষা আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. এ পাঠের অন্তর্ভুক্ত আয়াতগুলো নাযিলের কারণ বর্ণনা করুন। এ পাঠ থেকে আপনি কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন তা লিপিবদ্ধ করুন।
২. সূরা আল-নূরের ১১-১৫ আয়াত পর্যন্ত সরল অনুবাদ করুন।
৩. সূরা আল-নূরের ১৬-২০ আয়াত পর্যন্ত সরল অনুবাদ করুন।

পাঠ-৭

সূরা আল-নূরের ২১-২৯ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সূরা আল-নূরের ২১ থেকে ২৯ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- সতী-সাধ্বী মুমিন নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদের পরিণতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- অপরের ঘরে প্রবেশ করার শিষ্টাচারের বিধান বর্ণনা করতে পারবেন
- পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামী বিধান বর্ণনা করতে পারবেন।

٢١. يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে, শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেবে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যদি না থাকত, তা হলে তোমাদের কেউই পবিত্র হতে পারতে না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢. وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী ও ঐশ্বর্যবান তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আপন আত্মীয়-স্বজন ও অভাব, গ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে কিছু দিবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াময়।

٢٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

٢٤. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্‌বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

٢٥. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ

সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।

٢٦. ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।

٢٧. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে মুমিনগণ ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কারো ঘরে ঘরবাসীর অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো না, তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

٢٨. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

٢٩. لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

যে ঘরে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

শব্দার্থ ও টীকা

يأمر - নির্দেশ দেয়, আদেশ করে। يزكى - পবিত্র করেন, সংশোধন করেন। يؤتوا নামপুরুষ, বহুবচন, পুংবাচক, বর্তমান-ভবিষ্যতকাল ক্রিয়া। অর্থ-দেবে, দেয়া। ليعفوا -বহুবচন, নামপুরুষ, পুংবাচক, আদেশসূচক ক্রিয়া, অর্থ-ক্ষমা করা উচিত। ليصفحوا বহুবচন, নামপুরুষ, অনুরোধ সূচক ক্রিয়া, অর্থ-অপরাধ ক্ষমা করা উচিত, বিমুখ হওয়া উচিত, পরিহার করা হোক, উপেক্ষা করুক। يومئذ- সেদিন, যেদিন, ঐদিন, নির্দিষ্ট কোন দিন। يوفى - নাম পুরুষ, একবচন, পুংবাচক, বর্তমান-ভবিষ্যতকাল ক্রিয়া অর্থ-পুরোপুরি দেবে, পুরো করবে। دين - ধর্ম, জীবনযাত্রা ও জীবন প্রণালী, অভ্যাস, হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান, হুকুম, বিধান। حتى- যতক্ষণ পর্যন্ত।

এ পাঠের শিক্ষা

১. শয়তান মানুষের ঘোর শত্রু। সে মানুষকে বিপথগামী করার কাজে সদা লিপ্ত। মন্দ কাজের মাধ্যমে শয়তানের অনুসরণ করা হয়। যে কেউ শয়তানের অনুসরণ করবে সে নির্লজ্জতা, মন্দ ও পাপাচারের প্রতি বেশি আকৃষ্ট থাকবে। তাই সৎ কাজ করে সর্বদা শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা কর্তব্য।

২. ঐশ্বর্যশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিরা, গরীব আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করবে। তাদের অপরাধ ক্ষমা ও মার্জনা করবে। যদি কোন ব্যক্তি সাহায্য গ্রহণ করার পরও বিরোধিতা করে বা কুৎসা রটনা করে তবুও তার প্রতি দয়া দেখাতে হবে এবং সাহায্য দেওয়া অব্যাহত রাখতে হবে। সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ অপরাধীদের ক্ষমা করে থাকেন। সুতরাং সকলেরই উচিত উদারতা, মহানুভবতা ও ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করা।

৩. সতী-সাধ্বী, মুমিন, সহজ সরল, চরিত্রবান, ভদ্র স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা কোন চাতুরী জানে না, যাদের অন্তর পবিত্র, যাদের চরিত্র কলুষতা ও পাপ থেকে মুক্ত এমন মহিলাদের উপর চরিত্রহীনতার অপবাদ দেয়া জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ। যারা এরূপ কাজ করবে তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত হবে এবং কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে।

৪. এ পাঠে বিবাহ সম্পর্কিত একটি বিশেষ আইনের উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে, দুশ্চরিত্রা নারীগণ দুশ্চরিত্র পুরুষদেরকে বিয়ে করবে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষগণ দুশ্চরিত্রা নারীদেরকে বিয়ে করবে। আর সৎচরিত্রা নারীগণ সৎচরিত্র পুরুষগণকে বিয়ে করবে এবং সৎচরিত্র পরুষগণ ও চরিত্রহীনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কারণ দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্র নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবন সঙ্গী খোঁজ করে আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে দুশ্চরিত্র নারী-পুরুষ যদি তাওবা করে, তাহলে তাদের সঙ্গে সচ্চরিত্র নারী-পুরুষ এর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

৫. বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কারণ অনুমতি নিয়ে অপরের গৃহে প্রবেশ করা আল্লাহর একটি অপরিহার্য বিধান। কারো সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে প্রথমে অনুমতি নিবে এবং সালাম দিবে। আর এটিই দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সামাজিক রীতি-নীতি এবং শিষ্টাচার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. দুশ্চরিত্র পুরুষগণ দুশ্চরিত্রা-নারীদের বিয়ে করবে এটি কার বিধান?
ক. আল্লাহর
খ. হযরত উমর (রা)-এর
গ. রাসূল (স)-এর
ঘ. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর

২. শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য কী করা দরকার?
ক. প্রার্থনা করা
খ. আল্লাহকে স্মরণ করা
গ. সৎকাজ করা
ঘ. সব কটি উত্তরই সঠিক

৩. চরিত্রবান চরিত্রহীনদের মধ্যে বিয়ে-
ক. বৈধ
খ. হারাম
গ. মাকরূহ
ঘ. মোবাহ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. ঘ, ৩. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. ২২ নং আয়াতের অনুবাদ করুন।
২. অপরের ঘরে প্রবেশ করার ইসলামী বিধান বর্ণনা করুন।
৩. সূরা আল-নূরের আলোকে দুশ্চরিত্রবান নারী-পুরুষদের বিয়ে সম্পর্কিত ইসলামী বিধান আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. এ পাঠে ২১ নম্বর হতে ২৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত অনুবাদ করুন এবং-এর শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

পাঠ-৮

সূরা আল-নূরের ৩০-৩৩ নং আয়াতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সূরা আল-নূরের ৩০-৩৩ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- নারী-পুরুষের পর্দা সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করতে পারবেন
- বিয়ে করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- দাস-প্রথার বিলুপ্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে পারবেন।

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٣١. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

মুমিন নারীদের বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল সেসব সৌন্দর্য ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর তারা যেন নিজেদের গ্রীবা ও বক্ষদেশের উপর ওড়না টেনে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর পুত্র, বোনের পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী এবং যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ এবং সে সব বালক যারা স্ত্রীলোকের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, তাদের ব্যতীত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।

٣٢. وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ

ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সামর্থ্যবান করে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেন সংযত অবলম্বন করে। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে তার সাথে চুক্তিপত্র কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাও। তাদেরকে সেই ধন-সম্পদ হতে দান কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা তোমাদের দাস-দাসীগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে বৈষয়িক স্বার্থের জন্য পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করো না। আর যে কেউ তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করবে, তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

শব্দার্থ ও টীকা

يغضن - নিচু করে। নত করে, দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে, لايبدين- প্রকাশ করে না, زينة- সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা ماظهر منها- অর্থাৎ যা আপনা হতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত প্রকাশ পায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ উপরের কাপড়, যেমন বোরকা বা চাদর। হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে মানুষ যা স্বভাবগত প্রকাশ করে থাকে। যেমনঃ মুখমন্ডল ও হাত। কুদুরী, শরহে বিকায়াহ ও হিদায়া প্রভৃতি ফিকহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, পুরুষ লোক মুহাররম নয় এমন নারীর চেহারা ও হাত ছাড়া তার শরীরের কোন অঙ্গের দিকে তাকাতে পারবে না।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ - তারা যেন বক্ষদেশ ওড়না দ্বারা ঢেকে রাখে। ليستعفف - নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা উচিত। সচ্চরিত্রবান থাকা উচিত। البغاء - পতিতাবৃত্তি, অবাধ্যতা, অমান্য করা। ان اردن- তারা যদি চায়, যদি ইচ্ছা করে, যদি কামনা করে। تحصنا - সতীত্ব রক্ষা করা, দুর্গে আবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা করা, চরিত্রবতী থাকা।

এ পাঠের শিক্ষা

১. নারী ও পুরুষকে তাদের স্ব-স্ব দৃষ্টিকে সংযত এবং লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিজের স্ত্রী বা মাহরাম স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কোন নারীকে, অনুরূপভাবে নিজের স্বামী বা মাহরাম ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে চোখ ভরে দেখা নারী-পুরুষের জন্য অবৈধ। এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপকে ইসলাম চোখের যিনা বলে অভিহিত করেছে।

২. নারীরা অবাধে যত্রতত্র সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবে না। তারা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবে, তবে তাদেরকে সংযত হয়ে মাথা ও বক্ষ উড়না বা চাদর দ্বারা আবৃত করে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা লুকিয়ে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই তা প্রকাশ করা যাবে না। ইচ্ছা করে রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ ও বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা দোষণীয় নয়। যাদের সম্মুখে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে, তাদের তালিকা নিম্নরূপ-

ক. স্বামী
খ. পিতা, দাদা, দাদার পিতা, নানা, নানার পিতা
গ. নিজের ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে
ঘ. স্বামীর পিতা
ঙ. স্বামীর ছেলে নাতী, নাতির ছেলে
চ. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই
ছ. ভাই-বোনদের ছেলে। এখানে তিন ধরনের ভাই-বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে
জ. মালিকানাধীন দাসী অথবা পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ

ঞ. এমন শিশু যারা নারীদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যৌনতা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

২. সমাজে নারী-পুরুষদের অবিবাহিত অবস্থায় থাকাকে নিন্দা করা হয়েছে। যারা বিবাহের উপযুক্ত অথচ বিবাহ হয়নি, তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য অভিভাবকদের আদেশ করা হয়েছে। ক্রীতদাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যও মালিকদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাদের বিবাহ করার আর্থিক সক্ষমতা নেই, সামাজিকভাবে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ইসলাম দাস প্রথার মূলোৎপাটনে সচেষ্ট। ইসলাম চায় না এক মানুষ অপর কোন মানুষের দাস হয়ে বেঁচে থাকুক। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিধান হল- কোন ক্রীতদাস-দাসী যদি দাসত্ব হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে মনিবকে কিছু অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করে বা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায় তবে মনিবকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তার মুক্তির ব্যবস্থা করা। সমাজের বিত্তবানদের উচিত তাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদের মুক্ত করে দেওয়া। সমাজের অন্যান্য লোকদের উপরও দায়িত্ব, দাস-দাসীদের মুক্ত করার জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

৪. বেশ্যাবৃত্তি একটি বিকৃত সামাজিক অপরাধ এবং নারী নির্যাতনও বটে। কোন সুস্থ সমাজ এহেন গর্হিত কাজ সমর্থন করতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি সমাজে নারীদের বা দাসীদের ব্যভিচার বা বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করে এবং দেহ ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপার্জন করে, তবে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলাম এরূপ অর্থোপার্জনকে কঠোভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং সমাজ থেকে ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তবে যে সমস্ত মহিলা বা দাসীদেরকে জোরপূর্বক এ কাজে নিয়োজিত করা হয় আল্লাহ তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, যদি তারা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. ইসলামে পতিতাবৃত্তির বিধান কী?
ক. পতিতাবৃত্তি বিদআত
খ. পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ
গ. পতিতাবৃত্তি মাকরূহ
ঘ. পতিতাবৃত্তি সব সময় বৈধ

২. ইসলামে দাসপ্রথার বিধান কী ?
ক. দাসপ্রথার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে
খ. একটি ঘৃণ্যতম কাজ
গ. দাসপ্রথার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে
ঘ. সামাজিকভাবে কোন অপরাধ নয়

৩. বিবাহ সম্পর্কে ইসলামী বিধান কী ?
ক. সামর্থ্য থাকলে বিবাহ করা ওয়াজিব
খ. বিবাহ করা রাসূলের সুন্নাত
গ. বিবাহ করা ফরয
ঘ. বিবাহ করা মাকরূহ

৪. যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী ?
ক. তারা বেশী বয়সে বিয়ে করবে
খ. তারা বিয়ে করবে না
গ. তারা সংযম অবলম্বন করবে
ঘ. তারা বেশী উপার্জন করবে

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. খ, ২. ক, ৩. খ, ৪. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. ইসলামে দাসপ্রথার বিধান লিখুন।
২. ৩০ নং আয়াতের অনুবাদ লিখুন।
৩. 'ইসলামে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ, ব্যাখ্যা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. সূরা আল-নূরের আলোকে পর্দা সংক্রান্ত বিধান আলোচনা করুন।
২. এ পাঠ থেকে আমরা কি জানলাম তা বিস্তারিত লিখুন।

ইউনিট ৩

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

ভূমিকা

আল-কুরআন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল হয়। আল-কুরআন মানব জাতির পথপ্রদর্শক। আল-কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সব কিছু বর্ণনা করেছেন। আল-কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিরন্তন মুজিযা। আল-কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ পৃথিবীবাসী আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়টি কল্পনাও করতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও আল-কুরআন নিয়ে অবিশ্বাসীরা করে আসছে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র। আজও ষড়যন্ত্রের শেষ হয়নি। আল-কুরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই ষড়যন্ত্রকারীদের সীমাহীন ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল-কুরআনের কোন বিকৃতি বা সংযোজন বা বিয়োজন তারা করতে পারেনি, কোন দিন পারবেও না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আল-কুরআনের সত্যতা প্রতিদিনই মানুষকে বিশ্বাসী করে তুলছে। আল-কুরআন চির কল্যাণময় এক মহাগ্রন্থ। তাই তো আল-কুরআনের প্রশংসায় ফরাসী মণীষী বলেন-"কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং আইন বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।" এ কুরআন বিশ্ব মানবের জন্য হিদায়াত গ্রন্থ। এ কুরআন অন্ধকার থেকে মানুষকে জ্ঞান ও আলোর পথে নিয়ে আসে। আলোচ্য ইউনিটে আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক কতিপয় আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কয়টি আয়াতের অনুসরণ করলেও মানবজাতি হিদায়াত পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে আলোচ্য ইউনিটকে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১ : আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত আয়াত
- পাঠ-২ : আল-কুরআন আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ সম্পর্কিত আয়াত
- পাঠ-৩ : রাসূল (সা)-এর আনুগত্য বিষয়ক আয়াত
- পাঠ-৪: নেতার আনুগত্য সম্পর্কিত আয়াত
- পাঠ-৫: মানব মর্যাদা সম্পর্কিত আয়াত
- পাঠ-৬: মানবাধিকার সংক্রান্ত আয়াত
- পাঠ-৭: দুঃস্থ মানবতার সেবা সংক্রান্ত আয়াত
- পাঠ-৮: ঐক্য ও সংহতি সংক্রান্ত আয়াত

পাঠ ঃ ১

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কিত আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- সূরা আলে ইমরান- ২৬, সূরা আল-ফুরকান-২ ও সূরা আল-হাশরের ২৩ নং আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- কল্যাণ-অকল্যাণ সবই আল্লাহর করায়ত্তে-তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান-এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন
- বর্ণিত আয়াতসমূহের শব্দার্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা লিখতে পারবেন
- আল্লাহ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

١. لِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة ال عمران -٢٦)

٢. لَّذِى لَهُ مُلْكُ َمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (سورة الفرقان-٢)

٣. وَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلاَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورة الحشر-٢٣)

অনুবাদ

১. বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও ; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি অপমান কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান : ২৬)

২. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি ; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা আল-ফুরকান : ২)

৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। (সূরা আল-হাশর : ২৩)

শব্দার্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা

اللهم - মূলে ছিল يا الله তাশদীদযুক্ত মীম, حرف النداء - يا-এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থ- হে আল্লাহ।

مالك الملك - مالك শব্দটি اسم جنس আল্লাহর গুণবাচক নাম। مالك الملك অর্থ সাম্রাজ্যের মালিক। কেউ বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। এখানে ملك অর্থ নবুওয়াত, কেউ বলেন, বিজয়, কেউ বলেন, সম্পদ ও ক্রীতদাস-দাসী।

تؤتى - অর্থ-আপনি দান করেন। এটা واحد مذكر حاضر এর শব্দ, বহাছ اثبات فعل مضارع معروف - فتح মাছদার।

تنزع - অর্থ কেড়ে নেন, পদচ্যুত করেন। এটা واحد مذكر حاضر এর শব্দ। বহছ اثبات فعل مضارع معروف - বাবে ضرب , মাছদার النزع মূল অক্ষর (ن – ز – ع) জিনসে সহীহ।

تعز - অর্থ আপনি সম্মান দান করেন। এটা واحد مذكر حاضر এর শব্দ। বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে افعال - মাছদার, اعزاز মূল অক্ষর (ع – ز – ز) জিনস مضاعف ثلاثى

لم يتخذ - অর্থ তিনি গ্রহণ করেননি। এটা واحد مذكر غائب এর শব্দ, বহছ نفى جحد بلم فعل مستقبل معروف বাবে افتعال - মাছদার الاتخاذ - বাবে افتعال এর فاء كلمة হামযা বর্ণ আসায় همزة কে تاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং تاء কে تاء এর মধ্যে ادغام করা হয়েছে। الاتخاذ হয়েছে। মূল অক্ষর (أ – خ – ذ) جنس مهموز

القدوس - এটা اسم فاعل مبالغة এর শব্দ فعول এর ওজনে। আল্লাহর গুণবাচক নাম। এর অর্থ যিনি সকল দোষমুক্ত।

السلام শব্দটি باب تفعيل এর মাছদার, অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা। তিন অর্থে আল্লাহকে সালাম বলা যেতে পারে। ১। জুলম অত্যাচার হতে আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন।
২। সব ধরনের দুর্বলতা ও দোষ হতে তিনি নিরাপদ।

৩। যিনি স্বীয় বান্দাদেরকে জান্নাতে সালামদাতা, যেমন তিনি বলবেন سلام قولا من رب رحيم কেউ বলেন, আল্লাহর সালাম অর্থ স্বীয় বান্দাদেরকে শান্তিদাতা।

সার্বভৌমত্বের অর্থ

Sovereignty বা সার্বভৌমত্ব শব্দটি উচ্চতর ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কিংবা প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁর নির্দেশই আইন। আর এই আইন রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর জারি করার সর্বময় কর্তৃত্ব তারই। নাগরিকরা তার শর্তহীন আনুগত্য করতে বাধ্য। তা ইচ্ছায় হোক কিংবা বাধ্য হয়ে হোক। তার নিজের ইচ্ছা ব্যতীত বাইরের কোন শক্তি তার শাসন ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করতে পারে না। সার্বভৌমত্বের অধিকারীর ইচ্ছায়ই আইন অস্তিত্ব লাভ করে এবং তা নাগরিকদেরকে আনুগত্যের রজ্জুতে বেঁধে দেয়। কিন্তু স্বয়ং কোন সার্বভৌমত্বের অধিকারীকে বাধ্য করার মত কোন আইন নেই। সার্বভৌমত্বের অধিকারী তার নিজ সত্তায় নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তার বিধান সম্পর্কে ভাল বা মন্দ, বিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত এ ধরনের কোন মন্তব্য করার সুযোগ নেই। তিনি যা কিছু করবেন তা ভাল ও কল্যাণকর। তাঁকে দোষত্রুটিমুক্ত এবং সকল প্রকার ভুলের উর্ধ্বে মেনে নিতে হবে, চাই তিনি এসব গুণের অধিকারী হোন বা না হোন, এটাই হলো সার্বভৌমত্বের ধারণা বা তাৎপর্য।

প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব কার

সার্বভৌমত্ব বাস্তবিক পক্ষে মানবীয় পরিমন্ডলে বিদ্যমান আছে কি ? যদি থেকে থাকে তবে তা কোথায় ? এ সার্বভৌমত্বের প্রকৃত মালিক কাকে বলা যেতে পারে? স্বয়ং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পন্ডিতগণ এর সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে চরমভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সার্বভৌমত্বের যোগ্য কোন ক্ষমতাধর সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ মানবতার পরিসীমায় বরং সত্যকথা এই যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের কোথাও সার্বভৌমত্বের প্রকৃত ধারক বিদ্যমান নেই। তাই পবিত্র কুরআনে এ সত্যকে বার বার তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ, তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা কিছু করতে চান তা সম্পূর্ণরূপে করতে পারেন। তিনি কারো নিকট দায়ী নন। কারো সম্মুখে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না। আল্লাহ বলেন, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদকারী কেউ নেই (সূরা আল-আম্বিয়া-২৩)। তিনি এমন এক সত্তা, যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। তাঁর সত্তা সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

সার্বভৌমত্ব কার অধিকার

সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর অধিকার। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যদি এ সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রদান করা হয় তার হুকুম বাস্তবিক পক্ষে আইন বলে বিবেচিত হবে না। তার উপর কোন অধিকার থাকবে না। তার শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে এমনটি নয়। বরং তার নির্দেশ সম্পর্কে ভাল মন্দ-ভুল ও নির্ভুল হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে। সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর সৃষ্টির উপর অন্য কোন সৃষ্টি প্রভুত্ব কায়েম করার এবং হুকুম চালাবার কোন অধিকার নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর এবং তার এ অধিকারের ভিত্তি এই যে, তিনি নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তাই একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তারই।

সার্বভৌমত্ব কার হওয়া উচিত

সার্বভৌমত্বের এ অধিকার যদি কোন মানবশক্তিকে দেয়া হয়, তাতে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে না। মানুষ- সে যে কোন ব্যক্তি হোক, শ্রেণী হোক কিংবা কোন জাতি বা সমষ্টিই হোক। সার্বভৌমত্বের এতো বিরাট ক্ষমতা সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব। তথাপিও এরূপ অধিকার ও কর্তৃত্ব যদি কোন মানবীয় শক্তি লাভ করে তবে সেখানে যুলম, নিপীড়ন ও নির্যাতন বেড়ে যাবে। সমাজের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তার যুলমের দায়ভার প্রতিবেশী সমাজের উপর পড়বে। মানুষ যখনই সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাকে নিজের মনে করেছে, তখনি সমাজে ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অশান্তি সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ যার বাস্তবিক পক্ষে সার্বভৌমত্ব নেই এবং যাকে সার্বভৌমত্বের অধিকারও প্রদান করা হয়নি, তাকেই যদি কৃত্রিমভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকার ও ক্ষমতা দান করা হয়, তবে সে কিছুতেই এপদের যাবতীয় ক্ষমতার এখতিয়ার সঠিক পন্থায় ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

আল্লাহর আইনগত ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব

আইনগত সার্বভৌমত্ব তাঁরই স্বীকার করতে হবে, যার বাস্তব সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা ও অধিকার নিখিল বিশ্ব ও গোটা মানব জাতির উপর স্থাপিত হয়েছে। একথাটি কুরআন মাজীদে জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

হুকুম দেবার ও প্রভূত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি আদেশ করেছেন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করার জন্য। এটাই সঠিক পন্থা। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

অন্যত্র বলেছেন, একমাত্র সে বিধানই অনুসরণ করবে যা তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তাঁকে ত্যাগ করে অন্য পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না। (সূরা আল-আ'রাফ : ৩)

আল্লাহর এ আইনগত সার্বভৌমত্ব অমান্য করাকে পরিস্কার কুফরী বলা হয়েছে।

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে যারা ফয়সালা করে না, তারা কাফির। (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪) এসকল আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, আইনগত সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার। যারা একে স্বীকার করে তারা ইসলাম ও ঈমানের দাবিদার, আর যারা অস্বীকার করে তারা নিরেট কুফরীতে লিপ্ত।

সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে রাসূলের পদমর্যাদা

দুনিয়াতে আল্লাহর এ আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ। অন্য কথায় আমাদের আইন রচয়িতা ও সংবিধানদাতা আমাদের জন্য কি আইন এবং কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানাবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। এ কারণে ইসলামে আল্লাহর হুকুমের অধীনে নির্দ্বিধায় তাদের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ

দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদ থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

আর কুরআন মাজীদ একথা সুনির্দিষ্ট ও যুগান্তকারী নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক তাঁর অনুসরণ করার জন্যই তাকে পাঠিয়েছি। (সূরা আন-নিসা : ৬৪)

যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করবে, সে মূলত আল্লাহরই অনুসরণ করল। (সূরা আন-নিসা : ৮০)

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে আইনগত সার্বভৌমত্ব একান্ত ও নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট। অতঃপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই।

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা

এ পৃথিবীতে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা Political Sovereigntey একমাত্র আল্লাহ তাআলার। কারণ আল্লাহ তাআলার আইনগত সার্বভৌমত্ব মানব সমাজে যে প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক শক্তি বলে কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করবে, আইন ও রাজনীতির পরিভাষায় তাকে কখনো সার্বভৌমত্বের মালিক বলা যায় না। যে শক্তির আইনগত সার্বভৌমত্ব নেই এবং যার ক্ষমতা ও এখতিয়ার এক উচ্চতর আইন দ্বারা পূর্ব থেকেই সীমিত ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছে এবং যার পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তার নেই সে কখনো সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারে না। বরং এ প্রতিষ্ঠানকে পবিত্র কুরআন খিলাফত নামে আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠান স্বয়ং একচ্ছত্র শাসক নয় বরং একচ্ছত্র শাসকের প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীও একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা

পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট এর বর্ণনা এসেছে। যেমন- সূরা আন-নাসে বলা হয়েছে-

বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রভু, মানুষের শাসক এবং মানুষের ইলাহের নিকট। (সূরা আন-নাস : ১-৩)

অন্যত্র বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই শাসন কর্তৃত্বের মালিক এবং এ বিষয়ে তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ বলেন, বল ঃ হে আল্লাহ ! শাসন কর্তৃত্বের মালিক, তুমি যাকে চাও শাসন কর্তৃত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে চাও তা ছিনিয়ে নাও। (সূরা আলে ইমরান : ২৬)

রাজত্বের ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই। (সূরা বনী ইসরাইল : ১১১)

সাবধান ! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও চলবে তাঁর। (সূরা আল-আরাফ: ৫৪)

তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিসের অনুসরণ কর এবং তাকে ত্যাগ করে অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (সূরা আল-আরাফ : ৩)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফয়সালা করে না সে কাফির। (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)

এসকল আয়াত থেকে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার বিষয়ে ইসলামী আইনবিদদের মতামত

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হুকুম (ভিন্ন শব্দে সার্বভৌমত্ব) দেয়ার অধিকার আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আল্লামা আমিদী উসূলে ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-ইহকাম ফী উসূলীল আহকাম" এ লিখেছেন, জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া কোন হাকিম (শাসক) নেই এবং তিনি যে হুকুম (বিধান) দিয়েছেন তা-ই কেবল হুকুম (বিধান) হিসেবে গণ্য।

শায়খ মুহাম্মাদ আল-খুদরী তাঁর উসূলুল ফিকহ গ্রন্থে এটাকে গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ আকীদা বা বিশ্বাস বলে উল্লেখ করেছেন।

সারসংক্ষেপ

প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য। সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর অধিকার, অন্য কারো নয়। আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব যেমন বিশ্বজনীন, তদ্রূপ রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিশ্বাসগত সব দিকেই পরিব্যপ্ত। কুরআন মাজীদে বর্ণিত সর্বপ্রকারের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রভু, মানুষের ইলাহ, মানুষের শাসক, শাসন কর্তৃত্বের মালিক। রাজত্বের ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই। নির্দেশ প্রদানের অধিকার কেবল তাঁরই, কারণ তিনিই স্রষ্টা। তাই তো কুরআনে এসেছে, সাবধান ! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও চলবে তাঁর। মোটকথা সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা যে কোন অর্থে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই সংরক্ষিত। এটা তাঁর অধিকার, কেবল তাঁকেই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী স্বীকার করতে হবে, যা উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. সার্বভৌমত্ব শব্দের অর্থ কী?

ক. উচ্চতর ক্ষমতা; খ. নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব;
গ. আধিপত্য; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অমান্য করা-

ক. বিদআত; খ. কুফরী;
গ. ফাসিকী; ঘ. সব ক'টি উত্তরই ভুল।

৩. রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও অধিকার কার?

ক. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর; খ. একমাত্র আল্লাহ তাআলার;
গ. রাষ্ট্রপ্রধানের; ঘ. জনগণের।

৪. হুকুম দেয়ার একমাত্র অধিকার কার জন্য নির্ধারিত?

ক. আল্লাহ তাআলার; খ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর;
গ. সেকুলার রাষ্ট্রের; ঘ. সকল নাগরিকের।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত তিনটি আয়াতের অনুবাদ লিখুন।
২. সার্বভৌমত্ব শব্দের অর্থ কী? লিখুন।
৩. প্রকৃত পক্ষে এ পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কার? যুক্তিসহ লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে আল-কুরআনের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ২

আল-কুরআন আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ সম্পর্কিত আয়াত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ তার বর্ণনা দিতে পারবেন
- কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ-প্রমাণ করতে পারবেন
- পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে- তা বলতে পারবেন
- কুরআনকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত মানদন্ড হিসেবে বিচার করতে পারবেন
- আল-কুরআনের সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ণ পবিত্র মহাগ্রন্থ হিসেবে প্রমাণ করতে পারবেন
- কুরআনের ভাষা ও গুণগত মানের আলোচনা করতে পারবেন
- কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস- একথার বর্ণনা দিতে পারবেন
- সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে কুরআনের বর্ণনা দিতে পারবেন
- কুরআন মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ-তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ .(البقرة : ٢٣)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. (هود : ١٣)

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا . (الاسراء : ٨٨)

অনুবাদ

১. আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩)

২. তারা কি বলে, সে এটি নিজে রচনা করেছে ? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার, ডেকে নাও। (সূরা হুদ ঃ ১৩)

৩. বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। (সূরা আল-ইসরা ঃ ৮৮)

চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় উত্তীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এক অতুলনীয় অনুপম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ কালাম। কুরআনের বাক্যশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা ও ভাষার মাধুর্য আরবদের গর্ব-অহংকারকে ম্- ান ও নিষ্প্রভ করে দেয়। কুরআনের অত্যুচ্চ ভাব-ভাষা, অলংকার, উপমা, ছন্দ- মূর্ছনা, রচনার শৈল্পিকতা, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব ঘিরে এক অতুলনীয় চিরন্তন সাহিত্যিক মানে সদা অধিষ্ঠিত গ্রন্থ। তাই এ গ্রন্থখানি মহানবী (সা)-এর শাশ্বত মুজিযাপূর্ণ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। যে সকল দৃষ্টিকোণে এ গ্রন্থখানি আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত তা এখানে তুলে ধরা হলো -

সুর ও ছন্দের দিক থেকে

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে একটি অকৃত্রিম সুর ও ছন্দের তাল বিদ্যমান। মানুষ যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন এর বাহ্যিক উচ্চারণেই সে সুরের মুর্ছনা ছড়িয়ে পড়ে। কুরআনের শত্রুকেও সে সুর করে দেয় পাগলপারা। কুরআনের এ মোহনীয় সুর- সৌন্দর্য যুগে যুগে আকর্ষণ করেছে মানুষ ও জিন জাতিকে। তাই জিন জাতি যখন এ কুরআনের সুর নবীর কণ্ঠে শুনেছিল তখন তারা এ বলে মন্তব্য করেছিল 'আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি' ঃ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

"বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে তা শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।" (সূরা আল-জিন : ১)

চিরন্তন চ্যালেঞ্জের দিক থেকে

কুরআনের বাকশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। একে আল্লাহর মহান বাণী বলে গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও জেদের বশবর্তী হয়ে একে মানুষের রচনা বলে রটাতে থাকে। একে কবিতা, যাদু ইত্যাদি বলে উপহাস করে। এতে আল্লাহ তাআলা তাদের লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তো বলিষ্ঠ অলংকারপূর্ণ ভাষার অধিকারী ; তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। কোন মানুষই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারেনি। এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কেউ সফল হয়নি। কুরআনের বিরোধিতাকারীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থতার গ্লানি আনত শিরে স্বীকার করে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে অকুণ্ঠচিত্তে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে ليس هذا من كلام البشر "না এটা কোন মানুষের বাণী নয়।" অবশ্যই এ অক্ষমতার কথা কুরআন চ্যালেঞ্জ করে আগেই বলেছিল "তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা রচনা করে আন। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাক। তোমরা যদি সত্যবাদী হও।" (সূরা আল-বাকারা : ২৩)

কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করে অনুরূপ কোন সূরা বা বাক্য তৈরি করতে পারেনি। সূরা বনী ইসরাঈলের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ "সমগ্র মানবজাতি ও জিনজাতি একত্র হয়ে সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করেও কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৮)

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দিক থেকে

এ মহাগ্রন্থটি বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দিক থেকে এক অভিনব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসর হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপকাত্মক যে, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত তাফসীর গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরাসি মণীষীর মন্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেছেন ঃ "কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং আইন বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।"

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ, যাতে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আর আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সে-সব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পণকারী।" (সূরা আন-নাহল : ৮৯)

সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থের দিক থেকে

কুরআনুল কারীম সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ মহিমান্বিত আসমানী কিতাব, সর্বাধিক কল্যাণের ভাণ্ডার হিসেবে এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এ কুরআনের প্রভাব এতই গভীর যে, একে যদি কোন পর্বতের উপর নাযিল করা হত, তাহলে সে পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যেত। এর অতীব মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

"আমি যদি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে নত হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে।" (সূরা আল-হাশর : ২১)

কুরআনুল কারীম মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি খুবই সম্মান ও গৌরবের বস্তু। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার ভাষা নিম্নরূপ-

ان لكل شئ شرفا يتباهون به و ان بهاء امتى و شرفها القران .

মহানবী (সা) বলেন, "প্রত্যেক জিনিসেরই কিছু সম্মান বা গৌরবের বিষয় থাকে, আমার উম্মতের সৌন্দর্য ও গৌরবের বিষয় হল কুরআন।" (আবু-নুআয়ম, হিলওয়াতুল আউলিয়া)

মহানবী (সা) আরো বলেন, "নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর রজ্জু। অতি উজ্জ্বল আলো এবং উপকারী মহৌষধ। যে ব্যক্তি একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য মুক্তির চুক্তিপত্র হবে এবং যে তা মেনে চলবে সে নাজাত পাবে।"

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থের দিক থেকে

কুরআনুল কারীম বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এরপর কিয়মত পর্যন্ত আর কোন আসমানী কিতাব নাযিল হবে না। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবূর, ইনজিলসহ আরো ১০০ খানা সহিফা বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের কাছে নাযিল হয়েছিল। বর্তমানে এ আসমানী কিতাবগুলো আসল ভাষা ও অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত নেই। বর্তমানের তাওরাত, যাবূর ও ইনযিল আসল নয়। ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও পাদ্রীদের সুবিধামত বিকৃত করাণ ফলে ঐসব গ্রন্থের ওহীর আসল ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের সৎ পথ প্রদর্শনের জন্যে পবিত্র কুরআনই পথ নির্দেশ করবে এবং এর অবিকৃত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্য এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর : ৯)

চিরন্তন ও শ্বাশ্বত সত্যগ্রন্থ হিসেবে

পূর্বের সকল আসমানী কিতাবই ছিল নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী, জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য। আর তা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীম কোন নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। এটা বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাত্মক হিদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই এটা চিরন্তন, শ্বাশ্বত ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ হিসেবে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। মহান আল্লাহ এ মর্মে ঘোষণা করেন ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ

"এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।" (সূরা ছোয়াদ : ৮৭)

পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে

এ পবিত্র কুরআনই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি ও অনুশাসনের উৎস। পবিত্র কুরআনের উপরই ইসলামের সম্পূর্ণ ইমারতের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছেন। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যেসব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে, তার সব কিছুরই মূলধারা ও মূলনীতি পবিত্র কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বনবী এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। কাজেই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এরপর জীবন বিধান হিসেবে জীবন পথের দিশাস্বরূপ কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)
অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।" (সূরা আল-মায়িদা : ৪৪)

মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

و ليس منا من لم يتغن بالقران .

"যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।"

চূড়ান্ত মানদণ্ডের দিক থেকে

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী আইন-কানুন সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় পবিত্র কুরআনই চুড়ান্ত দলীল হিসেবে বিবেচিত। এতেই মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এমর্মে ঘোষণা করেন। এ কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও অনুগ্রহ।" (সূরা আল-জাসিয়া : ২০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "হে মানবমন্ডলী ! তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নাযিল করেছি।" (সূরা আন-নিসা : ১৭৪)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসের দিক থেকে

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআন আল্লাহর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক, সৃষ্টি জগতের রহস্য, ভূতত্ত্ব, সৌর বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন, মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-ভান্ডারে পরিপূর্ণ এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ সকল যুগের মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের নব নব দিগন্তের সন্ধান দিয়ে আসছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের চরম বিকাশে এ কুরআনের অতুলনীয় ভূমিকা রয়েছে।

আল্লাহ বলেন, "এগুলো জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও করুণার আধার সত্যপরায়ণদের জন্য।" (সূরা লুকমান : ২-৩)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিবসের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য, যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর স্বরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমীন সৃষ্টির বিষয়ে; তারা বলে, হে আমাদের প্রভূ ! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৯১-১৯২)

সারকথা

বিশ্বমানবের চরম দুর্দিনে মানবতা যখন অবহেলিত, অপমানিত ও নির্যাতিত, জড়বাদ, বস্তুবাদ এবং ভোগবাদের গোলক ধাঁধায় যখন সকলেই দিশেহারা, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও আত্মবিস্মৃত, মানব জাতির এমন সংকটময় মুহূর্তে বিশ্ব মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে চিরন্তন ও শ্বাশ্বত সত্য গ্রন্থ হিসেবে, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে, চূড়ান্ত মানদন্ড ও চিরন্তন চ্যালেঞ্জ হিসেবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে মানবতার সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ হিসেবে নাযিল হয়।

মূলত মানব জাতির ইতিহাস পরিবর্তনে, মানবতার পূর্ণ বিকাশ ও উন্মেষ সাধনে পবিত্র কুরআনের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আল-কুরআন মানুষের চিন্তা জগতে ও নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। ব্যক্তিগত, সমাজগত জীবনে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মহান বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে। আর এ মহা বিপ- বের অধিনায়ক হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। তাঁর সংবিধান হলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ আল-কুরআন। সুতরাং মানব জীবনে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক চ্যালেঞ্জিং ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. 'না এটা কোন মানুষের বাণী নয়' এ কথাটি কার?

ক. রাসূলের খ. সাহাবাদের
গ. হাদীসের ঘ. কুরআন বিরোধীদের।

২. কুরআন কোন জাতির জন্য নাযিল হয়েছে ?

ক. আরববাসীদের জন্য খ. মুসলমানদের জন্য
গ. মুত্তাকীদের জন্য ঘ. সমগ্র মানবজাতির জন্য।

৩. অতীত আসমানী কিতাবের আসল ভাষা এখনো আছে কি ?

ক. বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে খ. জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে
গ. বিকৃত হয়ে হয়েছে ঘ. আসলরূপে আছে।

৪. সর্বশেষ আসমানী কিতাব কোনটি ?

ক. ইনজীল খ. যাবূর
গ. তাওরাত ঘ. কুরআন।

৫. ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল উৎস কী ?

ক. আল-কুরআন খ. আল-হাদীস
গ. গণতন্ত্র ঘ. ইজমায়ে উম্মাত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআনের সুর ও ছন্দের বিবরণ দিন।
২. ليس هذا من كلام البشر এ বাক্যের বিশ্লেষণ করুন।
৩. কুরআনের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত-এ কথাটি বুঝিয়ে লিখুন।
৪. সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে আল-কুরআনের বর্ণনা দিন।
৫. কুরআনুল কারীমের ভাষা ও গুণগত মান পর্যালোচনা করুন।
৬. "কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা" আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআন আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ -এ পাঠের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. 'কুরআন একটি চিরন্তন শাশ্বত সত্য গ্রন্থ, পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা' কুরআন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।
৩. "আল-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস" বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ঃ ৩

রাসূল (সা)-এর আনুগত্য বিষয়ক আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সংশ্লিষ্ট আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর অর্থ বলতে পারবেন
- আয়াতে বর্ণিত ভালবাসা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

১. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(أل عمران-٣١)

২. يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (النساء-٨٠)

৩. أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ (المائدة-٩٢)

অনুবাদ

১. বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

২. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি। (সূরা আন নিসা : ৮০)

৩. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। (সূরা আল-মায়িদা : ৯২)

শব্দার্থ ও টিকা

تحبون তোমরা ভাল বাসবে।

فاتبعونى তোমরা আমার অনুসরণ করবে।

يحببكم তোমারদেরকে ভালবাসবেন।

يغفرلكم তোমাদের ক্ষমা করবেন।

اطيعوا তোমরা অনুগত হও।

تولوا তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فقد اطاع সে মান্য করল।

حفيظ রক্ষণাবেক্ষণকারী, রক্ষক।

احذروا সতর্ক হও, অস্ত্ররক্ষা কর।

আল্লাহর বাণী تحبون الله এর ব্যাখ্যা

تحبون الله অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর বা ভালবাস। এ মহব্বত বা ভালবাসা বলা হয় সুন্দর ও মনঃপুত বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণকে। রাসূল (সা) কে ভালবাসার অর্থ রাসূলের আনুগত্য করা। ভালবাসা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এখানে ভালবাসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল-

১. স্বভাবজাত ভালবাসা

এমন ভালবাসা যা মানুষের স্বভাব প্রসূত, ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ ভালবাসা সৃষ্টি করা যায় না। যেমন সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতার প্রতি ভালবাসা।

২. জ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ ভালবাসা

এমন ভালবাসা যাকে ভালবাসতে জ্ঞান ও যুক্তি পথ নির্দেশ করে। যেমন- তিক্ত ঔষধ মানুষের মন স্বাভাবিকভাবে সেবন করতে চায় না, কিন্তু সুস্থ হওয়ার আশায় জ্ঞান তা সেবন করতে নির্দেশ করে।

৩. ঈমানগত ভালবাসা

এমন ভালবাসা যে ভালবাসায় সকল প্রকার ভালবাসার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আল্লাহ ও রাসূলকে সকল কিছুর উপর অধিক ভালবাসতে হয়, নতুবা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাসূল (সা)-এর আনুগত্য

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব মানুষের মাঝে কার্যকর হয় নবী রাসূলের মাধ্যমেই। এ জন্য তাঁর নির্দেশাবলীর অনুগত্য করা তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করা এবং ফয়সালাসমূহ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও সমাজের জন্য অপরিহার্য। রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে যা লাভ করা যায়, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল-

আল্লাহর ভালবাসা লাভ

রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

আল্লাহর অনুগত্য করা

রাসূল (সা)-এর আনুগত্য অর্থ আল্লাহর অনুগত্য করা, আর রাসূল (সা)-কে অমান্য করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে অমান্য করা। হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমাকে অমান্য করল, সে আল্লাহকে অমান্য করল।" (বুখারী)

রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা

রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে- তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে ভালবাসা আর এরই মাধ্যমে জান্নাত লাভের আশা করা। নবী করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসে সে আমাকে ভালবাসে। আর যে আমাকে ভালবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে।" (আল-হাদীস)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ

আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামের সমগ্র বিধি-বিধান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো।

নবী করীম (সা) বলেছেন, "সহজ অবস্থায় ও কঠিন অবস্থায় এবং সন্তুষ্টিতে ও অসন্তুষ্টিতে তথা তোমার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রেও রাসূলের কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা তোমার কর্তব্য।" (মুসলিম)

অগ্রাধিকার প্রদান

যে কোন বিষয়ে আনুগত্যের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর হুকুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের বাবা, মা, সন্তান-সন্ততি ও সকলের চেয়ে আমাকে অধিক ভালো না বাসবে।"

আনুগত্যের পরিধি

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য নিঃশর্তভাবে হতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ কি তা জানার পর বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করাই মানুষের কর্তব্য ও রাসুলের আনুগত্যের পরিধি ও মাপকাঠি। যেমন- নবী করীম (সা) বলেছেন, "সহজ অবস্থায় ও কঠিন অবস্থায় এবং সন্তুষ্টিতেও অসন্তুষ্টিতে তথা তোমার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার কর্তব্য।" (মুসলিম)

আনুগত্য না করা বিদ্রোহের নামান্তর

সর্বাবস্থায় রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করতে হবে। আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাবে না। মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।" (সূরা আল-মায়িদা : ৯২)

নবী করীম (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করল সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করল।" (সহীহ বুখারী)

ঈমানের পরিপূর্ণতা

রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ঈমানের অংশ। রাসূল (সা)-এর আনুগত্য অর্থ হচ্ছে, ঈমানের পূর্ণতা লাভ। আনুগত্যের ক্ষেত্রে কিছু মানবো আর কিছু মানবো না তাহলে এটা পরিপূর্ণ আনুগত্য হবে না বরং তার মধ্যে ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ পেল। সে নিজেকে পূর্ণ ঈমানদার হিসেবে দাবি করতে পারবে না।

সারসংক্ষেপ

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানুষের মাঝে কার্যকর হয় নবী-রাসূলের মাধ্যমেই। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (স) -এর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা, তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করা এবং তাঁর দেয়া ফয়সালাসমূহ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়ার নাম রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর ভালবাসা, ইসলামী জীবনব্যবস্থার অনুসরণ, অনুকরণ, রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের প্রতি যত্ন নেয়া, সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সা)-কে অগ্রাধিকার প্রদান, ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ ইত্যাদি বিষয় রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. تحبون শব্দের অর্থ-

ক. তোমরা ভালবাসবে; খ. তুমি ভালবাসবে;
গ. আমরা ভালবাসব; ঘ. সে ভালবাসবে।

২. রাসূল (স)-এর ভালবাসা-

ক. ঈমানের অঙ্গ; খ. সুন্নাত;
গ. বিদআত; ঘ. উপরের কোন উত্তরই সঠিক নয়।

২. রাসূল (স)-কে ভালবাসতে হবে-

ক. অনুকুল পরিবেশে; খ. সর্বাবস্থায়;
গ. সুন্নাত পালনের মাধ্যমে ঘ. উপরের সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৩. রাসুল (স)-এর আনুগত্য না করা-

ক. বিদআত; খ. মাকরূহ;
গ. বিদ্রোহের নামান্তর; ঘ. মুবাহ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন।
২. আল্লাহকে ভালবাসার অর্থ কী? বুঝিয়ে লিখুন।
৩. ব্যাখ্যা করুন- "রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করাই আল্লাহর আনুগত্য করা।"
৪. রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের পরিধি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. কুরআন-হাদীসের আলোকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আনুগত্যের বিষয় বিস্তারিতভাবে লিখুন।

পাঠ ঃ ৪

নেতার আনুগত্য সম্পর্কিত আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের সরল অনুবাদ করতে পারবেন
- 'উলিল আমর' সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- ইসলামে নেতার আনুগত্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবেন
- ইসলামী জীবনব্যবস্থায় একজন নেতার কী কী গুণাবলী থাকা আবশ্যক তা বলতে পারবেন।

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ –
(سورة النساء-٥٩)

অনুবাদ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

টীকা

উলিল আমর (أولي الامر)

'উলিল আমর' আভিধানিক অর্থে-সে সমস্ত লোককে বলা হয় যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রা.) প্রমুখ মুফাসসির, ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (সা)-এর প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই অর্পিত ছিল দীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, 'উলিল আমর' -এর অর্থ হচ্ছে, সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

কারো কারো মতে, 'উলিল আমর' বলতে ওলামা, শাসক ও নেতৃস্থানীয় লোকদের বোঝায়। কারণ নির্দেশদানের বিষয়টি তাদের সাথেই সম্পর্কত। (তাফসীরে মাযহারী ও রূহুল মা'আনী)

ইসলামে নেতার আনুগত্য

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রকৃত আনুগত্য লাভের অধিকারী হলেন আল্লাহ, অতঃপর আনুগত্য হচ্ছে রাসূলের, আর তাঁদের অধীনে তৃতীয় আনুগত্য হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে 'উলিল আমর' তথা নেতা বা নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে, "হে ঈমানদারগণ ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সে সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯) সুতরাং নেতার আনুগত্য করা মুসলমানদের উপর ফরয। আর নেতার অবাধ্য হওয়া অবৈধ। রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি নেতার অবাধ্য হল সে আমারই অবাধ্য হল।" (বুখারী)

মুসলিম নেতৃবৃন্দ কারা

মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই উলিল আমর এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন। আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসক হতে পারেন। অথবা আদালতে

বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ- সরদার, প্রধানও হতে পারেন।

মোটকথা কোন ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যই আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর অনুগত হতে হবে। এ আনুগত্যের জন্য এ শর্ত দুটি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। নবী করীম (সা)ও পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে হাদীসের এটা বর্ণনা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখা যেতে পারে- নেতার কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমাদের জন্য অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহর অবাধ্য হবার হুকুম দেয়া হয়। আর যখন তাকে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিৎ নয়। (বুখারী ও মুসিলম)

আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হতে হবে এমন কোন বিষয়ে আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধু মারূফ বা বৈধ ও সৎ কাজে। (বুখারী ও মুসলিম)

স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না।

গুনাহের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নেতার নির্দেশ শ্রবণ ও পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। গুনাহের নির্দেশ দেয়া হলে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার তার নেই।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। নেতার নেতৃত্বের গুণাবলীই তার অধীনস্থদের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং যে নেতার আনুগত্য করা হবে তার নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়-

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব

নেতাকে ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে হবে। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে। সাথে-সাথে ইবলীসী চিন্তা প্রসূত যেসব মতবাদ দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে সেই মতবাদগুলোর বক্তব্য এবং সেগুলো সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে মানবগোষ্ঠী কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন- এসব কিছু সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

উন্নত আমল

নেতাকে হতে হবে ইসলামের মূর্ত প্রতীক এবং উন্নত আমলের অধিকারী। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ এবং যাবতীয় কাজ কর্মে ইসলামের সঠিক রূপ প্রতিফলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নম্র ব্যবহার

রুক্ষ ভাষা এবং রুঢ় আচরণ মানুষকে আহত করে। রুঢ় আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি কখনো মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে না। ইসলামী নেতার পক্ষে রূঢ় আচরণ তাঁর আনুগত্যের পথে বিরাট বাঁধা। তাই নেতার আনুগত্য পেতে হলে নম্র-ভদ্র ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে।

সাহসিকতা

ইসলামী সমাজের নেতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না, প্রকৃত পক্ষে তাকওয়ার দাবিও তাই। যে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় থাকবে, সে হৃদয় অন্য কাউকে ভয় করবে না। রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, দুনিয়ার সব কিছু তাকে ভয় করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে না দুনিয়ার সব কিছু তাকে ভয় দেখায়।" তাই ইসলামী সমাজের নেতাকে সৎ, সাহসী ও নির্ভীক হতে হবে।

সময়ানুবর্তিতা

ইসলামী সমাজে যিনি নেতা হবেন তাঁকে সময়ানুবর্তি হতে হবে। সময় সম্পর্কে সদা সচেতন থাকতে হবে। প্রতিটি কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে। নেতাকে দিনের শুরুতেই প্রতিটি করণীয় কাজের জন্য তালিকা তৈরি করে সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যদানের অধিকারী

ইসলামী সমাজের নেতাকে সুবক্তা হতে হবে। কম কথায় বেশী ভাব প্রকাশ উত্তম ভাষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্তৃতা পয়েন্ট ভিত্তিক হলে শ্রোতার পক্ষে বুঝা সহজ হয়। বক্তৃতার ভাষা সহজ হওয়া দরকার। রাসূল (সা) বলেন, "আমি ব্যাপক অর্থবোধক অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষণের যোগ্যতাসহ আবির্ভূত হয়েছি।" আল্লাহর রাসূল (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর বক্তব্য ছিল প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

নথিপত্র সংরক্ষণে পারদর্শিতা

ইসলামী সমাজের নেতাকে হতে হবে নথিপত্র সংরক্ষণে পারদর্শী। নথিপত্রের সঠিক নামকরণ, যথাযথভাবে নাম্বারিংকরণ এবং ভেতরে সঠিকভাবে কাগজ পত্র সন্নিবেশকরণের যোগ্যতা তাঁর অন্য সকলের চেয়ে বেশী থাকতে হবে। নিজে পারদর্শী না হলে অন্যদের দ্বারা এগুলো ভালভাবে করিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। তাই ইসলামী সমাজের নেতাকে নথিপত্র সংরক্ষণে পারদর্শী হতে হবে।

হিসাব সংরক্ষণে পারদর্শিতা

ইসলামী সমাজের নেতা হবেন দক্ষ হিসাবরক্ষক। সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের রেকর্ড ও হিসাব সঠিকভাবে রক্ষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নেতার অতি বড় এক অযোগ্যতা প্রমাণ করে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় শৃংখলার মূল উপাদান হচ্ছে আনুগত্য, যেখানে নেতার আনুগত্য নেই সেখানে শান্তি-শৃংখলা কিছুই নেই। অতএব ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিপূর্ণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নেতার আনুগত্য অপরিহার্য।

সারকথা

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। সে নেতা হাবশী গোলাম হোক না কেন- এজন্য রাসূল (সা) বলেছেন "তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলামকে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।" তবে খেয়াল রাখতে হবে-আনুগত্য হবে মারূফ কাজে, কারণ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। প্রকৃত আনুগত্য হবে স্রষ্টার ও স্রষ্টার নির্দেশের আর অন্য সব আনুগত্য হবে মূল আনুগত্য অনুযায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সত্য হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. ইসলামের দৃষ্টিতে নেতার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক নয়।
২. 'উলিল আমর' হচ্ছেন-আলিম-উলামা, ফকীহ্ ও মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।
৩. 'যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল সে যেন আমারই আনুগত্য করল'- উদ্বৃতিটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর।
৪. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে জালিম শাসকের আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক।
৫. ইসলামী সমাজের নেতাকে হতে হবে ইসলামের প্রতীক এবং উন্নত আমলের অধিকারী।
৬. ইসলামী সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে ফাসিক এবং শরীআতের অনুসারী না হলেও চলবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. নেতার আনুগত্য সংক্রান্ত আয়াতটির অনুবাদ করুন।
২. আল্লাহর বাণী و اولى الأمر منكم -এর ব্যাখ্যা করুন।
৩. ইসলামের দৃষ্টিতে নেতার আনুগত্য করার গুরুত্ব লিখুন।
৪. মুসলিম নেতৃবৃন্দ কারা? লিখুন।
৫. ইসলামে নেতৃত্বদানকারীর কতিপয় গুণাবলী বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১.ইসলামী দর্শনে নেতার আনুগত্য করা কি বাধ্যতামূলক? ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নেতার কী কী গুণাবলী থাকা আবশ্যক? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৫

মানব মর্যাদা সম্পর্কিত আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ◆ সংশ্লিষ্ট আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- ◆ প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ ও টীকা বলতে পারবেন
- ◆ মানুষের মর্যাদা ও পরিচিতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- ◆ মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে পারবেন
- ◆ মানব মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

١. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء- ٧٠)

٢. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (النحل-١٢)

অনুবাদ ঃ

১. আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা আল-ইসরা : ৭০)

২. তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন। (সূরা আন-নাহ্ল:১২)

শব্দার্থ ও টীকা

كرمنا এ শব্দটি جمع متكلم এর ছিগা, বহুবচন, বহছ اثبات فعل ماضى معروف, মাছদার تكريم অর্থ-আমি মর্যাদাবান করেছি, সম্মানিত করেছি।

حملنا আমি চলাচলের বাহন দিয়েছি, বাহন নির্ধারণ করেছি।

البر স্থল, স্থলভাগ, ভূভাগ, বন-জঙ্গল, বহুবচন برور

البحر সাগর, সমুদ্র, দরিয়া, বহুবচন ابحار , بحار , بحور

الطيبات বহুবচন, একবচনে الطيبة অর্থ উৎকৃষ্ট বস্তু, উত্তম জিনিস, ভাল জিনিস, পবিত্র জিনিস, অত্র আয়াতে الطيبات দ্বারা সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় বস্তু এবং ঐ সকল উত্তম জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ স্বাদ লাভ করে ও উপকৃত হয়। মানুষের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও শক্তিশালী হয় এবং রোগ-শোক থেকে বেঁচে থাকে।

فضلنا আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, প্রাধান্য দিয়েছি, অগ্রাধিকার দিয়েছি, মর্যাদা দিয়েছি।

سخر নিয়োজিত করেছেন, অধীন করেছেন, অনুগত করেছেন।

مسخرات বহুবচন, একবচনে مسخرة অর্থ হচেছ অধীন, হুকুমের অধীন, অনুগত।

سخر لكم الليل والنهار ঃ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্যে স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজ কর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুগত করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলে। বরং মানুষ রাত দিনকে ব্যবহার করে উপকার লাভ করে।

মানব মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন। ফিরিশ্তাকুলকে অবনত মস্তকে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তার শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ। মানব মর্যাদা জানার পূর্বে মানব পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা দরকর। নিম্নে মানব পরিচিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হল-

মানব পরিচিতি

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে ناس নামে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেন- يا ايها الناس হে মানব জাতি ! (আল-বাকারা : ২১) আবার কোথাও انسان শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- সূরায়ে ইনফিতারের ৩নং আয়াতে এসেছে-يا ايها الانسان ماغرك بربك الكريم অর্থাৎ "হে মানব! কিসে তোমাদেরকে তোমাদের মহান প্রভু থেকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?"

انسان শব্দটি اناس (Society, intimacy, famitiarity) হতে উদ্ভুত। এর অর্থ আকৃষ্ট হওয়া, পোষমানা বা পরস্পর সম্মিলিতভাবে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া। বহুবচন اناسية , اناس আর اناسى শব্দের বিপরীত শব্দ وحشة অর্থ নিঃসঙ্গতা, পোষমানানো হয়নি এমন, বর্বর, অসভ্য, সংস্কৃতিহীন, পশুতুল্য, নির্দয়, (Untamed, Uncivilized, Uncultured, Brutal)। অতএব শাব্দিক তাৎপর্য মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত। কেননা মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। মানুষ মিলে-মিশে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পরস্পর সৌহার্দের সাথে বাস করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। সত্যিকার অর্থে মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "পুণ্য ও তাকওয়া অর্জনে তোমরা পরস্পর সাহায্য কর, পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" (সূরা আল-মায়িদা : ২)

মানুষের আকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে গঠন-কাঠামোর দিক থেকে অতি সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ও দেহাকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সুবিন্যস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত-পা, চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি অন্যান্য জীব জগত হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্ন প্রকৃতির করে তৈরী করেছেন। আল্লাহ বলেন, "নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আত্ তিন-৪) অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে দান করেছেন- নারী পুরুষভেদে অতি সুন্দর ও চমৎকার আকৃতি বিশিষ্ট। উপরন্তু তাদের সে অতুলনীয় সুন্দর দেহ পরিচালনের জন্য তাতে নিয়মিতভাবে রক্ত, গোশ্ত, অস্থি, বায়ু পিত্ত, কফ ও শিরা-উপশিরাসমূহ সংযোজিত করেছেন। এসবই তাঁর অনুপম দান এবং অসীম অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ বলেন, "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম দেহের অধিকারী করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।" (সূরা আল-ইনফিতার : ৭-৮)

জলে, স্থলে মানুষের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব

মহান আল্লাহ জল ও স্থলভাগের যাবতীয় জীব-জন্তু ও যানবাহনকে মানুষের আরোহণের জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। যেমন তাদের আরোহণের জন্য ঘোড়া, গাধা, উট, হাতী, নৌকা ইত্যাদিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন। কুরআনের ভাষায়, "নিঃসন্দেহে আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদের জলে-স্থলে কর্তৃত্ব দান করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব

আল্লাহ তাআলা শুধু স্থলভাগ ও জল ভাগই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেননি বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব কিছুকে মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী- "তিনি-নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন।" (সূরা লুকমান : ২০)

বস্তুত এ বিশ্ব জগতের সকল কিছুই মানব কল্যাণে জন্য সৃষ্টি। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, আকাশ-পাতাল, আলো-বাতাস, ধন-সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি সকল কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি। এগুলোর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা আর ভোগাধিকারী মানব জাতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যমীনে যা কিছু আছে তা তিনি তোমাদের জন্য সৃজন করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৯)। পৃথিবীর রূপ, পাখীর গান, নদীর কলতান, নারীর সৌন্দর্য এককথায় পৃথিবীর সকল বস্তুই মানব কল্যাণে সৃজিত।

সৌর জগতের উপর মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব

মহান আল্লাহ চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, ছায়াপথ এক কথায় সমগ্র সৌরজগত মানবের আয়ত্তাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলার বাণী- "তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তারই বিধানের কর্মে নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদের্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা আন-নাহল :১২)

জ্ঞান দান

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে বিশ্বের সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন যেন সে সমগ্র সৃষ্টির উপরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বাণী- "আর তিনি আদমকে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন, অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন।" (সূরা আল-বাকারা : ৩১)

ঐশী কিতাব দান

মানুষ যাতে পাপাত্মা শয়তানের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য না হয় সেজন্য তিনি এ অফুরন্ত ধন-সম্পদের উপরও সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ ঐশী কিতাব আল-কুরআন দিয়ে মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক।" (সূরা আলে ইমরান : ৩)

ঈমান নামক দৌলত দান

মহান আল্লাহ মানুষকে উত্তম সৃষ্টির মর্যাদায় ভূষিত করার পর তাদের ঈমান নামক দৌলত দিয়ে পথ প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৭)

পবিত্র উপজীবিকা প্রদান

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টিকুলের সেরা মর্যাদা প্রদানের পর তাদের পানাহারের ব্যাপারেও উক্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রক্ষা কল্পে তাদের জন্য পবিত্র পানাহার ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, আর যাবতীয় অপবিত্র, খারাপ ও কলুষিত দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-

"তোমরা পবিত্র দ্রব্যাদি হতে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।" (সূরা আল-মুমিনুন : ৫১) "আর তিনি তোমাদের উপর কলুষিত দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৭)

অতএব মহান আল্লাহ মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ঘোষণান্তে তাদের পবিত্র উপজীবিকা গ্রহণ এবং অপবিত্র ও কলুষিত খাদ্য বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।

মানব মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার উপায়

মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সুতরাং তার কর্মও হবে শ্রেষ্ঠ। ইসলাম তাকে শয়তানের প্ররোচনায় অন্যায় অপরাধে লিপ্ত না হওয়ার জন্য বারবার স্মরণ করে দিয়েছে। সাথে সাথে পরস্পর পরস্পরকে উত্তম ও সৎকাজে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান পূর্বক একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মহান তাআলা বলেন, "তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আল-ইমরান : ১১০)

মহান আল্লাহ মাটির তৈরী এ মানুষকে সেরা সৃষ্টির মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন সত্য ; তাই বলে মানুষ নিজেকে সব চেয়ে উন্নত সত্তা বলে দাবি করবে না। তার মন-মস্তিষ্কে স্পর্ধা অহংকার ও বিদ্রোহের ভাবধারা থাকতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলাই হলেন সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির একমাত্র উৎস। তিনি স্বয়ং বলেন, "আমিই তোমাদের সর্বময় প্রতিপালক।" (সূরা আন-নাযিআত : ২৪)

আবার মানুষ নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে নীচু সত্তা বলে ধারণা করাও ঠিক নয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে নিজেকে গাছ, পাথর বা জন্তু জানোয়ারের পরিবর্তিত রূপ হিসেবে বিশ্বাস করা বা তাদেরকে উপাস্য ভেবে মান্য করা এক হীনমন্যতা মাত্র।

অতএব মানুষ না এতটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, যতটা সে অহমিকা বশত নিজেকে নিয়ে অহংকার করে। আর না সে এতটা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট যতটা সে নিজেকে বানাতে চায়, এ দুটি অতি ও ইতির মাঝামাঝি মানুষের মর্যাদা। ইসলাম এ চরম ধারণাকে বাতিল করে মানুষের সামনে তার প্রকৃত পরিচয়, তুলে ধরেছে। মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে তার ন্যায়পরায়ণতা, পরহেযগারী ও খোদাভীরুতার উপর। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদার অধিকারী যে বেশী মুত্তাকী।" (সূরা আল- হুজুরাত : ১৩)

কবির ভাষায়-

নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যার পূর্ণ কর্মময়।

বস্তুত ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানব জাতিকে সত্যিকার মর্যাদা দিয়েছে। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ এতটা মর্যাদা দেয়নি ও দিতে পারেনি। আর যারা মহান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এ মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে খোদাভীরুতা অর্জন করবে, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করবে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের সফলতা। যেমন তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

তারাই তাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম। (আল- বাকারা-৫)

সারকথা

আদম সন্তান ঊর্ধ্ব ও অধঃজগতের সমস্ত জীব-জন্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে গঠন কাঠামো, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, ঐশী কিতাব, খিলাফত থেকে নিয়ে সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন। তিনি তাদেরকে অতি সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব ও দেহাকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। স্থল-জলভাগ থেকে আরম্ভ করে চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, ছায়াপথ এক কথায় সমগ্র সৌরজগতকে মানবের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, আকাশ-পাতাল, আলো-বাতাস এমনকি পৃথিবীর রূপ, পাখীর গান, নদীর কলতান, নারীর সৌন্দর্য এ বিশ্ব জগতের সকল কিছুই মানব কল্যাণে সৃজিত। অতএব উপরের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ সকল বস্তুর উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব, প্রভূত্ব ও কর্তৃত্বের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মানুষ কেন শ্রেষ্ঠ জীব?

ক. মানুষ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে; খ. আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন;
গ. আল্লাহ ফেরেশতাকুলকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন; ঘ. উপরোক্ত সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

২. কোনটি মানুষের মর্যাদার প্রমাণ?
ক. মানুষের গঠনাকৃতিগত সৌন্দর্য; খ. জলে-স্থলে মানুষের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব;
গ. ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলে মানুষের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব; ঘ. উপরোক্ত সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৩. "তোমরা পবিত্র দ্রব্যাদি হতে ভক্ষণ কর"-এটি কার কথা?
ক. মহান আল্লাহর; খ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর;
গ. হযরত আবু বকর (রা.)-এর; ঘ. ইমাম গাযালী (র.) -এর।

৪. বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হলেন-
ক. হার্বার্ট স্পেনসার; খ. ডারউইন;
গ. সক্রেটিস; ঘ. গৌতম বুদ্ধ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন।
২. টীকা লিখুন- سخر لكم الليل والنهار
৩. মানুষের পরিচয় দিন।
৪. মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার কতিপয় কারণ উল্লেখ করুন।
৫. মানব মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার উপায় বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. "মানুষ মর্যাদাশীল ও সৃষ্টির সেরা জীব" আল-কুরআনের আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৬

মানবাধিকার সংক্রান্ত আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সংশ্লিষ্ট আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ বলতে পারবেন
- দারিদ্র্যের ভয়ে জাহেলী যুগে যে সন্তান হত্যা করা হত তার উল্লেখ করতে পারবেন
- মানবাধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী মৌলনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

١. مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (المائدة-٣٢)

٢. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الانعام-١٥١)

٣. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (التكوير-٨-٩)

অনুবাদ

১. মানুষ হত্যা অথবা ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (সূলা আল-মায়িদা : ৩২)

২. তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। (সূরা আল-আন'আম : ১৫১)।

৩. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা আত- তাকবীর : ৮-৯)

শব্দার্থ ও টীকা

من قتل যে ব্যক্তি হত্যা করে,

نفسا কোন ব্যক্তিকে

بغير نفس কোন প্রাণের বিনিময় ব্যতীত

فكأنما তবে সে যেন

من احياها যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করে

لاتقتلوا তোমরা হত্যা করবে না

املاق দারিদ্র্যের ভয়ে

لا تقربوا নিকটে যেওনা

الفواحش অশ্লীল আচরণ, বহুবচন; একবচনে الفاحش

لا تقتلوا اولادكم من املاق- দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা তৎকালীন আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল। তারা কন্যাদেরকে জীবন্ত সমাহিত করতো। আল্লাহ তাআলা এ জঘন্যতর অপরাধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের সন্তান হত্যার কারণটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন আর সেটি হল ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ভয়। আল্লাহ তাআলা দারিদ্র্যের ভীতি নিরসনের লক্ষে বলেন, রিযকদাতা তোমরা নও, রিযকের চাবিকাঠি আমার হাতে, আমিই জীবিকা দান করে থাকি।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জন্ম নিরোধ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত করণের যে সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যে উদ্দেশ্যে মানুষ তা গ্রহণ করছে বর্বরতার যুগেও সে একই কারণ এবং উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল। জাহেলী যুগ ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য নেই; পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত।

বর্তমান আধুনিক ব্যবস্থার অনুকূলে আযল (عزل) এর যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সন্তান হত্যা নিষিদ্ধের বিধান জারি হওয়ার পূর্বেকার ছিল অথবা তা নিরূপায় অবস্থার ক্ষেত্রে বর্ণিত। তবে নিরূপায় অবস্থায় হারাম বস্তু আহার করার যেরূপ অবকাশ রয়েছে। এমনি কোন স্বাস্থ্যগত কারণ উপস্থিত হলে জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আযল বা জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীআতে সাধারণভাবে গর্ভপাত ও জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। এরূপ ব্যবস্থা শুধু মানবাধিকার লংঘনই নয় বরং পৃথিবীর মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস করার এবং মুসলিম চরিত্র হরণ করারই একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মাত্র।

মানবাধিকার কাকে বলে ?

মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। শব্দগুলো প্রকৃত পক্ষে মানবাধিকার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অধিকার অর্থ হচ্ছে, মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন যাপনের জন্য যে সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগের দাবি রাখে যা ছাড়া সে মানুষ হিসেবে জীবন ধারণ, জীবনের প্রয়োজন মেটাতে পারে না এবং তার প্রতিভার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটানো সম্ভব নয় সে সকল প্রয়োজন পূরণের লিখিত ব্যবস্থার নামই হচ্ছে অধিকার।

মানুষ পৃথিবীতে সন্তান হিসেবে, পিতা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সরকার হিসেবে, নাগরিক হিসেবে, সেনাপতি হিসেবে, ক্রেতা-বিক্রেতা হিসেবে, ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে, মালিক-শ্রমিক হিসেবে যে সকল সুযোগ-সুবিধা অপরিহার্যভাবে পাওয়ার দাবি রাখে সেগুলোই হচ্ছে মানুষের অধিকার। মানুষ তার জীবন, সম্পদ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা লাভের ব্যবস্থার নামই মানুষের অধিকার। মানুষের মতামত প্রকাশ, ধর্মীয় নৈতিক জীবনধারা গড়ে তোলার সংগঠন ও সংস্থা গঠনের অধিকার তার জন্মগত অধিকার। মানুষের মৌলিক অধিকারের নামই হচ্ছে মূলতঃ মানবাধিকার।

বস্তুত মৌলিক অধিকারের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাস্কি, হার্বাট স্পেনসার, রামজু, মূয়র ও প্রখ্যাত গ্রীক আইনবিদ ফ্রিডম্যানসহ বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোন রাষ্ট্র দর্শন, কোন ধর্মই সকল পর্যায়ে মানুষের অধিকার প্রদান করেনি বরং ধর্ম ও রাষ্ট্র দর্শন উভয়টাই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মৌলিক অধিকার তথা মানব অধিকারকে সংকোচিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এরিষ্টোটল তার রাষ্ট্র দর্শনে মানুষকে ক্রীতদাস ও অভিজাতরূপে বিভক্ত করে ক্রীতদাসদের নাগরিক অধিকার হতে বিরত রাখার দর্শন উপহার দিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিকগণ ক্রীতদাসদেরকে শুধু বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণীর মর্যাদা দিয়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকারের ধারা সংযোজনের পর আবার বিশেষ ধারায় জনগণের অধিকার হরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রণীত কোন বিধানই মানুষের সামগ্রিক মৌলিক অধিকার প্রদান ও মানব অধিকার সংরক্ষণে সুষ্ঠু কোন পদ্ধতি উপহার দিতে পারেনি।

ইসলাম ও মানবাধিকার

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে কালজয়ী চিরন্তন আদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামই সকল যুগে মানব সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকার প্রদানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে।

অসীম জ্ঞানময়, নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধানই মানবাধিকারের নিশ্চয়তার গ্যারান্টি, সকল প্রাণী মানুষের অধিকার সংরক্ষণের নিখুঁত ও নির্ভুল জীবন দর্শন হল ইসলাম। আজকের বিশ্বে মানবাধিকার ভোগের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ইসলামই প্রকৃত পক্ষে আদম (আ) থেকে রাসূল করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এবং রাসূলের আবির্ভাব থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের সামাজিক অধিকারসমূহের সুস্পষ্ট বিধান ও মুলনীতি প্রদান করেছে।

ইসলাম শুধু কুরআন অবতীর্ণের পরই শুরু হয়নি। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলের দ্বীন-ইসলাম, এক ও অভিন্ন। অবশ্য শরীয়ত বিভিন্ন নবী ও রাসূলের যুগে আলাদা ছিল। ইসলাম তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী ও আখিরাতের জবাবদিহিতা ভিত্তিক কালজয়ী চিরন্তন জীবনদর্শন। ইসলাম তথা আল কুরআন ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা মানব জাতিকে যেসব অধিকার দান করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো।

জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তা

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ কারণে কোনরূপ কারণ ব্যতীত এবং আইনের চূড়ান্ত বিচারের রায় ছাড়া কোন মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করাকে সমস্ত মানুষকে হত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ ঘোষণা করেন, "নর হত্যার অপরাধ প্রমাণিত অথবা সামাজিক জীবনে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে যারা একজন মানুষকে হত্যা করল, তারা যেন গোটা বিশ্বের সমগ্র জনগোষ্ঠিকে হত্যা করল।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩২) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "দারিদ্র্যের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদের ও তাদের রিযিকের সংস্থান করি।" (সূরা আল-আনয়াম : ১৫১)

"আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছে ?" (সূরা আত-তাকভীর : ৮-৯)

অক্ষম ও দুর্বলদের নিরাপত্তা

আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, নারী-শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং রুগ্নদের উপর সকল অবস্থাতেই হাত উঠানো নিষেধ, চাই সে নিজের জাতির হোক অথবা শত্রু পক্ষের। তবে এদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

মহিলাদের মান সম্ভ্রমের হিফাযত

কুরআন থেকে আরো একটি মুলনীতি জানা যায় এবং হাদীসেও তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে যে, সর্বাবস্থায় নারীদের সতীত্ব, পবিত্রতা ও মানসম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যাবশ্যক, চাই সে নারী মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম। নিজ সম্প্রদায়ের হোক অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের, মিত্র রাষ্ট্রের হোক অথবা শত্রু রাষ্ট্রের।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্ম সংস্থানের অধিকার

ইসলাম জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ তথা প্রাণীকুলের খাদ্যের নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করেছে। দুঃস্থ, পঙ্গু, ইয়াতীম, মিসকিন ও সকল শ্রেণীর মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্য। রাসূল (সা) বলেন, যাদের অভিভাবক নেই, তাদের অভিভাবক আমি।

সুবিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিকার

ইসলাম শত্রু-মিত্র, মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের সুবিচার ও আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার প্রাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেনো এতোটা উত্তেজিত না করে (যার ফলে) তোমরা সুবিচার ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর ।" (সূরা আল-মায়িদা : ৮)

সৎকাজে সহযোগিতা অসৎ কাজে অসহযোগিতা ঃ

সৎকাজে এবং অধিকার পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করতে হবে আর খারাপ কাজ ও যুলমের ক্ষেত্রে কারোরই সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, "ন্যায় ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং গুণাহের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না।" (সূরা আল-মায়িদা : ২)

সমতার অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। যদি কারো প্রাধান্য থেকে থাকে তবে তা নির্ধারিত হবে চরিত্র ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে। এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "হে মানুষ ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি-- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক খোদাভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৬)

কোন ব্যক্তিকে পাপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া যাবে না এবং কোন ব্যক্তিকে যদি পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে এই নির্দেশ পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং বৈধও নয়। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর স্পষ্ট বাণী রয়েছে।

যালিমের আনুগত্য করতে অস্বীকার করার অধিকার

কোন যালিমের আনুগত্য দাবি করার অধিকার নেই। পবিত্র কুরআনে এসেছে, "হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে নেতৃত্বের পদে নিয়োগ করে বলেছিলেন, আমি তোমাকে মানুষের নেতা নিয়োগ করেছি তবে যালিমদের ক্ষেত্রে আমার এ ধরনের ওয়াদা নেই।"

রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের অধিকার ইসলাম নির্দিষ্ট করেছে এভাবে যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি জাতীয় সরকারের অংশীদার। সবার পরামর্শক্রমে সরকার গঠন করতে হবে। কুরআনে এসেছে, "আল্লাহ তাআলা তাদের পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করবেন।" (সূরা আন-নূর : ৫৫)

আরো বলা হয়েছে, "তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে।" (সূরা আশ-শূ'রা : ৩৮)

ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ

সুবিচার ব্যতিরেকে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। হযরত উমর (রা) সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, "ইসলামের নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া গ্রেফতার করা যাবে না।"

ব্যক্তি মালিকানা সংরক্ষণ

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়। কুরআন আমাদের সামনে ব্যক্তি মালিকানার চিত্র তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা বাতিল পন্থায় একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৮)

মানসম্মানের হিফাযাত

মান সম্মান ও ইজ্জত আবরূর হিফাজত করার মৌলিক অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। সূরা হুজুরাতের ১১-১২ নং আয়াতে এ অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার

ইসলামের মৌলিক মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি লোক ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে সূরা আন-নূরে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। নিজের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো না। (সূরা আন-নূর : ২৭)

শিক্ষার অধিকার

ইসলামে সকল স্তরের মানবের উপর জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যারা জানে আর যার জানেনা, তারা কি সমান হতে পারে"? রাসূল (সা) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয।"

যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার

ইসলাম-প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি হলো যে- কোন ব্যক্তি যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকার রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ মন্দ কথা বলুক তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি যুলুম করা হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা।" (সূরা আন-নিসা : ১৮৮)

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

ইসলাম মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। কুরআন তা অন্য পরিভাষায় বর্ণনা করেছে। কুরআনের বাণী হচ্ছে, "সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করা কেবল মানুষের অধিকারই নয় বরং সকলকে তা পালন করতে হবে।"

অমুসলিমদের অধিকার

ইসলাম অমুসলিম নাগরিকের ধর্মীয় অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আল-কুরআনে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরিত করার পদ্ধতিকে পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও গাল মন্দকে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন, "এক আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা যারা করে তাদের উপাস্যদের তোমরা গালি দিয়ো না।" (সূরা আল-আনআম : ১০৮) মহানবী (সা) বলেছেন, "অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবনের মত ও তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত।"

এছাড়াও ইসলাম মানবাধিকারের যে সকল বর্ণনা দিয়েছে তাহলো-

- সভা সংগঠন করার অধিকার
- আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার
- মানসিক নির্যাতন থেকে নিজকে সংরক্ষণ করার স্বাধীনতা
- একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবে না
- সন্দেহের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া যাবে না ইত্যাদি।

সারকথা

ইসলাম মানুষের অধিকার তথা মানবাধিকার সংরক্ষণ করেছে। এ দর্শন সম্পূর্ণ পরিস্কার এবং পরিপূর্ণ-যা মানুষকে তার জীবনের সূচনাতেই বলে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বর্তমান সময়ে দুনিয়াতে মানবাধিকারের যে ঘোষণা (Declaration of Human Rights) প্রতিধ্বনি হচ্ছে তার না আছে কোন প্রকারের স্বীকৃতি আর না আছে কার্যকর হওয়ার শক্তি। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা) মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র হতে চায় তাকে এ অধিকারগুলো মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। মুসলমান অমুসলমান সকলকে এ অধিকার দিতে হবে। এ অধিকার দিতে হবে শত্রু এবং মিত্রকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. আল-ফাওয়াহেশ শব্দের অর্থ হল-

ক. ষড়যন্ত্র; খ. অপরাধ;
গ. হত্যা; ঘ. অশ্লীলতাসমূহ।

২. আযল শব্দের অর্থ-

ক. জন্মনিয়ন্ত্রণ; খ. সন্তান হত্যা;
গ. জন্মনিরোধ প্রক্রিয়া; ঘ. গর্ভপাত।

৩. মানুষের মৌলিক অধিকারের ধারণা দেন-

ক. সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টোটল; খ. মহাত্মা গান্ধী ও নেহেরু;
গ. গেঁটে ও দান্তে এবং মাওসেতুং; ঘ. বিজ্ঞানী লাস্কি, হার্বার্ট স্পেনসার ও ফ্রিডম্যান প্রমুখ।

৪. সৎকাজে সহযোগিতা এবং অসৎকাজে অসহযোগিতা-এটি কার নীতি?

ক. জাতিসংঘের; খ. ইসলামের;
গ. সার্কের; ঘ. আরব লীগের।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর অনুবাদ করুন।
২. "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা করো না" এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করুন।
৩. মানবাধিকার বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকারের ধারণা দিন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মানবাধিকার বলতে কী বুঝেন? ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকারের মৌলনীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৭

দুস্থ মানবতার সেবা সংক্রান্ত আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সংশ্লিষ্ট আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর অর্থ বলতে পারবেন
- প্রয়োজনীয় টীকা লিখতে পারবেন
- দুস্থ মানবতার সেবা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- দুস্থ মানবতার সেবা ও মৌলিক মানবীয় গুণ বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন
- ইসলামী জীবন দর্শনে দুস্থ মানবতার সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- দুস্থ মানবতার জন্য রাসূল (সা)-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাণীর উল্লেখ করতে পারবেন
- দুস্থ মানবতার সেবার জন্য কী কী গুণ থাকা উচিৎ সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

١. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (البقرة-١٧٧)

٢. لَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (البلد- ١٦–١١)

অনুবাদ ঃ

১. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে ও দাসমুক্তির জন্য দান করলে। (সূরা আল বাকারা-১৭৭)

২. সে কঠিন ও দূর্ভেদ্য দূর্গে প্রবেশ পারেনি। তুমি কী জান, দুর্ভেদ্য দূর্গ কী ? তা হচ্ছে দাসত্ব-শৃংখল মোচন অথবা নিরন্ন মানুষের মধ্যে খাদ্যপ্রদান। ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত নিঃস্বকে। (সূরা আল-বালাদ : ১১-১৬)

শব্দার্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা

ان تولوا তোমরা ফিরাবে

البر পুণ্য, কল্যাণ, একবচন; বহুবচনে أبرار

امن ঈমান আনয়ন করল

ذوى القربي আত্মীয়-স্বজন

ابن السبيل পথিক/মুসাফির

السائلين সাহায্য প্রার্থীগণ

فى الرقاب দাস মুক্তির জন্য দান

العقبة গিরিপথ, কষ্টসাধ্য পথ

فك رقبة দাসমুক্তি

ذا مقربة আত্মীয়-স্বজন

ذا متربة ধুলি ধুসরিত অর্থাৎ রাস্তা ব্যতীত যার অন্য কোন অবলম্বন নেই। এখানে অর্থ- দরিদ্র ও নিষ্পেষিত।

عقبة শব্দটি এক বচন, বহুবচনে عقبة ও عقاب অর্থ-দূর্গম ও বন্দুর গিরিপথ। এখানে عقبة দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন।

১। মুজাহিদ বলেন, এটা জাহান্নামের উপর স্থাপনকৃত একটি কঠিন পথ।

২। হযরত আতা (র) বলেন, عقبة দ্বারা জাহান্নামের গিরিপথ উদ্দেশ্য।

৩। ইমাম কালবী বলেন, عقبة بين الجنة والنار অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে একটি পথ।

৪। কেউ কেউ বলেন, عقبة হলো দুর্গম বন্দুর পথ যা উপরের দিকে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এ পথটি অতি দুর্গম ও বন্দুর। এ পথে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয়। এ পথের পথিককে নিজের প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও শয়তানী লোভ-লালসার সাথে রীতিমত লড়াই করে চলতে হয়।

দুস্থ-মানবতার সেবা

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন ভারসাম্যমূলক, কল্যাণকর, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহর বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, ইহলৌকিক কল্যাণ, সুখ, সমৃদ্ধি, পরকালীন মুক্তি ও শান্তি ইসলামী জিন্দেগীর মূল লক্ষ্য। মানবতার সেবা হচ্ছে মানুষের কল্যাণ, মানব প্রেম, ভালবাসা, সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা। মানুষের সেবা-খিদমত তথা আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকার সংরক্ষণ ও সম্পাদনের জন্যই মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর এ ইবাদত দু'ভাগে বিভক্ত, হক্কুল্লাহ ও হককুল ইবাদত। আর এ ইবাদত আদায়ের ব্যাপারে দুর্বলতা ও গাফলতি পরিলক্ষিত হলে পরিশোধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও একাগ্র তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দেন। কিন্তু বান্দার হক ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বান্দা মাফ করা ছাড়া আল্লাহ মাফ করেন না। আর দুস্থ মানবতার সেবা হচ্ছে বান্দার হকের মধ্যে অন্যতম।

দুস্থ-মানবতার সেবা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

'ইনসান' শব্দটি উনস শব্দ হতে উদ্ভুত। তাই মানব প্রেম, ভালবাসা, মানব সেবা ও কল্যাণই হচ্ছে ইনসানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবির কবিতায়

দরদে দিলকে ওয়াস্তে পয়দা কিয়া হায় ইনসানকো
ওয়ারনা তাঁয়াত কি লিয়ে কুছ কমনাথে কাররু রিযা

অর্থাৎ মানুষের প্রতি ভালবাসা, প্রেম, সহমর্মিতার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নতুবা শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনার জন্য ফেরেশতাই যথেষ্ট ছিল।

দুস্থ মানবতার সেবা মৌলিক মানবীয় গুণ

যাদের মধ্যে দুস্থ মানবতার সেবা ও কল্যাণ কামনার চেতনা নেই, তারা মানবকুলের কলংক, তারা মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। পক্ষান্তরে দুস্থ-মানবতার সেবা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, প্রেম, কল্যাণ কামনা, মৌলিক মানবীয় গুণের অন্তর্ভুক্ত।

কবি কামিনী রায় কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন-
পরের কারণে স্বার্থ দিয়ে বলি, এ জীবন মন সকলই দাও
তার মতো সুখ কোথায় কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
আপনারে লয়ে বিব্রত রতে আসেনি কেউ অবনি পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

দুস্থ-মানবতার সেবা মুসলিম জীবন দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

মানব-প্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা-দরদ, অসহায় ও দুস্থ মানবতার সেবা ও কল্যাণই হচ্ছে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা মানবতা। আর এ মানব কল্যাণ ও মানুষের সেবাই হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অথচ আজ আমরা তা ভুলে গিয়েছি আর আমাদের কর্মগুলো বিজাতিরা আনুষ্ঠানিকতা দিচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুঃস্থ বা অসহায় বলতে শুধু পঙ্গু, দরিদ্র, নিরন্ন, মানুষকে বুঝায়নি। যারা মানব জীবনে মানুষের মনগড়া আইনের অনুসরণ করে সমাজে বেকার, অসহায়, নিরন্ন, অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তারাই প্রকৃত দুস্থ মানব। নবী করীম (সা) বলেছেন, সবচেয়ে বড় অসহায় তারা যারা অন্ধভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।
যে দুনিয়ায় অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র নিপীড়িত সে দুস্থ, অসহায় বা দরিদ্র্য নয় বরং সেই প্রকৃত দুস্থ ও দারিদ্র্য এবং অসহায় কিয়ামতের দিবসে যার আমলনামায় কোন নেকী থাকবে না।

নিকৃষ্ট দুঃস্থ ও সর্বহারা

নবী করীম (সা) বলেছেন, "যারা অপরের দুনিয়াকে সজ্জিত করার জন্য নিজের আখিরাতকে বরবাদ করেছে, কিয়ামতের দিবসে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, দুঃস্থ ও সর্বহারা তারাই।"

ইসলামী জীবন দর্শনে দুঃস্থ মানবতার সেবার গুরুত্ব

মানব কল্যাণ, মানব সেবা, মানুষের প্রতি প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজে ইসলাম মানুষকে উৎসাহিত করেছে। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাব। সৃষ্টির কল্যাণ, সেবা, তথা খিদমতে খালক এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন-
"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত! তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে মানুষকে কল্যাণের নির্দেশ ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখার জন্য।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

কল্যাণমূলক কাজ

ইসলামী জীবন দর্শনে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে ইবাদত করার মধ্যেই শুধু কল্যাণমূলক কাজ সীমিত নয় বরং দুঃস্থ মানবতার সেবা ও অন্যতম কল্যাণমূলক কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতেই শুধু নেক কাজ সীমিত নয় বরং নেক কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস, ফিরিশ্তাদের প্রতি বিশ্বাস, কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, নবীদের প্রতি বিশ্বাস, আর আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিখারীদের জন্য ও দাসত্বের শৃংখল মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করা।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭৭)

মানব সেবা

মানবতার সেবা ও মানব কল্যাণ একটি কঠিন কাজ। এ কাজের দায়িত্ব ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-
"সে কঠিন ও দুর্ভেদ্য দুর্গ অতিক্রম করতে পারেনি। তুমি কি জান, সে কঠিন দুর্ভেদ্য দূর্গটি কী ? তা হচ্ছে দাসত্ব-শৃংখল মোচন, নিরন্ন মানুষের খাদ্য প্রদান, নিকটাত্মীয় ইয়াতীমদের পূনর্বাসন ও ধুলি-ধুসরিত মিসকীনদের খাদ্যের সংস্থান করা।" (সূরা আল-বালাদ : ১১-১৬)
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,
"তারা আল্লাহর মহব্বতে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাদ্য প্রদান করে।" (সূরা আদ-দাহার : ৮)

জান্নাত প্রবেশের মাধ্যম

দুঃস্থ মানবতার সেবা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। নবী করীম (সা) বলেছেন, "মানুষের প্রতি সহমর্মিতা বর্জনকারী এবং সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রহমত নাযিল হয়

যে ব্যক্তি দুঃস্থ মানবতার প্রতি সহমর্মিতা দেখাবে, তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না যারা মানুষের প্রতি সহমর্মিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে।" (বায়হাকী) অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণা করে না, রাহমানুর রাহীমও তাদের প্রতি করুণা করে না। যমীনের অধিবাসীদের প্রতি রহম কর আসমানের অধিবাসী তোমাদের প্রতি রহম করবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমীযি)

রাসূল (সা)-এর বাণী

১. ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর ও রুগ্ন ব্যক্তির সেবা কর। (বুখারী)
২. আল্লাহ তাআলা ততদিন পর্যন্ত বান্দাহকে সাহায্য করেন, যতদিন অব্যাহতভাবে বান্দা তার ভাইদের সাহায্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। (বুখারী)
৩. রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা এবং মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো ইসলামের আদর্শ। (নাসায়ী)

জান্নাতের পোশাক প্রাপ্তি

নবী করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করালো, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন।"

জান্নাতে ফল ভক্ষণ

যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য প্রদান করল, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে ফল ভক্ষণ করাবেন। (আল-হাদীস)

জান্নাতের শরবত পান

যে মুসলমান কোন পিপাসার্ত মুসলমান ভাইকে পানি পান করাল, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাকে সিল মোহরকৃত এবং সুরক্ষিত শরবত পান করাবেন। (আবু দাউদ)

সাদকা করার সাওয়াব লাভ

কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা কোন ফল ও ফসল উৎপাদন করে এবং সে বৃক্ষ, উৎপাদিত ফলমূল, ও উৎপাদিত ফসল দ্বারা কোন মানুষ, প্রাণী ও পাখি উপকৃত হয়, তবে তার একাজ দ্বারা সাদকাহ করার সাওয়াব লাভ হবে। এমনকি চোরও যদি চুরি করে নেয় তবুও তা সাদকায় পরিণত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জান্নাতের সুসংবাদ লাভ

বনী ইসরাঈলের এক ভ্রষ্টা মহিলা নিজের পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়ে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর দরুন আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। (আল-হাদীস)

আযাব থেকে মুক্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশক

মানুষের সেবা শুধু পার্থিব জীবনের প্রয়োজন পূরণের মধ্যে সীমিত নয় বরং বিপর্যস্ত, অসহায়, দুঃস্থ-বিভ্রান্ত মানবতার সর্বাধিক বৃহত্তর সেবা ও খিদমত হচ্ছে অনন্ত আখিরাতে কঠিন আযাব থেকে মুক্তির সন্ধান ও পরকালীন জীবনে সাফল্যের পথ নির্দেশক। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে এবং সৎকর্মশীল হিসেবে জীবন যাপন করে এবং এ ঘোষণা প্রদান করে, আমি একজন মুসলমান।" (আল-কুরআন)
ইসলামে আধ্যাত্মিকতার উন্নত স্তরে উপনীত হওয়ার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে- দুঃস্থ, সর্বহারা ও অসহায় মানুষের সেবা করা, সমগ্র সৃষ্টির খেদমত ও কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। যারা সৃষ্টিকে ভালবাসে না, তারা আল্লাহকে ভালবাসে না। সৃষ্টির প্রেমই মানুষকে আল্লাহর প্রেমের স্তরে উপনীত করে।

আল্লাহকে সাহায্য করা

যে ব্যক্তি দুঃস্থ অসহায় মানুষকে সাহায্য করল, সে যেন আল্লাহকে সাহায্য করল। হাদীসে কুদসীতে আছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি তোমার কাছে বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয় চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে তা দাওনি। বান্দা বিস্মিত হয়ে আল্লাহকে প্রশ্ন করবে, হে প্রভু ! তুমি তো সব কিছুর মালিক, তুমি তো কারো মুখাপেক্ষী নও, তুমি কীভাবে আমাদের নিকট চাইতে পার ? আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দা তোমার কাছে চেয়েছে তখন যদি তুমি বান্দাকে সাহায্য করতে তবে আমাকেই সাহায্য করা হতো। আর আজ আমার কাছে উত্তম প্রতিদান পেতে।

শেখ সাদী (র.)-এর বাণী

তরীকত বজুয খিদমাতে খালক নিস্ত অর্থাৎ মানবতার সেবা ও কল্যাণ ছাড়া রূহানিয়াতের মানযিল অতিক্রম করা ও উন্নত স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

মানব জীবনে তাযকিয়ায়ে নাফস অর্থাৎ দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধি, দুঃস্থের পুনর্বাসন, মানব সেবা ও কল্যাণ ছাড়া রূহানিয়াতের মানযিল অতিক্রম করা ও উন্নত স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে উদ্বৃত হয়েছে, "তুমি তাদের নিকট থেকে সাদকা আদায় করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো।" (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূল থেকে স্পষ্টভাবে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামই একমাত্র মানব কল্যাণ ও মানবতার সেবায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং পরিপূর্ণ জীবন বিধান। শুধু মানুষই নয় বরং সমগ্র সৃষ্টি কুলের সেবার নির্দেশনা ইসলামী জীবন দর্শনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

সারকথা

বস্তুত কুরআন, সুন্নাহ, দর্শন, তাসাওফ ও ফিকহ ইসলামী জ্ঞানের সকল ধারা ও উৎস থেকে এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুঃস্থ মানবতার সেবা ও কল্যাণসাধন ছাড়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। পারে না মুসলিম বলে দাবি করতে ও আধ্যাত্মিকতার উন্নত স্তরে সমাসীন হতে। তাই আমাদের দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে অবশ্যই পূর্ণ তৎপরতার সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. البر শব্দের অর্থ

ক. নেক কাজ
খ. উপকারী বস্তু
গ. মন্দ কাজ
ঘ. জনকল্যাণমূলক কাজ।

২. العقبة অর্থ

ক. দুর্গ
খ. কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গ
গ. উপত্যকা
ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৩. যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত করেন না -এটা কার বাণী?

ক. আল্লাহর বাণী
খ. রাসূলের বাণী
গ. সাহাবীর বাণী
ঘ. কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির বাণী।

৪. যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য দান করল সে-

ক. জান্নাতের ফল ভক্ষণ করবে
খ. জান্নাতের পোশাক লাভ করবে
গ. রাসূল (সা)-এর সুপারিশ লাভ করবে
ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৫. যে ব্যক্তির উৎপাদিত ফলমূল ও ফসল দ্বারা মানুষ ও পশু পাখি উপকৃত হলো সে-

ক. সাদকা করার সাওয়াব পেল
খ. জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করল
গ. জান্নাতের শরবত পান করল
ঘ. দোযখের আযাব থেকে মুক্তি পেল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আল্লাহর বাণী العقبة শব্দটির বিশ্লেষণ করুন।
২. কিয়ামত দিবসে প্রকৃত দুস্থ মানব কে হবে ? আলোচনা করুন।
৩. 'দুস্থ মানবতার সেবা একটি জনকল্যাণমূলক কাজ' আলোচনা করুন।
৪. মানবতার সেবার মাধ্যমে কীভাবে দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধ হয়? আলোচনা করুন।
৫. ইসলামী জীবন দর্শনে দুস্থ-মানবতার সেবার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. দুস্থ মানবতার সেবা বলতে কী বুঝেন ? এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. দুস্থ মানবতার সেবা সংক্রান্ত নবী করীম (সা)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিন।

পাঠ ঃ ৮

ঐক্য ও সংহতি সংক্রান্ত আয়াত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ঐক্য ও সংহতি সংক্রান্ত আয়াতের অনুবাদ করতে পারবেন
- সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর অর্থ ও টীকা বলতে পারবেন
- ইসলামী ঐক্যের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

١. وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .(ال عمران-١٠٣)

٢. وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. (انفال-٤٦)

٣. شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ . (الشوري-١٣)

অনুবাদ

১. তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো আগুনের কিনারে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো। (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

২. তোমরা পরস্পরে কলহে লিপ্ত হয়ো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। (সূরা আল-আনফাল : ৪৬)

৩. তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা করবে, তার মধ্যে বিভেদ করবে না। (সূরা আশ-শূরা : ১৩)

শব্দার্থ ও টীকা

اعتصموا তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। الاعتصام মাছদার, মূলবর্ণ (ع-ص-م) ।

لا تفرقوا তোমরা পৃথক হইও না। التفرق মাছদার, মূল অক্ষর (ف-ر-ق) ।

اذكروا তোমরা স্বরণ কর। মাছদার الذكر মূল অক্ষর (ذ-ك-ر)।

اعداء শত্রুগণ, বহুবচন; একবচনে عدو ।

الف তিনি ভালবাসা সৃষ্টি করলেন।

انقذ সে রক্ষা করেছে, তিনি বাঁচিয়েছেন।

حفرة গর্ত। একবচন; বহুবচনে حفر - حفراء ।

النار আগুন, বহুবচনে نيران ।

আল্লাহ তাআলার বাণী حبل الله এর বিশ্লেষণ

حبل শব্দটির অর্থ রজ্জু। ইহা ছাড়া এ শব্দের আরো বহু অর্থ করা হয়। যেমন- ধর্ম, প্রতিশ্রুতি, শপথ, একতাসূত্র, চুক্তি-পত্র ও বন্ধুত্বের বন্ধন ইত্যাদি।

কেউ কেউ حبل الله শব্দের অর্থ-ইসলাম বলেছেন । কেউ حبل الله শব্দের অর্থ-পবিত্র কুরআন বলেছেন। আবার কেউ অন্যরূপ অর্থ করেছেন। কিন্তু সকল অর্থের মূল উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অতএব আয়াতের প্রকৃত মর্ম সম্বন্ধে তেমন কোন মতভেদ নেই।

شفا حفرة من النار এর মর্মার্থ

তাফসীরকারগণ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের কুফর ও শিরক করার কারণে তোমরা নরকাগ্নিতে পতিত হওয়ার একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের নরকাগ্নিতে পতিত হওয়ার মধ্যে তোমাদের কুফরাবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ব্যতীত আর কোন বস্তু বাধা প্রদানকারী ছিল না। কারণ উল্লিখিত অবস্থায় তোমাদের মুত্যু হলে তোমরা অবশ্যই নরকে পতিত হতে।

ঐক্যের অপরিহার্যতা

ঐক্য ইসলামের অন্যতম দিক। মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়ে এ ঐক্য সুনিশ্চিত করার পথ নির্দেশ করেছেন। মানব জীবনের অবসম্ভাবী সকল বিরোধ ও বিভেদের সমাপ্তি ঘটিয়ে অটুট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই ইসলামের আগমন ঘটে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে ঐক্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহর নির্দেশ

ইসলামী ঐক্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। আর বিভেদের মাধ্যমে তার অভিসম্পাত আসে। মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে মুসলিম উম্মাহকে বিভেদের পথ পরিহার করে ঐক্যের প্রতি পথ নির্দেশ করেছেন। আল্লাহর বাণী-

"তোমরা সকলে ঐকবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। অতপর বিভেদে লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহর ঐ অনুগ্রহের কথা স্বরণ করো যা তোমাদের উপর অবতরণ করেছেন। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। তিনিই তোমাদের অন্তরের মিলন ঘটালেন এবং তারই অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা একটা কুন্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহই তোমাদের সামনে তার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন যেনো তোমরা সত্যের পথ দেখতে পাও।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

বিভেদ হতে বারণ

মানুষ আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পরকে ভাল কাজের প্রতি আহবান করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করবে না। বিভেদ ও বিভক্তি থেকে বিরত থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমাদের মাঝে এমন একটা দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা ভাল কাজের প্রতি আহবান করবে, কল্যাণময় কাজের নির্দেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই সাফল্য লাভ করবে আর তোমরা ঐ সমস্ত লোকের মতো হয়োনা যারা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তির পরও বিভেদে লিপ্ত রয়েছে। তারা কঠিন শাস্তি পাবে।"

মানব সমাজ অভিন্ন গোষ্ঠী

মানুষ সামাজিকভাবে অভিন্ন জনগোষ্ঠী। ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের কাজ। আল্লাহ পাক মানুষের উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং নবী রাসূলগণ এরই সাহায্যে মানুষের মধ্যে তাদের বিভেদ সম্পর্কে ফয়সালা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "মানুষ অভিন্ন গোষ্ঠী ছিলো, অতঃপর আল্লাহ অনেক নবী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী পাঠালেন, তাদের উপর কিতাব নাযিল করলেন। সত্য আদর্শের সাথে এরই সাহায্যে নবী-রাসূলগণ মানুষের মধ্যে তাদের বিভেদ সম্পর্কে ফয়সালা দিলেন।" (সূরা আল-বাকারা) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের এই উম্মাহ একই উম্মাহ, তোমরা আমাকে ভয় কর (সূরা আল-মুমিন)।

শক্তির উৎস

ঐক্য হচ্ছে শক্তি সামর্থ্যের অন্যতম উৎস। যেমন প্রবাদ আছে, "একতাই বল"। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ো না। তাতে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ্য চলে যাবে।" (সূরা আল-আনফাল)

ঐক্যের ব্যাপারে রাসূলের (স) বাণী

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (স) বলেন, "মুমিনগণ সমষ্টিগতভাবে একটা ইমারতের মত, যার একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে-মিশে আছে, অতঃপর নবী করীম (স) তাঁর আঙ্গুলগুলো পরস্পরে মিলিত করলেন।" অর্থাৎ আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির সাথে যেভাবে মিশে আছে তেমনি মুমিনরাও মিলেমিশে থাকবে। এটাই মুমিনের আসল পরিচয়।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির ভিত্তি

ঐক্য মুসলমানদের জাতীয় শক্তির ভিত্তি। ঐক্য ও মৈত্রী জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে প্রশংসনীয় ও কাম্য বিষয়। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐক্যের কথা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। কুরআনে পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃংখলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্যে একটি মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরার কথা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু তথা আল কুরআনকে আঁকড়িয়ে ধরার কথা বলেছেন।

ঐক্যের গুরুত্ব

মুসলিম উম্মাহ তথা মুসলমানদের পরস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআন ও নবী করীম (স) এর অসংখ্য হাদীসের মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তোমাদের জন্য তিনি ঐ দ্বীন নির্ধারন করেছেন যা নূহের উপর আরোপিত হয়েছে। তিনি তোমার উপর তাই নাযিল করেছেন এবং এ দ্বীন সম্পর্কেই তিনি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করবে। তার মধ্যে বিভেদ করবে না।" (সূরা আশ-শূরা) আল্লাহ ভীতি ও সৎকাজের ব্যাপারে পরস্পরে সহযোগিতা করা, পাপ ও অশ্লিল কাজে সহযোগিতা না করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সূরা মায়িদায় আল্লাহ বলেন– "তোমরা আল্লাহভীতি ও সৎকাজের ব্যাপারে পরস্পরে সহযোগিতা করো, গোনাহ ও শত্রুতার পথে সহায়তা করোনা।" মুসলিম উম্মাহর ঐক্যই আল্লাহর একান্ত কাম্য। অপরিহার্য মতপার্থক্য ও বাস্তব বিভেদের মাঝেও এই ঐক্যের বন্ধন শিথিল করা যাবে না। প্রতিটি মুসলমানকে এ সম্পর্কের কথা সদা স্মরণ রাখতে হবে। কোন অবস্থায় মুসলমানদের এ হক হরণ করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম (স) বলেন, " তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভুতিতে, সম্প্রীতিতে ও ভালবাসায় এক দেহবৎ দেখতে পাবে। যদি একটা অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে অপরাপর অঙ্গ-প্রসঙ্গ ও বিনিদ্রায়, জ্বরে উক্ত অঙ্গের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করে।" অতএব, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সম্মিলিতভাবে ঐক্যকে সুদৃঢ় রাখবে। ঐক্যের ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হবে।

ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হল আল কুরআন / ইসলাম

ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। যেমন- আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শকে এক জাতি আর বনূ তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। আবার কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি আর শ্বেতাঙ্গদেরকে অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্র বিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা এক জাতি ও আরবরা অন্য জাতি হয়ে গেছে।
কিন্তু ইসলাম তথা কুরআনুল কারীমে এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্র বিন্দু "হাবলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি– যারা আল্লাহর রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফেররা ভিন্ন জাতি যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়। অতএব মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ করতে হবে। যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃংখল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সারকথা

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামই ঐক্যের আদর্শ। আদর্শিক ঐক্যই ইসলামে মুসলিম উম্মাহর অটুট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়ে এ ঐক্য সুনিশ্চিত করেছেন। নবী রাসূলের মাধ্যমে আসমানী শিক্ষার ভিত্তিতে কাংখিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সকল চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইসলামী আদর্শকে জয়যুক্ত করেছেন। আর এ ঐক্যের মাধ্যমেই মানবতার অস্তিত্ব বহাল রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. শূন্যস্থানপূরণ করুন

ক. তোমরা সকলে ..... আল্লাহর ..... আকঁড়ে ধরো।
খ. অতঃপর ..... হয়ো না। আল্লাহরই ..... স্মরণ করো যা..... করেছেন।
গ. তোমরা ..... হয়ো না। তাতে তোমরা ..... হয়ে যাবে।

২. হাবলুল্লাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে-

খ. ইসলাম; খ. আল-কুরআন;
গ. আল্লাহর রজ্জু; ঘ. উপরোক্ত সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৩. মুসলিম দর্শনের ঐক্যের বিধান হল-

ক. এটি ফরয; খ. এটি সুন্নাত
গ. এটি মাকরূহ্; ঘ. উপরোক্ত সব ক'টিই উত্তরই ভুল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঐক্য ও সংহতি বিষয়ক প্রথম আয়াতটির অনুবাদ লিখুন।
২. 'হাবলুল্লাহ' (حبل الله) শব্দের টীকা লিখুন।
৩. شفا حفرة من النار -এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করুন।
৪. ঐক্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ উল্লেখ করুন।

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. আল-কুরআনের আলোকে ইসলামী ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

ইউনিট ৪

আল-হাদীস : পরিচিতি ও বিষয়বস্তু

ইসলামী জীবন দর্শনের মৌল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুআ'আন ও আল-হাদীস। কুরআন জীবন বিধানের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে; আর হাদীস সেই মৌলনীতির আলোকে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রয়োগ ও রূপায়ন করেছে। তাই হাদীস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যার সহায়ক, কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর (স) পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তৃত উপস্থাপনা। আল-কুরআনের ভাষায়-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ

"এবং সে মনগড়া কথা বলে না, এতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা আন-নাজম : ৩-৪)

সুতরাং কুরআন ইসলামের প্রদ্বীপ স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড আর হাদীস সে হৃৎপিন্ডের সংযুক্ত ধমনী। অতএব ইসলামী জীবন-দর্শনে কুরআনের সাথ সাথে এর অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটিকে বাদ দিলে অপরটির কোন অস্তিত্বই থাকে না। এ অপসিমীম গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রথম থেকেই মহানবীর (স) প্রতিটি বাণী, কথা, কাজ, আচরণ ও জীবনের যাবতীয় তৎপরতা অতি সুনিপুণভাবে সংরক্ষিত আকারে বর্তমান পর্যন্ত এসেছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

- পাঠ-১ হাদীস পরিচিতি
- পাঠ-২ হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ-৩ হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি
- পাঠ-৪ হাদীসের শ্রেণী বিভাগ
- পাঠ-৫ সহীহাইনের সংকলন
- পাঠ-৬ সুনানে আরবাআ সংকলন

পাঠ-১

হাদীস পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হাদীসের পরিচয় দিতে পারবেন
- হাদীসের সাধারণ প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ বলতে পারবেন
- বর্ণনাকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

হাদীসের আভিধানিক পরিচয়

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ: حديث শব্দটি فعيل-এর ওযনে حديث এটি বাবে تفعيل থেকে গঠিত। মূলধাতু ح-د-ث -এর আভিধানিক অর্থঃ নতুন, কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ, স্বল্পকালীন কথা, ব্যাপার, বিষয় ইত্যাদি। এটি قديم -এর বিপরীতার্থক শব্দ।

পারিভাষিক পরিচয়

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী ও কাজ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন ও অনুমোদন ইসলামী শরী'আতে হাদীস নামে অভিহিত।
ইমাম সাখাভীর মতে হাদীস হচ্ছে-

قول رسول الله (صلعم) وفعله وتقريره وصفته حتى الحركات وألسكنات فى اليقظة والنوم

"হাদীস বলতে বুঝায় রাসূলের (স) বাণী, কাজ, সমর্থন, অনুমোদন এবং তার গুণ; এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত।" পরবর্তীকালে সাহাবী ও তাবিঈদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে ও হাদীস বলা হতো।

মহানবী (স), সাহাবা, তাবি'ঈ এবং তাবি তাবি'ঈন (র)-এর কথা কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে যদিও হাদীস বলা হয়, তবে শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। আর তাই এর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা পরিভাষা রয়েছে। যথা নবীর (স) বাণী, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় হাদীস। সাহাবার কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় আছার' এবং তাবি'ঈ ও তাবি তাবি'ঈন -এর কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'ফাতওয়া'। এ তিন শ্রেণীর হাদীসের জন্য স্বতন্ত্র পারিভাষিক নাম ও রয়েছে। যথাক্রমে মারফূ', মাওকুফ এবং মাকতূ'। সুতরাং হাদীস মহানবী (স)-এর ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ও তাঁরই সাথে সম্পর্কিত।

হাদীস ও সুন্নাত কি সমার্থক

হাদীসের অপর এক নাম হচ্ছে সুন্নাত। সুন্নাত শব্দের অর্থ হলো ঃ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি।

ইমাম রাগিব বলেন, وسنة النبى (ص) طريقته التى يتحراها "সুন্নাতুন্নবী বলতে সে রীতি ও পদ্ধতিকে বুঝায় যা নবী কারীম (স) বাছাই করে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন।" ইহা কখনো কখনো হাদীস শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল-কুরআনে যাকে اسوة حسنة মহোত্তম আদর্শ বলা হয়েছে, তাকেই সুন্নাত বলা হয়। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ বিশেষ করে মুতাআখ্খিরীন মুহাদ্দিসগণ হাদীস ও সুন্নাতকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। সুন্নাত শব্দটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্বতোভাবে হাদীস শব্দের সমার্থক না হলেও বর্তমানে উভয়কে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

হাদীসের প্রকারভেদ

প্রকৃতপক্ষে হাদীস দু' প্রকার। ১. সহীহ (বিশুদ্ধ), ২. যঈফ (দুর্বল)। মওজু (জাল) হাদীসকে হাদীস বলা উচিৎ নয়। তবে মুহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারী, বর্ণনাকারীর অবস্থা, সংখ্যা ও ধারাবাহিকতার আলোকে হাদীসকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন। এবার আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

◆ সহীহ (বিশুদ্ধ)

যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি স্তরে সকল রাবী عادل (আদেল) ও পরিপূর্ণ ضابط (যাবেত) হবেন। আদেল শব্দের অর্থ-পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ ও উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন এবং যাবেত শব্দের অর্থ-পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন। বর্ণনা পরম্পরায় (اتصال السند) -এর অব্যাহত ধারাবাহিকতা থাকবে এবং হাদীসটি شاذ (শায) ও معلل (মুআল্লাল) হবে না, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

◆ হাসান (উত্তম)

যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় সকল রাবী عادل (আদেল) হবেন। বর্ণনা পরম্পরায় অব্যাহত ধারাবাহিকতা থাকবে এবং হাদীসটি شاذ (শায) ও معلل (মুআল্লাল) হবে না। তবে কোন রাবী যদি ضابط (যাবেত) হওয়ার ক্ষেত্রে অপরিপূর্ণ হন তা হলে তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে।

◆ যঈফ (দুর্বল)

যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের সংজ্ঞায় বর্ণিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া না যায়, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে।

◆ মাওজু (জাল)

মিথ্যাবাদীগণ রচিত জাল হাদীস, যা রাসূলুল্লাহ (স) হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে মাওজু (موضوع) হাদীস বলে।

সারকথা

মনে রাখবেন সহীহ, হাসান ও যঈফ হাদীসের প্রকরণে নিম্নবর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ঃ

১. রাবীগণ আদেল তথা পরিপূর্ণ ন্যায়-নিষ্ঠ ও উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন হবেন।
২. রাবীগণ যাবেত তথা পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন হবেন।
৩. বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত থাকবে।
৪. হাদীস দুর্বল হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যাবে না।

এ চারটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটির অনুপস্থিতি হাদীসকে যঈফে পরিণত করে।

◆ শায (ব্যতিক্রম)

যে হাদীস কোন ثقة (নির্ভরযোগ্য) রাবী হতে বর্ণিত হয়েছে বটে, তবে তা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীগণ বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী, তাকে শায (شاذ) হাদীস বলে।

◆ মুআল্লাল (ত্রুটিযুক্ত)

যে হাদীসে এমন কোন গোপন কারণের উপস্থিতি ঘটে যা হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়, তাকে মুআল্লাল (معلل) হাদীস বলে।

বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে হাদীসের প্রকরণ

◆ কুদসী

যে হাদীসের ভাষা ও ভাব মহান আল্লাহর, তবে তা নবী (সা) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন এরূপ হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলে।

◆ মাওকূফ

যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা কোন তাবেঈ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে এবং যিনি সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ (مرفوع) হাদীস বলে।

◆ মাকতূ

যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা কোন তাবয়ে তাবেঈ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে এবং যিনি তাবেঈ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাকে মাক্তূ (مقطوع) হাদীস বলে।
মনে রাখবেন, এখানে সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরা বা ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে সর্বশেষে বর্ণনাকারী কে সেটাই বিবেচ্য।

বর্ণনাকরীর সংখ্যার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকরণ

◆ **মুতাওয়াতির**
প্রথম রাবী থেকে সর্বশেষ রাবী তথা সাহাবী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রাবীর সংখ্যা নয়ের অধিক হলে তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। মতান্তরে প্রথম রাবী থেকে সর্বশেষ রাবী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রাবীর সংখ্যা এত অধিক হবে যে, যাদের অসত্য বক্তব্যে ঐকমত্য হওয়াটা অসম্ভব।

◆ **মাশহূর**
প্রথম রাবী (গ্রন্থ প্রণেতা) থেকে সর্বশেষ রাবী তথা সাহাবী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে তিন, উর্ধ্বে নয় জন হলে তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে। কারো কারো মতে মাশহূর হাদীসকে মুস্তাফীয হাদীসও (مستفيض) বলা হয়।

◆ **আযীয**
প্রথম রাবী তথা গ্রন্থ প্রণেতা থেকে সর্বশেষ রাবী তথা সাহাবী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে রাবীর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হলে তাকে আযীয (عزيز) হাদীস বলে।

◆ **গারীব**
প্রথম রাবী তথা গ্রন্থ প্রণেতা থেকে সর্বশেষ রাবী তথা সাহাবী পর্যন্ত যে কোন স্তরে রাবীর সংখ্যা এক হলে তাকে গারীব (غريب) হাদীস বলে। উল্লেখ্য, মুতাওয়াতির ব্যতীত বাকী সকল হাদীকে خبر احاد (খবরে আহাদ) এবং এককভাবে একটি হাদীসকে خبر واحد (খবরে ওয়াহিদ) বলে।
মনে রাখবেন, এখানে সনদ ঠিক রেখে রাবী তথা বর্ণনাকারীগণের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর সংখ্যা কত, সেটাই বিবেচ্য।

বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকরণ

◆ **মুরসাল**
যে হাদীসের সনদে সর্বশেষ রাবী তথা সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ স্বয়ং মহানবী (স) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

◆ **মু'দাল**
যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় পরপর দু'জন রাবী তথা তাবেঈ ও তাবে তাবেঈর নাম বাদ পড়েছে এবং দ্বিতীয় রাবী স্বয়ং সাহাবার মাধ্যমে মহানবী (স) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, তাকে হাদীসে মু'দাল (معضل) বলে।

◆ **মুনকাতে**
যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় কোন রাবী তথা তাবেঈর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবে তাবেঈ স্বয়ং সাহাবার মাধ্যমে মহানবী (স) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, তাকে হাদীসে মুনকাতে (منقطع) বলে।

◆ **মুআল্লাক**
যে হাদীসের বর্ণনাকারীরে ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় রাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং প্রথম তথা গ্রন্থ প্রণেতা স্বয়ং তাবে তাবেঈ, তাবেঈ এবং সাহাবার মাধ্যমে মহানবী (স) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মনে রাখবেন, এখানে রাবী তথা বর্ণনবাকারীগণের ধারাবাহিকতা কোথায় ভঙ্গ হল, সেটাই বিবেচ্য।

সারকথা

হাদীসের অর্থ কথা-বাণী ও নতুন বিষয়। পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। অনুরূপভাবে সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে 'আছার' বলে। আর তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে 'ফাতাওয়া' বলে।

হাদীস ও সুন্নাত প্রায় সমার্থবোধক। বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা ও সংখ্যা এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকে হাদীসকে বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে সহীহ, মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহেদ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বেশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. সাহাবীদের কথাকে কী বলা হয় ?
ক. হাদীস খ. আছার
গ. ফাতাওয়া ঘ. রিওয়ায়াত

২. মুহাদ্দিসগণ মৌলিকভাবে হাদীসকে কয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন ?
ক. ৪ টি খ. ৬ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৫ টি

৩. সহীহ, হাসান ও যঈফ হাদীসের প্রকরণে কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে-
ক. ৫ টি খ. ৪ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৬ টি

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. খ, ২. ক, ৩. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন
১. হাদীসের আভিধানিক ও পরিভাষাগত অর্থ লিখুন।
২. হাদীস ও সুন্নাহ কি অভিন্ন শব্দ ?
৩. মাওকুফ ও মাক্তু হাদীসের পরিচয় দিন।
৪. হাদীসে মাশহুর ও হাদীসে গারীব বলতে কী বুঝায়?

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন
১. হাদীসের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করুন।

পাঠ-২

হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হাদীসের বিধানগত গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে হাদীসের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে হাদীসের গুরুত্বের বিবরণ দিতে পারবেন

- ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে হাদীসের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন
- জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন
- মানব জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- পারিবারিক জীবনে হাদীসের গুরুত্ব বলতে পারবেন
- সামাজিক জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন
- অর্থনৈতিক জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন
- শিক্ষা-সাংস্কৃতিক জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রাষ্ট্রীয় জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- আন্তর্জাতিক জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। আর সে ইবাদাত হতে হবে রাসূলের পদাংক অনুসরণে ও তাঁর প্রদর্শিত পন্থায়। কেননা রাসূল (স) প্রেরিত হয়েছেন অনুসরণের জন্য। তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য। অপরদিকে কুরআনুল কারীমে ইবাদতের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে। হাদীসে এসেছে তার ব্যাখ্যা, রাসূলের বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে। যেমন সালাত, যাকাত ইত্যাদি। এ ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবহারিক ও চারিত্রিক ইত্যাদি বিষয়াদিও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে হাদীসে। তাই মানব জীবনে রয়েছে হাদীসের অপরিসীম গুরুত্ব।

এখানে মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক নিচে আলোকপাত করা হলো-

হাদীসের বিধানগত গুরুত্ব

হাদীসের বিধানগত গুরুত্ব হচ্ছে, তা শরী'আতের বিধি-বিধান নির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করে। 'মিফতাহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে 'আল্লামা খাওলী' হাদীসের বিধানগত মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে মহান আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন-

أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ

"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদের নিষেধ করে তা বর্জন কর।" (সূরা আল-হাশর : ৭)

এ সকল আয়াত দ্বারা শরী'আতের বিধান নির্ধারণে হাদীসের স্বকীয়তা ও গুরুত্ব অনুমিত হয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণে হাদীসের গুরুত্ব

কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রধান মাধ্যম হাদীস। হাদীসই কুরআনের উত্তম ব্যাখ্যা। নিম্নে বর্ণিত কুরআনের বাণী হাদীসের এ গুরুত্বই তুলে ধরেছে-

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি। মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল।" (সূরা আন-নাহল : ৪৪)

কুরআন ব্যাখ্যা ও বয়ান করার তাৎপর্য প্রসংগে হাফিয ইবনে আব্দুল বার বলেন, নবী কারীম (স) দু'ভাবে কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন।

এক. মৌখিক ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা

দুই. ব্যবহরিক ব্যাখ্যা। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আহকাম, যাকাত সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসআলা, হাজ্জের নিয়ম বর্ণনা ইত্যাদি।

মহানবী (স) কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, তার বাস্তব উদাহরণ হাদীস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসই যেহেতু কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা তাই হাদীসের সাহায্য ছাড়া কুরআনের যথাযথ ব্যাখ্যা ও অর্থ করা, এর সঠিক উদ্দেশ্য ও ভাবধারা নিরূপণ করা সুকঠিন। মহানবী (স) নিছক মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করে বলেন-

من قال فى القران برائه فليتبؤءا مقعده من النار

"যে ব্যক্তি মনগড়াভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা দেয় তার ঠিকানা দোযখ।" (তিরমিযী)

ইমাম আহমদের (র) উক্তিটি এক্ষেত্রে খুবই চমৎকার ان السنة تفسر الكتاب وتبينه
"সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং তার অর্থ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে।"
ইমাম আওযাঈ ও মাকহুল এর মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য-

القران احوج الى السنة من السنة الى القران

"আল-কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য হাদীস অধিক প্রয়োজনীয়; কিন্তু হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের প্রয়োজন ততটা নয়।"
এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে যে মূলনীতি পেশ করেছেন তা হচ্ছে-

فأصول جميع المسائل ذكرت فى القران، اما تفاريعها فبينها رسول الله (ص)

"সমস্ত বিষয়েরই মূল বিধান কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা, খুঁটিনাটি ও ব্যবহারিক নিয়মনীতি সবই রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেছেন, তথা তাঁর হাদীস হতে জানা যায়।"

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার (র) উক্তি খুবই চমৎকার - لولا السنة ما فهم احد منا القران "সুন্নাত না হলে আমরা কেউ কুরআন বুঝতাম না।"

অনুসরণীয় আদর্শ

ইসলামী শরী'আর নিরিখে মহানবীর (স) আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কর্মকান্ড, কথাবার্তা-তথা গোটা জীবনই উম্মাতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। যেমন কুরআন বলছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُول ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই। যেমন- মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"রাসূলকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। (সূরা আন-নিসা : ৬৪)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর।" (সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ "তার আনুগত্য করলে হিদায়াত পাবে।" (সূরা আন-নূর : ৫৪)
সুতরাং রাসূলের (স) আনুগত্যের জন্য তাঁর সামগ্রিক জীবন তথা হাদীসের প্রামাণ্য রেকর্ড অনুসরণ করা ঈমানদার হওয়ার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস

মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের ২টি সূত্র আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

প্রথমত ঃ মানবীয় পঞ্চ ইন্দ্রীয় ও বুদ্ধি প্রজ্ঞা, চিন্তা-গবেষণা। আর এর দ্বারা বস্তুজগতের সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক জ্ঞান নিছক ধারণাও অনুমাণ প্রসূত। আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শ তাই চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত।

দ্বিতীয়ত ঃ বস্তুজগতের উর্ধ্বে যে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উৎস তা হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। আর হাদীস এক প্রকার ওহী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র) লিখেন, "ইলমে হাদীস সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদীসে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও তাঁর সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন বিধৃত। বস্তুত ইহা অন্ধকারে আলোক স্তম্ভ, যেমন সর্বদিক

উজ্জ্বলকারী পূর্ণ শশী। যে এর অনুসারী হবে, একে আয়ত্ত করবে, সে সুপথ প্রাপ্ত হবে, সে লাভ করবে বিপুলায়তন কল্যাণের ফল্গুধারা।"

পবিত্র কুরআন এ কারণে একে হিকমাত বলেছে- وانزل الله عليك الكتاب والحكمة "আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন।" মূলত মহানবীর (স) এই 'হিকমাত' হচ্ছে হাদীস, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার।

ঐতিহাসিক দলীল

হাদীস ইসলামের প্রামাণ্য উৎস। হাদীস পর্যালোচনা, সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ দ্বারা ইতিহাস চেতনার উন্মেষ ঘটে। হাদীস বর্ণনাকারী অগণিত ব্যক্তির জীবন, কর্মতৎপরতা ও চরিত্র উদঘাটন করতে গিয়ে বিপুলায়তন নব্য তথ্যের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। হাদীসের মাধ্যমে সমকালীন আরবসহ সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি ও জীবনযাত্রার তথ্য মিলে। এছাড়াও পৃথিবীর আদি ইতিহাসের অনেক নির্ভুল-সঠিক তথ্যও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা

হাদীস কেবল মহানবীর (স) জীবন ও উপদেশের সংকলনই নয়; বরং এটা তাঁর সকল কর্মতৎপরতার পূর্ণাঙ্গ দলীল। ধর্ম, যুদ্ধ, যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা, সরকার পরিচালনার নীতি, -সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদীসের গুরুত্ব যে কতখানি তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়।

মানব জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি জীবনে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শ মানুষের ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করে। মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও লক্ষ্য নির্ধারণের উপর নির্ভর করে তার জীবনের শান্তি, উন্নতি আর মুক্তি। হাদীস মানুষের সে সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধান বলে দেয়। শিরক, বিদআত, অবিশ্বাস, কপটতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা রয়েছে হাদীসে। সর্বপ্রকার অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ জীবনাচারের প্রতি পবিত্র হাদীস ব্যক্তিকে আহবান জানায়। অপরদিকে ব্যক্তিজীবনে মানবের দেহ-মন ও আত্মার সমন্বয় সাধন না হলে মানবের ব্যক্তি জীবন সমস্যা সংকুল ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। তাছাড়া মানুষের মন ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার বিধান পাওয়া যায় হাদীসের মধ্যে। মহানবী বলেন-

ان الله لا ينظر الى صوركم وامو الكم ولكن ينظر الى قلو بكم واعما لكم

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরসমূহ ও তোমাদের আমলসমূহ।"

পারিবারিক জীবনে

সামাজিক জীবনের প্রাথমিক সংঘ হচ্ছে পরিবার। পরিবার ব্যবস্থা ছাড়া সভ্যতা মূল্যহীন। পরিবার গঠন, পরিচালনা, বিয়ে, তালাক, সন্তানের ভরণ-পোষণ, লালন-পালন, শিক্ষাদান ইত্যাদি পরিবারের দায়িত্ব। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান হাদীসে দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণ, ব্যভিচার, লীভ-টুগেদার, গোপন অভিসার, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি, বহুগামিতা, অমতাচার ইত্যাদির ন্যায় সামাজিক অভিশাপ থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় দূর্গের মত মানুষকে মুক্ত রাখে। আর এসব কিছুর পরিপূর্ণ রূপরেখা হাদীসে এসেছে।

সামাজিক জীবনে

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে রয়েছে অগণিত সমস্যা। পবিত্র কুরআনে সামাজিক বন্ধনের মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। আর হাদীসে এসেছে সমাজ জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলী। প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো হাদীসের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। সমাজের বন্ধন, গঠন, উন্নয়ন, উৎকর্ষতা ও শৃঙ্খলা বিধান কিভাবে করতে হয় এবং সমাজের ভাঙ্গন রোধ, অন্যায় অত্যাচার, অসামাজিক কার্যাবলীর ক্ষতিকর প্রভাব ও এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় সবই হাদীসে এসেছে। সমাজের বিভিন্ন মানুষের অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, নাগরিক সকলের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে, তার সব কিছু হাদীসে এসেছে।

রাজনৈতিক জীবনে

দুনিয়ায় অশান্তির মূল কারণ মানুষের মনগড়া আইন ও দুর্নীতিবাজ লোকের শাসন। এজন্য আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন ছাড়া মানুষের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বয়ং রাসূল (স) আল্লাহর আইন ও সৎ মানুষের শাসন কায়েমের বাস্তব উদাহরণ পেশ করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা রাজনীতির সকল খুঁটিনাটি বিষয় হাদীসের মাধ্যমে পাই।

অর্থনৈতিক জীবনে

বস্তুবাদী সভ্যতা অর্থনীতিকে মূল সমস্যা মনে করে। কিন্তু ইসলাম এটাকে বড় বা প্রধান সমস্যা মনে করে না তবে অন্যতম সমস্যা বলে থাকে। রাসূল (স) বাস্তবধর্মী এক সুষম অর্থনীতি পেশ করেছেন, যা সর্বজনীন ও কালজয়ী। তিনি যাকাত, উশর, খারাজ, ফাই, গনীমত, সাদাক, জিযিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য নীতি, কৃষিব্যবস্থা এবং অন্যান্য কর ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি আদর্শ ও শোষণহীন অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন। আমরা হাদীসের মাধ্যমে এর বিস্তারিত বিবরণ পেয়ে থাকি।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন

মানুষের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক জীবনেও হাদীসের রয়েছে সুষ্ঠু ও পরিশীলিত-মার্জিত মূল্যবোধ ভিত্তিক প্রগতিশীল চিন্তাধারা। শিক্ষাকে সকল নারী-পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাওহীদ ভিত্তিক পরিচ্ছন্ন পূত:পবিত্র সংস্কৃতি চর্চার প্রতি উৎসাহিত করেছে ইসলাম। আর এ সব কিছুর বিধান আমরা হাদীসে পাই।

রাষ্ট্রীয় জীবনে

সমাজের বৃহত্তর অঙ্গন হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ অবকাঠামো হাদীসের মাধ্যমে আমরা পাই। রাসূল (স) ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপকার ও মডেল। রাজনীতি হচ্ছে রাজার নীতি, রাজ্য শাসন নীতি, নীতির রাজা ও উত্তম নীতি। মহানবীর (স) রাজনীতি তাই ছিল সর্বোত্তম নীতি। শাসক, প্রজা, কর্মচারী, কর্মকর্তা, শাসনকর্তা, প্রত্যেকের কি কি দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার তা হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। রাসূল (স) ও খুলাফায়ে রাশিদীন হাতে-কলমে বাস্তবে ও তা রূপায়িত করে দেখিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক জীবনে

মানব সমাজের বৃহত্তম অঙ্গন হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। মানুষ এ নিখিল বিশ্ব পরিবারের একজন সদস্য। তাই পৃথিবীতে মানুষের কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, দেশ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির লোক। তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে তার বিবরণ আমরা রাসূলের (স) হাদীসে পাই। অন্য জাতির সাথে সন্ধি, সম্পর্ক, যুদ্ধ, চুক্তি, কুটনীতি সবকিছুর রূপরেখা হাদীসে পেয়ে থাকি।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে

মানুষ কেবল দেহ সর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্যাসমূহের নির্ভুল ও সঠিক সমাধান আমরা হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। কিভাবে আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করতে হবে তার নির্ভেজাল উদাহরণ ও বাস্তবতা হাদীসের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে কারও মনগড়া ব্যাখ্যা বা পদ্ধতি-নিয়মের কাছে মুখাপেক্ষী করা হয়নি।

সারকথা

হাদীস ইসলামী জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। মানব জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তার সব কিছুর মূলনীতি আল-কুরআনে আছে। আর হাদীসে তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। মানুষের ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-নীতি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সব কিছুর দিকনির্দেশনা, আইন-কানুন হাদীসের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। তাছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে এবং জীবন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপনের হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাদীসের শিক্ষা ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে কল্যাণময় জীবন ও সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. রাসূল (স)-এর অনুসরণ করা কী ?

ক. অপরিহার্য খ. মুস্তাহাব
গ. সুন্নাত ঘ. মোবাহ

২. হাদীস ইসলামী শরী'আতের-

ক. প্রধান উৎস খ. দ্বিতীয় উৎস
গ. তৃতীয় উৎস ঘ. উৎস নয়

৩. ইসলামী শরী'আতের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস কয়টি ?

ক. ৫ টি খ. ৪ টি
গ. ২ টি ঘ. ৬ টি

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. খ, ৩. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মানব জীবনে হাদীসের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে হাদীসের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৪. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হাদীসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৫. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. জীবন সমস্যার সমাধানে আল-হাদীসের গুরুত্ব কতটুকু ? বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- হাদীস সংকলনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন
- হাদীস সংকলনের প্রথম যুগ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ বর্ণনা করতে পারবেন
- হাদীস সংকলনের তৃতীয় যুগ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন
- হাদীস সংকলনের চতুর্থ যুগের ধারণা দিতে পারবেন।

হাদীস শাস্ত্র বা হাদীস সাহিত্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহৎ ভান্ডার। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা ও অবকাঠামো এ হাদীস শাস্ত্রের ওপরই নির্ভরশীল। মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শই হাদীস। হাদীস ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর স্থান। তবে কুরআন যেভাবে নাযিলের সময় নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়, হাদীস ঠিক তেমনিভাবে রাসূলের আমলে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও উম্মতের নিয়মিত আমল, রাসূলের লিখিত ফরমান এবং সাহাবীদের স্মৃতিভান্ডার থেকে পরবর্তী সময়ে তা নিয়মিতভাবে এবং অতীব সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়।

তবে রাসূলের যুগে এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও তা গ্রন্থাকরে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে হিজরী প্রথম শতকের শেষ দিকে সরকারী দিক-নির্দেশনায় এবং হাদীসবেত্তাদের সাধনায় ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন, গ্রন্থাবদ্ধকরণ, শ্রেণীকরণ, যাচাই-বাছাই করণের কাজ সম্পাতি হয়। যার ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরা হল।

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জীবন দর্শনে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগ সংরক্ষণ ও সংগ্রহের ধারা চালু হয়। হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কয়েকটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

হিদায়াতের উৎস

হাদীস জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিদায়াতের উৎস। মুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ও হিদায়াতের অমর বাণী হিসেবে হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন।

মহানবী (স)-এর ইনতিকাল

মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমগ্র হাদীস পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা তখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সরাসরি তিনিই সমাধান দিতেন। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর নব উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলামের প্রসারতা লাভ

ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম হয়ে উঠে দিগন্তবিস্তারকারী। মরু আরবের চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি তাঁর সাম্য ও শান্তি জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটান দেশ হতে দেশান্তরে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী শাসন। আর এ ব্যাপক বিস্তৃতিই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত, বৈষয়িক ও শাসনতান্ত্রিক জটিলতা। উদ্ভূত এ অবস্থার নিরসন কল্পে বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে।

জ্ঞান লাভ

মহানবীর (স) পর ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ও বসতি স্থাপন করেন। ফলে এক এলাকায় বসাবাসরত রাবীর স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীস সম্পর্কে অন্য এলাকার রাবীর অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই সকল হাদীস সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের সব জায়গায় লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের জন্য হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন

ইসলামী হুকুমত সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের পরই হাদীসের নির্দেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য

মহানবী (স)-এর অবর্তমানে কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় সমস্যা দেখা দেয়। তা ছাড়া সাহাবীদের শাহাদতবরণ ও ইনতিকালে হাদীস অবলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

ভন্ড দলের আবির্ভাব

ইসলামের মধ্যযুগ তথা খিলাফতে রাশেদার শেষের দিকে বিশেষ কিছু স্বার্থান্বেষী ও ভ্রান্ত ধর্মীয় ফেরকার আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে খারেজী, রাফেজী, জাবরিয়া, কাদারিয়া ও মুতাযিলা সম্প্রদায় খুবই সক্রিয় ছিল। এসব ফেরকার লোকেরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা বা নিজেদের স্বার্থে হাদীস রচনা করতো। এদের থেকে হিফাজতের জন্য হাদীস সংকলন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দেয়।

জাল হাদীস প্রতিরোধ

রাজনৈতিক ও দলীয় প্রয়োজনে ষড়যন্ত্রমূলক কিছু জাল হাদীস রচনা করে কেউ কেউ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালাত। এদের থেকে সহীহ হাদীসকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে এবং জাল হাদীস প্রতিরোধের জন্য হাদীস সংরক্ষণ করা জরুরী পয়ে পড়ে।

স্মরণ শক্তি হ্রাস

বয়োবৃদ্ধে এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় হাদীসবিদ সাহাবী ও তাবিঈগণের স্মরণ শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। বস্তুত এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁরা সঠিক ও শুদ্ধ হাদীস সংরক্ষণের জন্য হাদীসকে লিখে রাখার প্রতি যত্নবান হন।

অনাগত উম্মাহর কাছে পৌঁছানো

বিদায় হাজ্জে মহানবী (স) বলেছিলেন, "একটি বাক্য হলেও তোমরা তা পৌঁছে দাও। তোমরা উপস্থিত যারা তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও।" এসব হাদীসের প্রেক্ষাপটে হাদীসবেত্তাগণ হাদীস সংকলন করে অনাগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় খ্যাতনামা রাবী ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে অবিশ্রান্ত সাধনা ও প্রয়াস চালান এবং চিরদিনের জন্য হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

হাদীস সংরক্ষণের পদ্ধতি

মুসলিম উম্মাহ হাদীস সংরক্ষণের জন্য প্রধানত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন-

১. হাদীস মুখস্থকরণ,
২. হাদীসের লিখন,
৩. হাদীসের শিক্ষাদান,
৪. হাদীসের আমল ও জীবনে বাস্তবায়ন।

মহানবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে হাদীস সংকলিত না হওয়ার কারণ

ইসলামী জীবন বিধানের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে পবিত্র কুরআনে হাকীমের পরবর্তী স্থান আল-হাদীসের যা মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সংকলের প্রয়োজন পড়েনি। পরবর্তী সময়ে নির্ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ও সাহাবায়ে কেরামের সময় হাদীস শাস্ত্র সংকলিত না হবার যেসব যৌক্তিক কারণ রয়েছে তা হল-

মহানবী (স)-এর নিষেধাজ্ঞা
মহানবী (স) নিজেই ঘোষণা করেছিলেন-

لا تكتبوا عنى فمن كتب عنى غير القران فليمحه

"তোমরা আমার থেকে কিছু লিখে রেখো না, আর যদি কেউ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রেখে থাক, তাহলে তার উচিত তা মুছে ফেলা।"

সাহাবীগণের প্রখর স্মৃতিশক্তি
সাহাবীগণের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তাঁরা শ্রবণ করেই তা অনেক দিন যাবত সরাসরি মুখস্থ রাখতে পারতেন। তাই হাদীস সংকলন প্রয়োজন পড়েনি।

কুরআন ও হাদীস একত্রিত হবার আশংকা
মহানবী (সা)-এর উপর কুরআন মাজীদ নাযিল হতো। আর পবিত্র কুরআন তখন লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল। তাই হাদীস লিখে রাখলে কুরআনের সাথে মিলে যেতে পারে -এ ভয়ে হাদীস গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করা তখন নিষেধ ছিল।

উপকরণের অপ্রতুলতা
মহানবীর (স) আমলে লেখার প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল খুবই কম। এছাড়াও লেখার পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। পাথরে খোদাই করে লিখন পদ্ধতি কিংবা হাড়-বাকল, পাতায় লিখার চেয়ে, তাদের কাছে মুখস্থকরণ পদ্ধতি সহজ হওয়ায় সাহাবাগণ হাদীস সংরক্ষণ করার পরিবর্তে মুখস্থ করে রাখতেন।

লেখকের সংখ্যাল্পতা
লেখার উপকরণের অপ্রতুলতার মতই তখনকার সময়ে লেখকেরও অভাব ছিল। তাই যেসব লেখক ছিলেন তাঁরা কুরআন লিখনের কাজে ব্যস্ত থাকায় হাদীস সংকলন করেননি।

বাতিল সম্প্রদায়ের অধিকার
সাহাবায়ে কিরামের যামানার শেষের দিকে খারেজী, রাফেজী, মু'তাযিলা ও বিদ'আতী প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব হলে তারা অনেকেই মহানবীর (স) হাদীসে পরিবর্তন এনে হাদীস বর্ণনা শুরু করেন। এহেন যুগসন্ধিক্ষণে হাদীসের সত্যাসত্য নির্বাচন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এ সময়ও বেশ কিছু সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের থেকেই সঠিক হাদীস সংরক্ষণ কর্ম শুরু হয়।

সর্বপ্রথম হাদীসশাস্ত্র সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়নের মহৎ কাজে কে এগিয়ে এসেছেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) প্রথম হাদীস সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে কাজ শুরু করেন। এ সময় অনেক সাহাবীই হাদীস সংরক্ষণে আপন শক্তি ব্যয় করেন। এভাবে হিজরী প্রথম শতকের শেষের দিকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর খিলাফতকালে মদীনার কাযী ইবনে হাজমকে হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়নের নির্দেশ প্রদান করেন।

এ সময় থেকে প্রধানত হাদীস লিখন শুরু হয়। এদিক থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন প্রথম হাদীসের সংগ্রাহক আর ইবনে শিহাব যুহরী ছিলেন হাদীস সংরক্ষণের প্রথম রূপকার।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইন্তেকালের পর হাদীস সংরক্ষণের কাজ আরো বেগবান হয়। গ্রন্থবদ্ধ হয় মহানবীর হাদীসের অমর বাণী, যা আমাদের জীবন বিধানকে ইসলামী মূল্যবোধের স্বর্গীয় ছাঁচে গড়ে তুলতে অতুলনীয় মাধ্যম।

হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত
প্রথম যুগ ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (মোট ১১২ বছর)।

মহানবী (স) -এর জীবদ্দশায়

মহানবী (স) তাঁর মক্কী জীবনে কুরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকায় সাময়িকভাবে হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। এ কারণে তাঁর সময়ে কুরআন যেভাবে লিখিত হত হাদীস সেভাবে লেখা হতো না। তবে মাদানী জীবনে এসে তিনি তাঁর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেন। এ সময় অনেক বড় বড় সাহাবী, বিশেষত যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা হাদীস লিখে রাখতেন। তাঁর সময়ের কয়েকটি হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে-

(ক) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সাহীফাহ্ সাদিকাহ। এটা ছিল সহস্র হাদীসের এক অনবদ্য সংকলন।
(খ) আবু শাহ ইয়ামানীকে রাসূল (স)-এর আদেশে হাদীস লিখে দেওয়া হয়।
(গ) হযরত আলী (রা)-এর নিকট হাদীসের সংকলন ছিল। এর মধ্যে ছিল যাকাত, দন্ডবিধি, হারামে মদীনা এবং বিভিন্ন ফরমান, বিভিন্ন রাজা বাদশাহের কাছে প্রেরিত চিঠিপত্র ও দাওয়াতনামা।

এছাড়া এ সময়ে হাদীস শাস্ত্রের চর্চা হতো নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে-
(ক) স্মৃতিভান্ডারে সংরক্ষণ তথা কণ্ঠস্থ করে একে অপরের কাছে পৌছান।
(খ) হাদীসের শিক্ষাদান ও পঠন-পাঠন।
(গ) দৈনন্দিন জীবনে হাদীসের আমল ও বাস্তবায়ন।
(ঘ) বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত হাদীসের ব্যক্তিগত সংকলন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (স) যুগেই হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়নের ক্রমবিকাশের ধারা শুরু হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে

রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবর্তানে খোলাফায়ে রাশেদীন মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব দেন। তাঁদের আমলে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। এ সময়ে হাদীস সংরক্ষণ ও সম্পাদনার কাজ রাষ্ট্রীয়ভাবে না হলেও সাহাবায়ে কিরাম স্ব স্ব উদ্যোগে হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা, শিক্ষাদান, বাস্তবসম্মত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বাস্তবায়নের ধারায় হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ও উৎসর্ক সাধিত হয়।

(ক) প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) পাঁচশত হাদীসের এক সংকলন করেন। কিন্তু তিনি তা কুরআনের সমতুল্যতা কিংবা ভুল-ভ্রান্তির আশংকায় বিনষ্ট করে ফেলেন।

(খ) দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) নিজে বহু হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করেন। তা ছাড়া হাদীস ব্যাপক বিকাশের লক্ষে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও বিভিন্ন দেশে সাহাবীদের প্রেরণ করেন।

(গ) তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) ছিলেন খুবই সতর্ক ব্যক্তি। তিনি নিজে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ গ্রন্থায়ন কর্ম নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া হাদীসে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় সে আশংকায় বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন না বা লিখে রাখতেন না। তবে তাঁর সময়ে অন্যান্য হাদীস বিশারদ সাহাবীগণ হাদীস চর্চায় ব্যাপকভাবে ব্যাপৃত ছিলেন।

(ঘ) চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) স্বয়ং রাসূলের কাছ থেকে হাদীস লিখে রাখতেন। তাঁর হাদীস সংকলনের নাম ছিল 'সহীফা'। এতে বিভিন্ন আহকাম ও রাষ্ট্রীয় ফরমান সন্নিবেশিত ছিল।

সাহাবায়ে কিরামের যুগে হাদীস চর্চার বিকাশ

খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে হাদীস শাস্ত্র নিয়মিতভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু না হলেও আসলে যেসব সাহাবায়ে কিরামের কাছে হাদীস লিখিত আকারে ছিল না, তাঁরা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণ তাঁদের জানা হাদীসগুলো লিখে ফেলেন এবং সেগুলোর পঠন-পাঠনের সিলসিলা চলতে থাকে। এ সময় হাদীস চর্চা চলছিল এভাবে-

(ক) ব্যাপক মুখস্থকরণ

(খ) হাদীসের ব্যাপক পঠন-পাঠন ও শিক্ষাদান

(গ) হাদীসের উপর বাস্তব আমল এবং

(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ

দ্বিতীয় যুগ ঃ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ঃ হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন

এ যুগ তাবিঈ ও তাবে তাবিঈনের যুগ। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে হাদীস সংকলনের প্রচেষ্টা একটা নতুন মোড় নেয়। তাবিঈগণের একটা বিরাট দল হাদীস শাস্ত্রের সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা সাহাবী ও বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণের লিখিত হাদীসসমূহকে একত্র করতে থাকেন ব্যাপকভাবে। হাদীস সংকলনের এ ধারা চলে প্রায় হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত। এ সময়ে হাদীসের ব্যাপক চর্চার ধারাটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

উমাইয়া খলীফা খোলাফায়ে রাশেদার পঞ্চম খলীফা নামে খ্যাত হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) হাদীস শাস্ত্র গ্রন্থায়নের লক্ষে সরকারী ফরমান জারি করেন। এ রাষ্ট্রীয় নির্দেশের ফলে হাদীস শাস্ত্রের সংগ্রহ ও গ্রন্থায়নের প্রবাহ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল। তারপর তা কয়েক শতাব্দীকাল অব্যাহত থাকে। ফলে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সে-গুলোকে কপি করে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে দেন।

এ যুগে হাদীস শাস্ত্রের প্রায় অর্ধশত গ্রন্থ সংকলন করা হয়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদীসের সংকলন হচ্ছে-

১. মুআত্তা ইমাম মালিক
২. জামে সুফিয়ান আস সাওরী
৩. জামে ইবনে মুবারক
৪. জামে ইমাম আওজায়ী
৫. জামে ইবনে জুরাইয
৬. কাযী আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ
৭. ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার
৮. ইমাম শাফিয়ীর কিতাবুল উম্ম ও মুসনাদ
৯. ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ
১০. আবদুর রাজ্জাকের জামে
১১. লাইস-এর মুসান্নাফ
১২. ইমাম আহমদের মুসনাদ।

তৃতীয় যুগ ঃ হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ঃ ক্রমবিকাশের স্বর্ণ যুগ

এটা হচ্ছে হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের, চরম উন্নতি ও পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগে এমন সকল হাফিযে হাদীসের জন্ম হয়, যাঁদের সমতুল্য দুনিয়া খুব কমই দেখেছে। এ যুগে হাদীস শাস্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক একটি শাখা এবং বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়।

এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীসের অনুসন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে হাদীসের খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়িয়েছেন। এক একটি শহর, এক একটি গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে বিক্ষিপ্ত সকল হাদীসকে একত্র করেন। এ যুগেই সিহাহ সিত্তাহ'র বিশ্ববিখ্যাত ছয়খানা হাদীস শাস্ত্রের মহাগ্রন্থ সংকলিত হয়।

এ যুগের হাদীস শাস্ত্রের আরও বিশেষ কাজগুলো হচ্ছে

যাচাই-বাছাই করণ

ইত:পূর্বে হাদীসবিদগণ হাদীস যাচাই-বাছাই না করে সহীহ ও দুর্বল সব হাদীসই প্রকাশ করেছিলেন। এ যুগে হাদীসমূহকে যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ছাটাই-বাছাই এবং সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করে তার আলোকে সমস্ত হাদীস শাস্ত্রকে পৃথক করা হয়। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বিশ্বনন্দিত হাদীস বিজ্ঞানী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আন-নিশাপুরী। এছাড়া শত শত হাদীসবিজ্ঞানীও তাঁদের সমগ্র জীবন এ কাজে ব্যয় করেন।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

সহীহ হাদীস বাছাই ও হাদীস যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এ যুগে হাদীস বিজ্ঞানীগণ হাদীস শাস্ত্র সংক্রান্ত একশটিরও বেশি ইলম বা বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেন। যেমন ইলমে জারাহ্ ও তাদীল, ইলমে আসমাউর রিজাল এবং তানকীদ ফীল-হাদীস ইত্যাদি।

বিষয়ভিত্তিক হাদীসের সজ্জায়ন
এ যুগে মুহাদ্দিসগণ ফিকহ শাস্ত্রের অধ্যায় অনুযায়ী হাদীস শাস্ত্রকে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে একত্রিত করেন।

জামে (বিশ্বকোষ) পদ্ধতি সংকলন
এ যুগেই হাদীস সাহিত্যকে জামে পদ্ধতিতে, অর্থাৎ সিয়ার, আদাব, তাফসীর, ফিতান, আকাইদ, আহকাম, আশরাত, মানাকিব সম্পর্কিত হাদীসমূহকে পৃথক পৃথক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়।

সহীহ ও সুনান পদ্ধতিতে সংকলন
এ যুগেই অত্যন্ত সতর্কতা ও কঠোর মানদন্ডে নিরূপন করে অগণিত হাদীস ভান্ডার থেকে সহীহ ও সুনান পদ্ধতিতে হাদীসের সংকলন করা হয়। সুনান ও সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহ যথা, সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ শরীফ।

চতুর্থ যুগ ঃ হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও তার পরবর্তী যুগ
এ অধ্যায়টি ছিল হাদীস শাস্ত্রের অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। অবশ্য তৃতীয় শতাব্দীতেই হাদীস শাস্ত্রের পরিপূর্ণ রূপরেখা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কাজেই চতুর্থ শতাব্দীতে সেই কাজের জের চলতে থাকে। হাদীস শাস্ত্রের কিছু স্বতন্ত্র গ্রন্থও এ শতকে প্রণীত ও সম্পাদিত হয়।

এভাবেই হাদীস সাহিত্যের অফুরন্ত বিশাল ভান্ডার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুলায়তন সম্পদ রাশি সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। পরবর্তী যুগসমূহে বিশেষত আজ পর্যন্ত এবং অনাগত যুগ পর্যন্ত সেই বিপুলায়তন হাদীসের ভান্ডার থেকেই বিশ্ব মানবতা তাদের জীবন পথের দিশা গ্রহণ করে থাকবে।

সারকথা
নবুয়াতের প্রথম দিকে একমাত্র কুরআনুল কারীম ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রাখার অনুমতি ছিলনা। শেষের দিকে অনুমতি দেওয়া হলে কাগজে কলমে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হলেও প্রচলিত নিয়মে পুরোপুরি হাদীস সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়নি। এর পেছনে কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ-

১. কুরআন লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ ব্যস্ততা।
২. কুরআন ও হাদীসের মাঝে সংমিশ্রণের ভয়।
৩. প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস লিখনে মহানবীর (স) নিষেধাজ্ঞা।
৪. তদানীন্তন আরবগণের স্মরণশক্তির প্রখরতা ও তীক্ষ্মতা।
৫. যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় সময়ের স্বল্পতা।

তবে হাদীস সংরক্ষণে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (স) প্রিয় সাহাবীগণকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁরাও আল্লাহ প্রদত্ত স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে মুখস্থ করতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় অনুমতি থাকায় কোন কোন সাহাবী বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তবে সাহাবীগণের পারস্পরিক আলোচনা-পর্যালোচনা ও অনুশীলনের কারণে হাদীস অলিখিতভাবেই পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়।

তাই এ কথা প্রমাণিত যে, মহানবীর (স) যুগেই বিক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ থাকার পাশাপাশি অনুশীলনের মাধ্যমে হাদীস পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল।

মহানবী (স)-এর ওফাত পরবর্তী সময় হাদীসের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনে দুর্বলতা ও শৈথিল্য দেখা দেয়। এছাড়াও কতিপয় কারণে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

১. দীনের তাবলীগ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে সাহাবীগণের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত।
২. সাহাবীগণের ইন্তিকাল ও শাতাদাতবরণ।
৩. বর্ণনাকারীগণের স্মৃতি শক্তির প্রখরতা হ্রাস।
৪. মুসলমানগণের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে হাদীসের ব্যবহার।
৫. বিভিন্ন ফিরকা ও মতবাদের স্বপক্ষে হাদীসের ব্যবহার ও জাল (মাওযু) করণ।

উল্লিখিত কারণে হাদীস বিশারদগণ বিশুদ্ধ হাদীস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সর্বপ্রথম যিনি এ কৃতিত্বের অধিকারী হন তিনি হলেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) (মৃ. ১০১)।

তিনি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে বলেন-

انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه

"রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীসের প্রতি অনতিবিলম্বে দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে রাখো।"

তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে হাযম (মৃ. ১১৭/১২ হিঃ) এবং ইবনে শিহাব আয-যুহরীকে (মৃ. ১২৪হি.) বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়নের এই মহতি উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ইবনে শিহাব আয-যুহরী। আর এভাবেই হাদীস সংরক্ষণের এক নব অধ্যায় সূচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. হাদীস সংরক্ষণে ক'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল ?

ক. ৪ টি খ. ৬ টি

গ. ৩ টি ঘ. ২ টি

২. হাদীস সংরক্ষণের কাজ কখন থেকে শুরু হয় ?

ক. মহানবী (স)-এর যুগে খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে

গ. হযরত উমর (রা)-এর যুগে ঘ. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র)-এর যুগে

৩. ইমাম মালিক (র)-এর সংকলিত হাদীসের কিতাবের নাম-

ক. আল-মুয়াত্তা খ. জামিউল কাবির

গ. আল-মাবসুত ঘ. আল-মুগনী

৪. হযরত আবু বকরের (রা) সংকলনে কতগুলো হাদীস ছিল ?

ক. ৫০০০ খ. ৫০০

গ. ১০০০ ঘ. ৫৫০

৫. হযরত আলী (রা) কর্তৃক সংরক্ষিত হাদীসের নোসখার নাম কি ?

ক. হাদীসে আলী (রা) খ. তাহাবী শরীফ

গ. সহীফা ঘ. মুয়াত্তা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. ঘ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

৩. হাদীস সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো লিখুন।

৪. মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় হাদীস সংরক্ষণের বিবরণ দিন।

৫. হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ বলতে কী বুঝায়? এ যুগের প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংকলনের নাম লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীস কী? হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

২. হাদীস সংক্ষণের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

৩. হাদীস সংকলনের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- প্রথম স্তরের হাদীস গ্রন্থ ও রচনাকারীদের বর্ণনা দিতে পারবেন
- দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থ ও এর প্রণেতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- তৃতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থ ও এর লেখকদের সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- চতুর্থ স্তরের হাদীস গ্রন্থ ও এর প্রণেতাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

হাদীস গ্রন্থসমূহের স্তর বিন্যাস

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের কাজ ব্যাপক আকার ধারণ করে। শুরু হয় বিভিন্ন ধরণ, আকৃতি ও প্রকৃতির গ্রন্থাবদ্ধকরণ। এভাবে হাদীস শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ সংকলিত হয়। তবে গ্রন্থ গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এক মানের ছিল না। এ জন্য হাদীস বিশারদগণ গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন স্তরে শ্রেণীকরণ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরে রয়েছে, বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালিক। এতে বর্ণিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির, আহাদ ও হাসান পর্যায়ের।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরে রয়েছে, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদ। এতে কিছু কিছু যঈফ হাদীসও রয়েছে।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরে রয়েছে, মুসনাদে ইবনে আবি শইবা, মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক, বায়হাকী ও তাবারাণীসহ বেশ কিছু এমন গ্রন্থ যে গ্রন্থসমূহে যঈফ হাদীসের সংখ্যাধিক্য রয়েছে এবং রাবীগণের অবস্থাও অস্পষ্ট।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরে রয়েছে, ঐ গ্রন্থসমূহ যে-গুলো পরবর্তী যুগে গল্পকার, ওয়ায়েয সূফী, অবিশ্বস্ত ঐতিহাসিক এবং বিদআতীদের থেকে সংকলিত হয়। হাদীস বর্ণনায় এগুলোর উপর নির্ভর করা যায় না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইবনে শাহীন, আবুশ শাইখসহ আরও কিছু গ্রন্থকার।

হাদীসগ্রন্থের নামকরণ

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন ধরণ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তারই ভিত্তিতে হাদীস গ্রন্থগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত ও প্রচলিত হয়। এখানে আমরা সেই পরিচিত ও প্রচলিত কিছু নামের আলোচনা করছি।

আস-সহীহ

যে হাদীস গ্রন্থে সহীহ ও সহীহভুক্ত (যেমন : আহাদ ও হাসান) হাদীসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যঈফ হাদীসকে বর্জন করা হয়েছে, তাকে সহীহ গ্রন্থ বলে যেমন : সহীহ আল-বুখারী (صحيح البخارى) ও সহীহ মুসলিম (صحيح مسلم)

মুসনাদ

যে হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণের নামানুসারে হাদীস সংকলিত হয়েছে, তাকে মুনসাদ গ্রন্থ বলে। যেমন মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিসী (মৃ. ২০৪ হি:) ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি:)।

জামে (হাদীসের বিশ্বকোষ)

যে হাদীস গ্রন্থে আটটি বিষয় সম্বলিত হাদীস সংকলিত হয়েছে তাকে জামে হাদীস গ্রন্থ বলে। বিষয়গুলো হলো- (ক) ইতিহাস, (খ) আদাব (আচার-আচরণ), (গ) তাফসীর, (ঘ) আকায়েদ, (ঙ) ফিতান, (চ) আশরাত, (ছ) আহকাম, (জ) মানাকিব।

সুনান

যে হাদীস গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবনের শরীআতের বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস স্থান পেয়েছে এবং ফিকাহের কিতাবের অনুরূপ অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সজ্জিত হয়েছ তাকে সুনান গ্রন্থ বলে। যেমন সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে নাসাঈ ইত্যাদি।

মুজাম

যে হাদীস গ্রন্থে শাইখ বা উস্তায, শহর ও গোত্রীয় নামের আদ্যক্ষরিক বর্ণমালাল ক্রমিকতা অবলম্বনে হাদীস সংকলিত হয় তাকে মুজাম গ্রন্থ বলে। যেমন তাবারানীর (মৃ. ৩৬০ হি) আল-মুজাম আল-কাবীর, আল-আওসাত ও আল-সগীর।

মুস্তাদরাক

কোন হাদীস সংকলকের অনুসৃত শর্তানুযায়ী হওয়া সত্ত্বেও তার নিজস্ব গ্রন্থে যে সব হাদীস শামিল করা হয়নি সেগুলো যে হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয় তাকে মুসতাদরাক বলে। যেমন : হাকেম কর্তৃক সংকলিত মুসতাদরাক।

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ

হাদীস শাস্ত্রের নাম জানা-অজানা অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মাঝে সহীহ হাদীসের সংকলন হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করেছে ছয়খানা কিতাব। এগুলো সিহাহ সিত্তাহ নামে পরিচিত। হাদীস বর্ণনায় এই ছয়টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

সিহাহ (صحاح) শব্দটি (صحيح) সহীহ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সহীহ। সিত্তা ستة মানে ছয়। সুতরাং 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয় হাদীস শাস্ত্রের সেই ছয়খানা নির্ভুল ও প্রামাণ্য সংকলনকে, যার বিশুদ্ধতা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস চর্চা, লিখন, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও সংকলনের সোনালী যুগ। এ শতাব্দীতে যে ছয়খানি নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য এবং সর্বজনস্বীকৃত হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকেই একত্রে 'সিহাহ সিত্তা' বা 'ষড়বিশুদ্ধ' গ্রন্থ বলা হয়।

সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপ

হাদীস গ্রন্থের নাম	সংকলকগণের নাম	জীবনকাল
১. সহীহুল বুখারী (صيح البخارى)	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল- বুখারী (ইমাম বুখারী)	জ. ১৯৪ হি. মৃ. ২৫৬ হি.
২. সহীহ লি মুসলিম (صحيح لمسلم)	মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (ইমাম মুসলিম)	জ. ২০২ হি. মৃ. ২৬১ হি.
৩. সুনান আবি দাউদ (سنن ابى داؤد)	সুলাইমান ইবনুল আশয়াস	জ. ২০২ হি. মৃ. ২৭৫ হি.
৪. জামিউত তিরমিযী (جامع الترمذى)	আবূ ঈসা মুহাম্মদ (ইমাম তিরমিযী)	জ. ২০৯ হি. ২৭৯ হি.
৫. সুনানুন নাসাঈ (سنن النسائ)	আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসাঈ	জ. ২১৫ হি. মৃ. ৩০৩ হি.
৬. সুনান ইবনে মাজাহ (سنن ابن ماجة)	মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ	জ. ২০৭ হি. মৃ. ২৭৫ হি.

উল্লেখ্য, 'সিহাহ সিত্তার 'ষষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি সে ব্যাপারে অবশ্য মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কারো কারো মতে, সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে মুয়াত্তা ইমাম মালিক। আবার কারো কারো মতে, সনানু আদ-দারিমী। তবে অধিকাংশের এবং নির্ভরযোগ্য মত, সিহাহ সিত্তা'র ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে সুনানে ইবনে মাজাহ।

সিহাহ সিত্তা'হর বাইরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ-

ক্রম.	গ্রন্থের নাম	সংকলকের নাম	রচনাকাল
১.	মুয়াত্তা	ইমাম মালিক (র)	
২.	সুনানে দারিমী	ইমাম দারিমী	
৩.	সহীহ ইবনে খুযাইমা	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক	৩১১ হি
৪.	সহীহ ইবনে হিব্বান	আবূ হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান	৩৫৪ হি
৫.	আল-মুস্তাদ্‌রাক	হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ আন-নিশাপুরী	৪২০ হি
৬.	আল-মুকতারাহ	জিয়াউদ্দিন মাক্‌সিদী	৭৪৩ হি
৭.	সহীহ আবূ আওয়ানা	ইমাম ইয়াকুব	৩৩১ হি

সারকথা

রাসূল (স)-এর সকল হাদীসই সহীহ। তবে, সনদ, বর্ণনাকারীদের সংখ্যা, তাদের গুণাগুণ ও বর্ণনার ধারাবিহকতা ইত্যাদির বিবেচনায় হাদীস বিজ্ঞানীগণ হাদীসকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এ শ্রেণী বিভাগের ফলে হাদীসের বিশুদ্ধতা, গ্রহণযোগ্যতা ও বির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। হাদীস বিজ্ঞানীগণ হাদীস সংকলনকে বিভিন্ন মূলনীতির আলোকে বিন্যস্ত করেছেন। আর ঐ মূলনীতি অনুসারে নাম রেখেছেন। হাদীসের অগণিত গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে সিহাহ সিত্তাহর ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সংকলন বিশুদ্ধতার বিচারে সর্বজনস্বীকৃত। এছাড়াও মুয়াত্তা, সুনানে দারেমী, ইবনে খুজায়মা প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রহণযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন
সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. হাদীস গ্রন্থসমূহকে ক'টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে ?
ক. ৫ টি খ. ৬ টি
গ. ৪ টি ঘ. ৩ টি

২. হাদীস গ্রন্থসমূহের দ্বিতীয় স্তরের একটি গ্রন্থ হল-
ক. বুখারী খ. মুয়াত্তা মালিক
গ. আবু দাউদ ঘ. বায়হাকী

৩. ইমাম বুখারী কত হিজরী সালে ইনতিকাল করেন ?
ক. ১৯৪ হিজরী সালে খ. ২৫৬ হিজরী সালে
গ. ২০৪ হিজরী সালে ঘ. ২৭০ হিজরী সালে

৪. সহীহ ইবনে হিব্বান কত সালে রচিত হয় ?
ক. ৩১১ হিজরী সালে খ. ৪২০ হিজরী সালে
গ. ৩৫৪ হিজরী সালে ঘ. ৩৫০ হিজরী সালে

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. গ, ২. গ, ৩. খ, ৪. গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীস সংকলনের স্তর বিন্যাস করুন।
২. ৪র্থ স্তরের হাদীস গ্রন্থসমূহের বিবরণ দিন।
৩. কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ও তার লেখকের নাম উল্লেখ করুন।
৪. ৩ টি সুনান গ্রন্থ ও এর সংকলকের নাম লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীস গ্রন্থসমূহের স্তর বিন্যাস বিশদভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

সহীহাইনের সংকলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সহীহাইন কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- সহীহাইনের সংকলকদ্বয়ের পরিচয় বলতে পারবেন
- সহীহাইনের হাদীস সংখ্যা বলতে পারবেন।

সহীহাইন

পূর্বের পাঠে আমরা জানতে পেরেছি, হাদীস শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এবার আমরা জানব কোন কোন গ্রন্থকে সহীহাইন বলে? সহীহ বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে সহীহাইন বলা হয়। আমরা জানি, হাদীস শাস্ত্রে এ দু'টি গ্রন্থের মর্যাদা অপরিসীম। গ্রহণযোগ্যতার শিখরে রয়েছে এ দু'টো গ্রন্থের অবস্থান।

হাদীস শাস্ত্রে সহীহাইনের মর্যাদা

সহীহাইনের পরস্পরের মাঝে স্থান নির্ণয়ে মতভেদ থাকলেও হাদীস শাস্ত্রে রয়েছে তাদের নিরংকুশ গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা। তবে যে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই রেওয়াত করেছেন তার স্থান ও গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে সবার উর্ধ্বে। এরপর পর্যায়ক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একক হাদীসের স্থান।

ইমাম বুখারী

যে সকল মুসলিম মনীষীর অক্লান্ত সাধনা ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলামের প্রতিটি বাণী ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশ্ববাসীর নিকট নির্ভুলভাবে পৌঁছেছে, তাঁদের মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর খ্যাতনামা হাদীস বিজ্ঞানী ইমাম বুখারীর নাম চির উজ্জ্বল ধ্রুব জ্যোতির মত দেদীপ্যমান। তিনি ছিলেন হাদীসের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিজ-ই-হাদীস। বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী এ ইমাম অকাতরে তা বিলিয়ে দেন হাদীস চর্চার কাজে। তাঁর অভাবনীয় সাধনার ফলশ্রুতিতে 'সহীহ্ বুখারী'র মত বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সংকলিত হয়। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে অনেক ইমামই বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহের অভিযানে নেমে পড়েন। তাঁর হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও চর্চায় অসাধারণ অবদানের জন্য মুসলিম জাহান তাঁকে 'ইমামুল মুহাদ্দিসীন ও আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীস' উপাধিতে বিভূষিত করেন। তাঁর সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া যথার্থই বলেছেন:
"আকাশের নীচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চেয়ে বড় কোন মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেননি।"

পরিচিতি

ইমাম বুখারীর (র) পূর্ণনাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ঈসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা ইবনে বারদিযবা আল-বুখারী। তিনি উজবেকিস্তানের ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির লীলাভূমি বুখারা নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ ই শাওয়াল জুমার দিন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন এবং মায়ের স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠেন।

শিক্ষা জীবন

ইমাম বুখারী (র) স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপন করেন। তিনি ছয় বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেন। মক্তব জীবনেই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষা লাভের বাসনা ও চেতনা জাগ্রত হয়। আট বছর বয়সে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে।

হাদীস অধ্যয়নে ইমাম বুখারী

ইমাম বুখারী (র) ষোল বছর বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম ওয়াকির সংকলিত হাদীস গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নেন। মা ও ভাইয়ের সাথে হাজ্জ উপলক্ষে মক্কা ও মদীনায় গমন করেন। এর পূর্বে তিনি বুখারার সকল প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

হাজ্জ শেষে মা ও ভাই দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) তথায় অবস্থান করে মক্কা ও মদীনার প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য থেকে যান। এ সময় তিনি একাধারে হাদীস শিক্ষা ও লিখন কাজ করতে থাকেন।

হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (র) ব্যাপক পরিকল্পনা করেন এবং বহু দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেন। এক একটি শহরে উপস্থিত হয়ে সম্ভাব্য সকল হাদীস তিনি আয়ত্ত করেন। তারপর অন্য শহরের দিকে ছুটতেন। এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য এমন কোন শহর ছিল না, যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেন নি। বালখ, বাগদাদ, মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা, আসকালান, হিমস, দামেশক, প্রভৃতি শহরে তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য গমন করেন।

ইমাম বুখারী (র) এক হাজারের বেশি সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, "আমি এক হাজার আশিজন শায়খের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছি ও লিখেছি।" এই বিপুল সংখ্যক উস্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইবরাহীম আবূ আসিম, ইমাম আহমদ, আলী ইবনুল মাদিনী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, হুমাইদী, উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা, মুহাম্মদ ইবনে সালাম প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (র) থেকে সহীহ বুখারী গ্রন্থটি শ্রবণকারীদের সংখ্যা নব্বই হাজারের বেশী বলে উল্লেখ করা হয়। তাঁর বিপুল সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম আর-রাযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম দারিমী (র) প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (র) বিস্ময়কর স্মরণ শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলিন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি একবার মাত্র কিতাব দেখে বা শুনে তা হুবহু মুখস্থ বলতে পারতেন। দশ বছরের সময় উস্তাদ ইমাম দাখেলীর শিক্ষালয়ে ইমাম বুখারীর ছাত্রাবস্থার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার্থীরা খাতা-কলম নিয়ে হাদীস নোট করতেন। কিন্তু তিনি তা করতেন না। একবার তিরস্কার ছলে তাঁকে বলা হল, তুমি খালি হাতে কী জন্য এখানে আস? তিনি বললেন, তোমাদের মত আমার লেখার দরকার নেই। আমার সকল হাদীসই মুখস্থ আছে। এই বলে তিনি সমস্ত হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। আর তারা তাদের লিখিত ভুলত্রুটি তাঁর থেকে সংশোধন করে নিলেন।

ইমাম বুখারী (র) বিপুল প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্থ-কড়ি ও ধন-সম্পদ শিক্ষার্থী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয়িত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি অতিশয় ভদ্র ও পূত: পবিত্র স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র) যথার্থই বলেছেন-

"ইমাম বুখারী এ উম্মতের ভূষণ, তাঁর মত লোক আমি কোথাও দেখিনি।"

আত্মসম্মানবোধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও চেতনা দৃপ্ত। ক্ষমতাসীনদের থেকে সব সময় দূরে অবস্থান করতেন। এজন্য তিনি জীবনে বহু বিপদ-আপদ ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

হাদীসে তাঁর অবদান

ইমাম বুখারীর অমরকীর্তি তাঁর 'সহীহুল বুখারী' গ্রন্থ। ছয় লক্ষ হাদীস তিনি মুখস্থ জানতেন। তন্মধ্যে তিন লক্ষ সনদসহ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এ বিপুলায়তন হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে অত্যন্ত কঠোর নীতিমালার ভিত্তিতে তাঁর 'জামিউস সহীহ' সংকলন করেন। প্রতিটি হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি অযূ ও গোসল করতেন। এরপর দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করতেন। তারপর ইস্তিখারা করে হাদীস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তা' লিখতেন। এভাবে তাঁর গ্রন্থখানিতে ৭২৭৫টি হাদীস সংকলন করেন। তাঁর এই অসামান্য অবদান মুসলিম জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাছাড়াও তাঁর অমূল্য অবদানের মধ্যে রয়েছে হাদীস শাস্ত্রে বহু মূল্যবান রচনা-

১. আত্ তারিখুল কাবীর
২. আত্-তারিখুস সগীর
৩. আত্ তারিখুল আওসাত
৪. আদাবুল মুফরাদ
৫. খালকু আফআল আল-ইবাদ
৬. কিতাবুল যু'আফা
৭. জামিউল কাবীর
৮. মুসনাদুল কাবীর
৯. কিতাবুল আশরিবা
১০. কিতাবুল হিবা
১১. কিতাবুস সাহাবা
১২. কিতাবুল ইলাল
১৩. কিতাবুল মাবসুত ইত্যাদি

তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে মণীষীগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেকে ইমাম বুখারীকে দুনিয়াতে আল্লাহর নিদর্শন বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লাহর কিতাবের পরই বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে বুখারী শরীফের স্থান।
ওফাত : এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ২৫৬ হিজরী সনের ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

সহীহ আল-বুখারী পরিচিতি
ইমাম বুখারীর যুগ পর্যন্ত অনেক হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। তবে সেগুলো তাঁর দৃষ্টিতে যঈফমুক্ত ছিল না। তাঁর উস্তাদ রাহওয়াই একদা তাঁকে বললেন, "তুমি যদি রাসূলের সহীহ হাদীসগুলো একত্র করতে" -এ কথাটি তাঁর মনে রেখাপাত করে। তাই তিনি একখানি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের ইচ্ছা পোষণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি একদা মহানবী (স) কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাঁকে পাখা করছেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় স্বপ্ন বিশ্লেষকগণ বলেন, আপনি মহানবী (স)-এর হাদীস হতে মিথ্যাকে অপসারিত করবেন।
এতে অনুপ্রাণিত হয়ে ইমাম বুখারী ২১৭ হিজরী সালে সহীহ হাদীস সংকলনে মনোনিবেশ করেন। আর দীর্ঘ ষোল বছর কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস হতে যাচাই-বাছাইয়ের পর হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। এভাবে তিনি ২৩৩ হিজরী সালে এ কাজ সমাপ্ত করেন।

সহীহুল বুখারী নামটি গ্রন্থটির মূল নাম নয়। এর আসল নামের ব্যাপার দু'টি মত পাওয়া যায়।

এক.
الجامع الصحيح المسند من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه
দুই.
الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

প্রায় নব্বই হাজার লোক সরাসরি ইমাম বুখারীর নিকট হতে সহীহ আল-বুখারী গ্রন্থখানি শ্রবণ করেছেন, যা গ্রন্থখানির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। এছাড়া মুসলিম মিল্লাতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, কুরআন মাজীদের পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হল সহীহ আল-বুখারী। মুসলিম মিল্লাতের এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, সিহাহ সিত্তাসহ সংকলিত সকল হাদীসগ্রন্থের উর্ধ্বে সহীহ আল-বুখারীর স্থান।

সহীহ আল-বুখারীর হাদীস সংখ্যা

পুণরুল্লেখসহ - ৭২৭৫ এবং পুনরুল্লেখ ছাড়া ৪০০০ হাদীস। (ثلاثيات) বা তিন মাধ্যম বিশিষ্ট সংখ্যা - ২২। বুখারী শরীফের (كتاب) বা অধ্যায় সংখ্যা ১৬০ এবং (باب) বা অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪৫০। ইমাম বুখারী যে সকল শায়খ থেকে তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা ২৭৯।

ইমাম মুসলিম ও তাঁর সহীহ গ্রন্থ
নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হাসান, উপাধি 'আসাকিরুদ্দীন। পিতা হাজ্জাজ আল-কুশাইরী। মুসলিম জাহানে তিনি ইমাম মুসলিম নামে পরিচিত। বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত খোরাসানের প্রধান নগর নিশাপুরে বনী হাওয়াযীন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণনাম হলো- আবুল হাসান আসাকিরুদ্দীন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল- কুশরাইরী আল-নিশাপুরী।

ইমাম মুসলিম ২০২ হিজরী মুতাবিক ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এমন দিনে জন্মগ্রহণ করেন, যেদিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম শাফি'ঈ (র) ইন্তিকাল করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি তিনি স্বগৃহেই লাভ করেন। তাঁর পিতা হাজ্জাজ আল-কুশাইরী একজন নামকরা হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি তাঁর নিকটই হাদীস সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। অতপর ১৮ বছর বয়সে তিনি পূর্ণমাত্রায় হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর অধ্যয়ন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ ও হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করেন। আর হাদীসের বিশিষ্ট ওস্তাদ ও মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ইরাক, হিজায, মিসর, সিরিয়া, বাগদাদ প্রধান।

তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনে অগণিত শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজন হলেন- ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, সাঈদ ইবনে মানসুর আল-যুহলী এবং ইমাম বুখারী প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসবৃন্দ।

ইমাম বুখারী (র) যখন শেষ জীবনে নিশাপুর গমন করেন। তিনি তখন তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেন। তিনি বুখারীর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করার চেষ্ঠা করেন। একদিনের ঘটনা এর প্রমাণ বহন করে।

তিনি তার হাদীসের ওস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলীর মজলিসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় মুহাদ্দিস যুহলী বললেন- "বিশেষ একটি মাস'আলায় যে লোক ইমাম বুখারীর মতামত বিশ্বাস করে ও তাঁর রায় গ্রহণ করে সে যেন আমার মজলিস হতে উঠে যায়।"একথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এই ওস্তাদর নিকট হতে শ্রুত ও লিখিত হাদীসমূহের সকল কপি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং যুহলীর বর্ণনাসূত্রে হাদীস বর্ণনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীসবেত্তাগণ সকলে একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর ছাত্রদের তালিকায় যাঁদের নাম প্রসিদ্ধ তাঁদের কয়েকজন হলেন-

আবূ হাতীম আর-রাযী, মূসা ইবনে হারুন, আহমাদ ইবনে মাজমা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু আওয়ানা, ইবনে খুজাইমাহ এবং ইমাম তিরমিযী (র) প্রমুখ।

এঁরা সকরেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পান্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বজনস্বীকৃত। তাছাড়া তার রচিত গ্রন্থাবলী তাঁর পান্ডিত্যের অকাট্য প্রমাণ।

তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভের পর আজীবন হাদীস সংকলনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মনীষী ২৪ রজব ২৬১ হিজরী সালে সামান্য অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন। তিনি নিশাপুরে সমাধিস্থ হন।

তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিশিষ্ট হাফিয ছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে বাশার বুনদার এর উক্তি হলো- "হাফিজে হাদীস ছিলেন চারজন- বুখারী, মুসলিম, দারিমী এবং আবু যুরয়া।" তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত। জীবনে কারো গীবত করেননি এবং কাউকে গালি দেননি।

হাদীস শাস্ত্রে প্রবল পান্ডিত্যের সাথে সাথে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস ও হাদীস বিষয়ক। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো 'সহীহ লি মুসলিম'। এটা ছাড়া তাঁর আরো বহু গ্রন্থ রয়েছে। তিনি সরাসরি উস্তাদদের নিকট থেকে ছাটাই, যাচাই ও চয়ন করে এ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

হাদীস গ্রন্থনার কাজ সমাপ্ত হলে তিনি তদানীন্তন প্রখ্যাত হাফিযে হাদীস ইমাম আবূ যুরয়ার সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং তিনি বলেন-

"আমি এ গ্রন্থখানি ইমাম আবূ যুরয়ার নিকট পেশ করেছি। তিনি যে সব হাদীসের সনদে দোষ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি। আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, এটা সহীহ এবং ত্রুটিমুক্ত আমি তা-ই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।"

এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবল স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি বলেই কোন হাদীস সহীহ মনে করে তার গ্রন্থে চয়ন করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকট পরামর্শ চেয়েছেন। আবূ যুরয়ার নিকট তিনি পরীক্ষার জন্য হাদীস উপস্থাপন করেছিলেন। সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন, তিনি কেবল তা-ই সংকলন করেছেন।

এভাবে দীর্ঘ ১৫ বছর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরী করেন।

এ গ্রন্থে সর্বমোট ১২ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক দ্বিরুক্ত হাদীসও রয়েছে। সেগুলো বাদ দিয়ে মোট হাদীসের সংখ্যা চার হাজার। তা হলে বলা যায়- পুনরুল্লেখসহ হাদীস সংখ্যা ১২০০০ এবং পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদীস সংখ্যা ৪০০০।

তিনি উস্তাদ এবং ছাত্রের মধ্যে সমসাময়িক যুগের হওয়াকেও হাদীস গ্রহণের জন্য শর্তারোপ করেন। তার গ্রন্থে ছুলাসিয়াত হাদীস নেই; কিন্তু রুবায়িআত ৮১টিরও বেশি হাদীস রয়েছে।

জামে' হওয়ার জন্য যে আটটি শর্তের প্রয়োজন তার মধ্যে তাফসীর ব্যতীত প্রত্যেকটি বিষয়ই এতে বিদ্যমান। তাই একে জামে' না বলে সহীহ বলা হয়। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থখানি তাঁর নিকট হতে বহু ছাত্রই শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে তা বর্ণনাও করেছেন।

সারকথা

হিজরি তৃতীয় শতাব্দী হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময় ছিল হাদীস সংকলনের চূড়ান্ত পর্যায়। এ সময় বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছিল। এর মধ্যে আবার সহীহ বুখারী ও মুসলিম বিশুদ্ধতার বিচারে সর্বশীর্ষে। ইমাম বুখারী ছিলেন একজন দুর্লভ মেধার অধিকারী শ্রেষ্ঠ হাদীস বিজ্ঞানী। তাঁকে ইমামুল মুহাদ্দিসীন ও আমিরুল মু'মিনীন ফিল-হাদীস উপাধিতে ভূষিত করা হয়। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হল বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সংকলন সহীহ আল-বুখারী। পবিত্র কুরআনের পরেই এ গ্রন্থের অবস্থান। সিহাহ সিত্তার অপর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি হল 'সহীহ লি-মুসলিম'। এর সংকলক ইমাম মুসলিমও ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর মৌলিক অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সিহাহ সিত্তার এ দু'টি সংকলনকে একত্রে সহীহাইন বল হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহাইন হল-

ক. তিরমিযী ও মুসলিম খ. আবু দাউদ ও নাসায়ী
গ. বুখারী ও মুসলিম ঘ. বুখারী ও তিরমিযী

২. ইমামুল মুহাদ্দিসীন হলেন-

ক. ইমাম তিরমিযী (র) খ. ইমাম আবু হানীফা (র)
গ. ইমাম বুখারী (র) ঘ. ইমাম মালিক (র)

৩. ইমাম বুখারী (র)-এর মুখস্থ হাদীস সংখ্যা কত ?

ক. তিন লক্ষ খ. ছয় লক্ষ
গ. পাঁচ লক্ষ ঘ. সত্তর হাজার

৪. সহীহ মুসলিম গ্রন্থে সর্বমোট হাদীস সংখ্যা কত ?

ক. এক লক্ষ খ. বার হাজার
গ. চার হাজার ঘ. ছয় হাজার

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. গ, ২. গ, ৩. খ, ৪. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সহীহাইন বলতে কী বুঝায় ? লিখুন।
২. ইমাম বুখারীর জন্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৩. হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে ইমাম বুখারীর সফরের একটি বর্ণনা দিন।
৪. হাদীসে ইমাম বুখারীর অবদান লিপিবদ্ধ করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম বুখারী (র) এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
২. ইমাম মুসলিম (র) এর পরিচয় দিন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৬

সুনানে আরবাআ সংকলন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সুনান কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- সুনানে আরবাআ কোন কোন গ্রন্থকে বলা হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন
- সুনানে আরবাআর ইমামদের জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন।

সুনান

যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসকে ফিক্হ এর বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে তথা যে গ্রন্থে কেবল তাহারাত, নামায, রোযা প্রভৃতি আহকামের হাদীসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে তাকে 'সুনান' বলে। যেমন - সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারিমী।

সুনানে আরবা'আ

'সিহাহ সিত্তা'র অন্তর্ভুক্ত চারখানা হাদীস সংকলন যথা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ শরীফকে একসঙ্গে 'সুনানে আরবাআ' বা সুনান চতুষ্টয় বলে।

১. ইমাম আবু দাউদ (র) ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম আবু দাউদের নাম- সুলাইমান, উপাধি - আবু দাউদ, বংশধারা - সুলাইমান ইবনে আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর। জন্মভূমি - কান্দাহারের নিকটবর্তী সিজিস্তান। জন্ম - ২০২ হিজরী। হাদীস অনুসন্ধানার্থে ইমাম আবূ দাউদ (র) বহু শহরে গিয়েছেন। ইরাক, খোরাসান, সিরিয়া, হিজাজ, মিসর ও আরবের অন্যান্য দেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি হাদীস শুনেছেন। তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর সমসাময়িক। তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ হলেন- আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ইবনে মুঈন (র), উসমান ইবনে আবূ শাইবা (র), কুতাইবা (র) ও তাআলুসী (র) প্রমুখ। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর উস্তাদগণের থেকে পাঁচ লাখ হাদীস লিখেন। তিরমিযী (র), নাসায়ী (র), ও আহামদ ইবনে খিলাল (র) তাঁর হাদীস শুনেছেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ লু'লুভী (র) ইবনুল আরাবী (র) এবং ইবনে ওয়াসা (র) প্রমুখ তাঁর মশহুর শিষ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উঁচু মাপের হাদীসের হাফিয। রাবীদের দুর্বলতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং ফকীহ ছিলেন। ইবাদাত, আত্মশুদ্ধি ও তাক্ওয়ার অলংকার দ্বারা তাঁর জীবন ছিল সুসজ্জিত। তিনি বহুবার বাগদাদ এসেছিলেন। বসরায় তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। শুক্রবার, ১৫ই শাওয়াল, ২৭৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব হলো সুনান ও মারাসীল।

২. ইমাম তিরমিযী (র)-এর জীবন ও অবদান

ইমাম তিরমিযীর নাম- মুহাম্মদ, উপাধি আবূ ঈসা, বংশধারা মুহাম্মদ ইবনে ইসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মূসা ইবনে যহ্হাক আসলামী আল-বাগাবী। তিনি প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীস, হুজ্জাত এবং হাদীস শাস্ত্রের পথিকৃত ও সর্বসম্মত ইমাম ছিলেন। তাঁর দাদা বাস করতেন বলখের তিরমিয অঞ্চলে।

ইমাম তিরমিযী ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীসের অনুসন্ধানে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসিত, খোরাসান এবং হিজাযে হাদীস অনুসন্ধানে গিয়েছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে হাদীস শুনেছেন। কুতায়বা আবূ মাস'আব, ইসমাঈল ইবনে মূসা, ইমাম বুখারী (র) তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ। ইমাম তিরমিযী থেকেও বিপুল সংখ্যক ছাত্র হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। আবূ হামিদ মারূযী, ইবনে কুলায়ব শাশী, মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব মারুযী এবং হাম্মাদ ইবনে শাকের প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর প্রভাব, বিশ্বস্ততা, স্মৃতিশক্তি, সংযম-সাধনা এবং বুদ্ধিমত্তা সকল মুহাদ্দিসের নিকট স্বীকৃত। তিনি ফকীহও ছিলেন। স্মৃতিশক্তির বেলায় তাকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তিনি অত্যন্ত ধীমান ও সাধক ব্যক্তি ছিলেন।

ইমাম তিরমিযী সোমবার, ১৩ই রজব, ২৭৯ হিজরী তিরমিয থেকে ১৮ মাইল দূরে বুগ নামক গ্রামে ইহধাম ত্যাগ করেন।

অবদান

ইমাম তিরমিযী অনেক কিতাব লিখেছেন। শামাইল এবং জামিই তিরমিযী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব। ইমাম তিরমিযীর জামি, হাসান হাদীসের পরিচয়ের জন্য এক উৎকৃষ্ট সংকলন। অতীতের মনীষীগণ সহীহ ও হাসানের প্রভেদ করতেন না। সর্বপ্রথম বুখারী ও ইবনে মাদানী এ বিষয়টি পরিষ্কার করেন এবং তিরমিযী একে পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছান। তিরমিযীতে ৪৬টি অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় এবং ২১১৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। মোট হাদীসের সংখ্যা ৩৮১২টি। হাদীসের পুনরুক্তি খুবই কম; যার সংখ্যা হলো মাত্র ৮৩টি। আর দশটি অনুচ্ছেদের পুনরুক্তি ঘটেছে। তিনজন বর্ণনাকারীর হাদীস মাত্র একটি।

হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (র)-এর শর্ত হলো, এমন হাদীসও গ্রহণযোগ্য, যার ওপর কোন মুজতাহিদের আমল রয়েছে, থাক না তার সনদের ব্যাপারে উচ্চ-বাচ্য। তাই দেখা যায়, তিরমিযীর প্রায় সকল হাদীসের ওপরই কোন কোন মুজতাহিদের আমল রয়েছে। জামে তিরমিযী সুনানে তিরমিযী নামেও পরিচিত।
নাসায়ী, আবু দাউদ ও তিরমিযীর কোন হাদীসই মাওযূ বা কৃত্রিম নয়। যদিও ইবনে জাওযী (র) সুনানে নাসায়ীর একটি, সুনানে আবূ দাউদের চারটি এবং জামি তিরমিযীর তেইশটি হাদীসের কৃত্রিমতার অভিযোগ করেন, কিন্তু এ অভিযোগের সত্যতা নেই। হাফিজ ইবনে হাজার (র) সুনান গ্রন্থে ইবনে জাওযীর অভিযোগের জোর প্রতিবাদ করেন।

৩. ইমাম নাসাঈ (র) ও হাদীসে তাঁর অবদান

ইমাম নাসায়ীর নাম - আহমদ, উপাধি - আবূ আব্দুর রহমান, পদবী- আহমাদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব, খোরাসানের নাসায় তাঁর বাসস্থান। জন্ম ২১৫ হিজরী। ১৫ বছর বয়সে কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলখী (র) এর উদ্দেশ্যে হাদীসের সন্ধানে গমন করেন। পরে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র), আলী ইবনে খাশরাম (র) ও আবূ দাউদ (র) প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম আহমাদ (র)-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাত হয়েছে। হাদীসের অনুসন্ধানে তিনি স্বদেশ ছাড়াও হিজায, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও জাযায়ের গিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

অবদান

তিনি হাদীসের ইমাম, হাফিয ও হুজ্জাত ছিলেন। আলী ইবনে উমাইর বলেন, তাঁর সমসাময়িক যুগে ফিক্হ ও হাদীসের গভীর জ্ঞান, সহীহ ও দুর্বল নির্ণয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। রেওয়ায়াতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। আবূ বাশার দাওয়ালাবী (র), ইবনে সিরীন (র), তাহাবী (র) প্রমুখ তাঁর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। শেষ জীবনে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু দামেস্কে গিয়ে দেখেন, বহু লোক বনু উমাইয়া শাসনের প্রভাবে এবং খারেজীদের প্রচার প্রোপাগান্ডার কারণে হযরত আলী (র)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব প্রকাশ করছে। এটা দেখে তিনি হযরত আলীর (রা) গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর একটি হাদীসের কিতাব সংকলন করেন এবং দামেস্কের জামে মসজিদে সমবেত মুসল্লিদেরকে শুনিয়ে দেন। কিছু কিছু লোক আমীর মুআবিয়া (রা)-এর ওপরও একখানা প্রশংসা পুস্তক লেখার জন্য চাপ দৃষ্টি করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে আমার হাদীস জানা নেই। মাত্র একটি মারফূ' রেওয়ায়াত জানা আছে- আল্লাহ তাঁর উদর তৃপ্ত না করুন।

একথা শুনে বিরোধী লোক তাঁর উপর আঘাত হানে। ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। সঙ্গীরা তাঁকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। মক্কা পৌঁছেই সোমবার ১৩ সফর ৩০৩ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। কথিত আছে, সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইমাম নাসায়ী (র) বহু কিতাব লিখেছেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো নাসায়ী শরীফ।

৪. ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ও হাদীসে তাঁর অবদান

তাঁর পূর্ণনাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ। তিনি একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম ইবনে মাজাহ ২০৭ হিজরীতে কাজভীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাদীসের কেন্দ্রসমূহ সফর করেন। ইমাম মালিক ও ইমাম লাইছ-এর ছাত্রদের থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ-এর নিকট হতেও বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীস রেওয়ায়াত করেন। হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস সম্পর্কে তিনি অতি বড় আলেম ছিলেন। আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী আল-কাযভীনী বলেন-

"ইমাম ইবনে মাজাহ হাদীসের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর 'ইতিহাস' ও 'সুনান' সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইরাকে আরব, ইরাকে আযম, মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি হাদীস কেন্দ্র তিনি সফর করেন।" হাফিয ইবনে কাসীর বলেন, সুনানে ইবনে মাজায় মোট ৩২টি পরিচ্ছেদ, ১৫০০ অধ্যায়, চারহাজার হাদীস সংকলিত

হয়েছে। কয়েকটি হাদীস ব্যতীত অন্য সব হাদীসই অতি উত্তম। ইমাম ইবনে মাজাহ ২৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

সুনান ইবনে মাজাহ এর স্থান বা মর্যাদা

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু উলামায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত ৫টি হাদীস গ্রন্থকে মৌলিক গ্রন্থাবলীর তালিকাভুক্ত করেছেন। ১. সহীহ বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. সুনানে নাসায়ী, ৪. সুনানে আদূ দাউদ, ৫. জামে' তিরমিযী। তবে পরবর্তী কতক উলামায়ে কিরাম উপরোক্ত গ্রন্থের সাথে সুনান ইবনে মাজাহকে সংযোজিত করেছেন। এ কারণেই এই ছয়টি গ্রন্থকে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। ইবনে মাজাহকে অন্তর্ভুক্তির কারণ এই যে, উলামায়ে কিরাম ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেছেন। হাফিয আবূল ফযল মুহাম্মদ ইবনে তাহের আল-মুকাদ্দিমী (৫০৭ হিজরী) সর্বপ্রথম ইবনে মাজাকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে কতক মুহাদ্দিস এর বিরোধিতা করে বলেছেন, ইমাম দারেমীর গ্রন্থ 'সুনানে দারেমী' ইবনে মাজাহর পরিবর্তে 'সিহাহ সিত্তার' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। কেননা ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে এমন কিছু রাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের ব্যাপারে মিথ্যা বলার এবং হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশুদ্ধতা ও মর্যাদার দিক থেকে ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে 'আল-মুয়াত্তা' অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সুনানে ইবনে মাজাহ অপর তিনটি সুনান থেকে মর্যাদার দিক নিম্ন স্তরের। অনেক উলামায়ে কিরাম সুনান ইবন মাজাহ শরাহ লিখেছেন। তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (৮০৮ হি.) এবং সূয়ূতীর مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة উল্লেখযোগ্য।

সারকথা

সিহাহ-সিত্তার মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অপর চারখানা গ্রন্থ যথা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে সুনানে আরবাআ বলা হয়। এ গ্রন্থগুলো সুনান পদ্ধতিতে তথা তাহারাত, নামায, রোযা ইত্যাদি আহকামের হাদীসসমূহকে ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণ থেকে সাজানো হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ ছিলেন সিজিস্থানের অধিবাসী। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাদীস বিজ্ঞানী। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সংকলটি সিহাহ সিত্তার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর গ্রন্থটি সুনান আবু দাউদ নামে খ্যাত। মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযীর সুনান গ্রন্থটি পদ্ধতিতে সংকলিত। তাঁর সংকলিত প্রখ্যাত গ্রন্থ এটি। তাছাড়া শামায়েলে তিরিমিযীও তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

ইমাম নাসাঈ ছিলেন আরেকজন হাদীস বিজ্ঞানী। তিনি খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর মৌলিক অবদান হল তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস সংকলন সুনানে নাসাঈ। এটিও একটি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

ইমাম ইবনে মাজাহ ছিলেন একজন হাফিজে হাদীস। তিনি ছিলেন কাজখান শহরের অধিবাসী। তিনি গভীর পান্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান হল- সুনান ইবনে মাজাহ গ্রন্থটি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. ইমাম আবু দাউদ (র) জন্মগ্রহণ করেন-

ক. ২০২ হিজরীতে খ. ১৮৪ হিজরীতে

গ. ২১৮ হিজরীতে ঘ. ২০৪ হিজরীতে

২. সুনান তিরমিযী গ্রন্থে হাদীস সংখ্যা কত ?

ক. ৫০০০ খ. ৪৩২০

গ. ৩৮২১ ঘ. ৭৪১১

৩. ইমাম নাসাঈকে কোথায় সমাহিত করা হয় ?

ক. মক্কায় খ. মদীনায়

গ. সাফা-মাওয়ায় ঘ. বায়তুল্লাহর পাশে

৪. ইবনে মাজায় হাদীস সংখ্যা কত ?

ক. ৬ হাজার খ. ৪ হাজার

গ. ৫ হাজার ঘ. ৭ হাজার

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ ১. ক, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সুনানে আরবাআ বলতে কী বুঝায় ? লিখুন ।
২. ইমাম আবু দাউদ (র) এর পরিচয় দিন।
৩. সুনান আবু দাউদ গ্রন্থের পরিচয় দিন।
৪. ইমাম তিরমিযীর পরিচয় দিন।
৫. তিরমিযী গ্রন্থের পরিচয় দিন।
৬. সুনান নাসাঈ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখুন।
৭. সুনান ইবনে মাজাহ গ্রন্থের পরিচয় দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. সুনানে আরবাআর লেখক ও গ্রন্থকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. ইমাম মুসলিম এর পরিচয় দিন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৫

নির্বাচিত হাদীস-এর অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

ভূমিকা

হাদীস ইসলামী আইন শাস্ত্রের দ্বিতীয় মৌল উৎস। আল-কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস ব্যতীত আল-কুরআন ব্যাখ্যা করা ও বোঝা অত্যন্ত কঠিন কাজ, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভব নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে হাদীসের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। আলোচ্য ইউনিটে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াবলী এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় স্থান পেয়েছে। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি আমরা যত্নবান হই এবং আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার শিক্ষা বাস্তবায়িত করি তা হলে সমাজ থেকে অধর্ম, অনৈতিকতাবোধ দূরীভূত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নেমে আসবে স্বর্গীয় শান্তির ঝর্ণাধারা। শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুবিধার দিকে লক্ষ করে আলোচ্য ইউনিটকে ১৫টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

- পাঠ-১: নিয়াত ও ইখলাস সম্পর্কিত হাদীস
- পাঠ-২: ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত হাদীস
- পাঠ-৩: ইলম সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-৪: পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-৫: সালাত সম্পর্কিত হাদীস
- পাঠ-৬: যাকাত সম্পর্কিত হাদীস
- পাঠ-৭:সাওম সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-৮: হজ্জ সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-৯: উপার্জন সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-১০: নৈতিকতা সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-১১: যুল্‌ম-নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-১২: সুদ, ঘুষ, জুয়া রোধ সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-১৩: হত্যা, সন্ত্রাস, অধিকারহরণের পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-১৪: চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানির পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস
- পাঠ-১৫: পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত হাদীস।

পাঠ ঃ ১

নিয়াত ও ইখলাস সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

◆ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিয়াত ও ইখলাস সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

নিয়াত ও ইখলাস সব রকমের কথায় ও কাজে আবশ্যক। নিয়াত ও ইখলাস ব্যতিত কোন কাজের মূল্য আল্লাহর কাছে অর্থহীন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَواةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ.

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এটাই সঠিক দীন।" (সূরা আল-বাইয়েনাহ : ৫) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন -

لَن يَنَالَ ٱللَّـهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ .

"আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা আল-হজ্জ : ৩৭)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّـهُ.

"বল, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি, তোমরা গোপন অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।"(সূরা আলে ইমরান : ২৯)
নিয়াত ও ইখলাসের গুরুত্ব

عن امير المؤمنين ابى حفص عمر بن رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: انما الاعمال بالنيات , و انما لكل امرى ما نوى . فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله ,و من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. (متفق عليه)

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়াত অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়াতে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছায় কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার আশায় হিজরত করবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)

হিজরত ও মুহাজির

হিজরত শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করা আর মুহাজির শব্দের অর্থ পরিত্যাগকারী। প্রকৃত মুহাজির হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলা যা কিছু নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে। এক ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন থেকে তার হিজরতের কাজ শুরু করতে হয়। প্রথমে তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে ইসলামের বিপরীত আকীদা-বিশ্বাসসমূহ বের করে দেয়- এটা তার প্রথম হিজরত। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহর যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে, হারাম জিনিস ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সকল নিষিদ্ধ জিনিস ও কাজ পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র অপরিহার্য। তৃতীয় পর্যায়ে সে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করতে চায় ; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা এদিক দিয়ে যদি চরম নৈরাশ্যজনক মনে হয় তখন সে নিরুপায় হয়ে সমাজ ও দেশত্যাগ করে অন্যত্র

চলে যেতে বাধ্য হয়। প্রচলিত ভাষায় একেই বলা হয় হিজরত। কিন্তু আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, এটাই আসল ও একমাত্র হিজরত নয় ; হিজরতের আসল অর্থ ত্যাগ করা। আর দেশত্যাগ করা এর চূড়ান্ত পর্যায় ও সর্বশেষ উপায়।

হিজরত দু' প্রকার

১। যাহিরী বা প্রকাশ্য হিজরত। অর্থাৎ যেখানে ইসলাম বিপন্ন, সে স্থান ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া।
২। আর দ্বিতীয় প্রকারের হিজরত হলো বাতিনী বা অপ্রকাশ্য হিজরত। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলী পরিত্যাগ করা। বস্তুত যাহিরীর তুলনায় বাতিনী হিজরত খুব কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। কেননা এটা হলো নাফসের সাথে জিহাদ। নবী করীম (সা) বলেছেন- اشد الجهاد جهاد الهوى অর্থাৎ "নাফসের বা প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করাই হল কঠিন জিহাদ।" মূলত জিহাদ হলো হিজরতের বাস্তবরূপ।
নিয়াত অনুসারে সকল কাজের প্রতিদান দেয়া হবে।

و عن ابى اسحاق سعد بن ابى وقاص رضى الله عنهم قال : جاء نى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد بى فقلت: يا رسول الله: انى قد بلغ بى من الوجع ما ترى و انا ذومال ولا يرثنى الا ابنة لى أفأتصدق بثلثى مالي قال "لا" قلت فالشطر يا رسول الله ؟ فقال "لا" قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال: "الثلث و الثلث كثير او كبير ,انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ,و انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل فى فم امراتك" قال فقلت يا رسول الله: اخلف بعد اصحابى؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله الا ازددت به درجة و رفعة ,و لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام و يضربك اخرون. اللهم امض لاصحابى هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم ان مات بمكة . (متفق عليه)

আবূ ইসহাক সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হাজ্জাতুল বিদার বছরে খুব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খুব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছি যেমনটি আপনি দেখছেন। আমার যে সম্পদ রয়েছে তার ওয়ারিস একমাত্র আমার কন্যাই হবে। তাহলে আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদকা করে দেব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে অর্ধেকটা (দান করে দেই) ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ (দান করে দেই) ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগই দান কর। আর এটাই অনেক বেশী অথবা (বলেন) অনেক বড়। তোমার ওয়ারিসগণকে নিঃসম্বল অবস্থায় না রেখে তাদেরকে ধনবান করে রেখে যাওয়াই উত্তম যেন তাদেরকে মানুষের নিকট হাত পাততে না হয়। তুমি আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যাই ব্যয় কর না কেন, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে তারও প্রতিদান তোমাকে দেয়া হবে। আবু ইসহাক বলেন. আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার সঙ্গীগণের হিজরতের পর মক্কায় রয়ে যাব ? তিনি বললেন, তুমি থেকে গিয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কাজই কর না কেন, তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। খুব সম্ভব তুমি থেকে যাবে। তখন অনেকে তোমার দ্বারা উপকৃত হবে; আবার অনেকে তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ ! আমার সাথীদের হিজরত সম্পন্ন কর এবং তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিও না। তবে সাদ ইবনে খাওলা কিন্তু সত্যিই কৃপার পাত্র। মক্কায় তার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা) সমবেদনা প্রকাশ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله تعالى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم و لكن ينظر الى قلوبكم. (مسلم)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। (মুসলিম)

আবূ মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, আর কেউ আত্মসম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্য লড়াই করে, আবার কেউ বা লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে- এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সেই আল্লাহর পথে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু বাকরা নুফাই ইবনে হারেস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলিম তাদের তরবারী নিয়ে একে অপরের সম্মুখীন হবে এবং একজন অন্যজনকে হত্যা করলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হত্যাকারী সম্পর্কে কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি দোষ? মহানবী (সা) বললেন, কেননা সে তার সঙ্গীকে হত্যার ইচছা করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : একটি সৈন্যদল কাবার ওপর হামলা করতে যাবে। যখন তারা সমতলভূমিতে পৌঁছবে, তখন তাদের পূর্বের ও পরের লোকজনসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূলুল্লাহ ! কি করে তাদের পূর্বের ও পরের সব লোকসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে বহু নগরবাসী ও এমন লোক থাকবে যারা হামলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাদের পূর্বের ও পরের লোকসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদের নিয়াত অনুযায়ী তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে বুখারীর শব্দাবলীই উদ্ধৃত হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে নিয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেকে যত সন্দুর বেশ ভূষার দ্বারা শোভা বর্ধন করূক না কেন তার উদ্দেশ্যে যদি ভিন্নতা থাকে তা হলে তার বাহ্যিক দৃশ্যাবলীর কোনই মূল্য হবে না। এ হাদীসে তাই বলা হয়েছে। বেশ ভূষা দ্বারা মানুষ নিজেকে অলি আল্লাহ দাবি করতে পারে। রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী দাবি করতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যদি ইখলাস এর পরিবর্তে কপটতা থাকে তবে আল্লাহর কাছে সে কোন প্রতিদান পাবে না। এমনিভাবে লোক দেখানো যে কোন কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। হাদীসটিতে তারই ইঙ্গিত রয়েছে।

و عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح و لكن جهاد و نية و اذا استنصرتم فينفروا – متفق عليه و معناه لاهجرة من مكة لانها صارت دار الاسلام.

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়াত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য তলব করা হবে তখনই তোমরা বের হয়ে যাবে। (বুখরী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

ইমাম নববী বলেন, এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে- মক্কা থেকে হিজরত করার হুকুম এ হাদীস বর্ণনাকালে ছিল না। কারণ তখন মক্কা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

আবু আবদুল্লাহ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, মদীনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, তোমরা যে সমস্ত স্থানে সফর কর এবং যে ময়দান অতিক্রম কর সেখানে তারা তোমাদের সাথেই থাকে। তাদেরকে রোগে আটকে রেখেছে। (মুসলিম) অন্য বর্ণনায় আছে, তারা সওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক হবে।

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা তাবুকের জিহাদ থেকে নবী করীম (সা)-এর সাথে ফিরে আসার পর তিনি বললেন ঃ মদীনায় এমন একদল লোক রয়ে গিয়েছে যারা আমাদের

সাথে আসেনি এবং কোন ময়দানও অতিক্রম করেনি ; কিন্তু তবুও তারা আমাদের সাথেই আছে বলে গণ্য করা হবে। কেননা তাদের জিহাদে যাওয়ার ইচছা ছিল কিন্তু তাদেরকে বিশেষ ওজর আটকে রেখেছে। তাদের ওজরের কারণে তারা না আসতে পারায় তারা পার পেয়ে যাবে।

و عن ابى يزيد معن بن الاخنس رضى الله عنهم و هو و أبوه وجده صحابيون قال. كان ابى يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل فى المسجد فجئت فاخذتها فأتيته بها فقال : والله ما اياك اردت فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لك ما نويت يا يزيد و لك ما اخذت يا معن. رواه البخارى

হযরত আবূ ইয়াযীদ মাআন ইবনে আখনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি, তাঁর পিতা এবং দাদা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেনঃ আমার পিতা ইয়াযীদ কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদকা দানের জন্য বের করলেন, তিনি মসজিদে কোন একটি লোকের কাছে তা রেখে দিলেন। আমি গিয়ে তা নিয়ে নিলাম। এতে আমার পিতা বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দেবার ইচ্ছা করিনি। আমি তখন বিষয়টা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থাপন করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইয়াজিদ! তুমি তোমার জন্য নিয়াত করনি এবং হে মাআন তুমি তোমার জন্য গ্রহণ করনি।

ব্যাখ্যা

মানুষের কর্মময় জীবন পরিশুদ্ধ ও যথার্থ হিসেবে অনুষ্ঠিত করার জন্য সর্বাগ্রে যে বিষয়টির প্রতি কুরআন-হাদীসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল-ইখলাস ও নিয়াত । ইবাদত সংক্রান্ত কোন কাজ করতে গেলে তার উদ্দেশ্য সঠিক থেকে হবে। উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি কোন কপটতা থাকে তা হলে তার দ্বারা যত গুরুত্বপূর্ণ কর্মই সাধিত হোক না কেন তার কোন মূল্য বা প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে না। আবার কোন কাজ বা ইবাদতে যদি ইখলাস বা একাগ্রতা না থাকে তবে সে কাজ বা আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে না। আলোচ্য পাঠে নিয়াত এবং একাগ্রতার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজের ফলাফল তার নিয়াতের উপরই প্রদান করা হবে। উদাহরণ হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করে তবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকে তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় হাদীসে আবু ইসহাক সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হাদীসে নিয়াত এবং এখলাস সংক্রান্ত বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি হিজরত না করে মক্কায় বসবাস করার নিয়াত করে; কিন্তু তার নিয়াতের মধ্যে কোন কপটতা বা লৌকিকতা নেই, যেমনটি উক্ত সাহবীর বেলায় হয়েছে। উক্ত সাহাবী হিজরতের পরও মহানবী (সা)-এর অনুমতিক্রমে মক্কায় থেকেছেন। তিনি যখন মহানবী (সা)-এর কাছে মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে মক্কায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন যদিও হিজরত করার আদেশ তখন বলবৎ ছিল এবং মহানবী (সা) সহ সাহাবাই কিরামগণ মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিয়াত ও ইখলাসের কারণে এমতাবস্থায় নবী করীম (সা) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) কে বললেন-তুমি মক্কায় থেকে গিয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কাজই করনা কেন, তাতে তোমার সম্মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। মহানবী (সা) বাহ্যিক ইবাদাত, পোষাক ও লৌকিকতার উপর নিয়াত ও ইখলাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন- যে আল্লাহতাআলা মানুষের পোষাক পরিচছদ ও বাহ্যিক কৃতকর্মের দিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। কারো চেহারার দিকেও নযর দেননা। বরং তিনি অন্তরের দিকে তাকান সেখানে কি আছে। কারণ আল্লাহর কাছে লৌকিকতার বা বাহ্যিক ও লোক দেখানো কর্মকান্ডের কোনই মূল্য নেই। কেননা, বাহ্যিক কর্মকান্ডও লৌকিকতা নিয়াতের মূল্যায়ন করেনা। অপরাধীরা অপরাধকে ঢাকার জন্য এবং মুনাফিকরা ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়ার জন্য অনেক সময় কপটতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ সকল মানুষের মধ্যে অনেকের কথা-বার্তায় মধু থাকে এবং আচার-আচরণ দ্বারা মানুষকে মুগ্ধ করে। পক্ষান্তরে তাদের নিয়াত খারাপ থাকায় তারা ক্ষতি করে বসে। ভাল নিয়াতে অতি

ক্ষুদ্র কাজ করলেও তার বিনিময়ময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর খারাপ নিয়াতে যত ভাল কাজ করা হোক না কেন বা উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ - রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় দান করা হোক না কেন তার বিনিময়ে আল্লাহ কোন প্রতিদানই দেবেন না। বরং তার সকল কর্মকান্ড নিস্ফল হয়ে যাবে।

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে মহানবী (সা) বলেছেন যে, একটি দল পবিত্র কাবা শরীফের উপর হামলা করতে আসবে। যখন তারা সমতল ভূমিতে পৌঁছবে তখন তাদের পূর্বের ও পরের লোকজনসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। অথচ তাদের মধ্যে অনেক লোক এমন থাকবে, যারা কাবা ঘর ধ্বংস করতে আসেনি। তা সত্বেও তাদেরকে ভূমি ধ্বসিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন তাদের নিয়াত অনুযায়ী তারা ফল লাভ করবে। কাজেই সব কিছুতেই নিয়াতকে প্রাধান্য দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। লৌকিকতা ও কপটতা পরিহার করে আমাদের নিয়াতকে বিশুদ্ধ করতে হবে। তা হলেই কেবল সাফল্য লাভের আশা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১. ইখলাস ও নিয়াত ব্যতীত কোন কাজ অর্থহীন।
২. কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশ্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে।
৩. সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়াত অনুযায়ী হবে।
৪. সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) মক্কায় ইন্তিকাল করলে মহানবী (সা) সমবেদনা প্রকাশ করেননি।
৫. আল্লাহ তাআলা মানুষের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইখলাস ও নিয়াতের গুরুত্ব লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইখলাস ও নিয়াত সম্পর্কে হাদীসের আলোকে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ২

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ করতে পারবেন
- হাদীসে- জিবরীল (আ)-এর আলোকে ঈমান-ইসলাম ও ইহসান কি তা বলতে পারবেন
- কীভাবে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন
- ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

عن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه و وضع كفيه على فخذيه .

و قال: يا محمد! اخبرنى عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقيم الصلوة و تؤتى الزكوة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال : صدقت فعجبنا له يسأله و يصدقه. قال: فاخبرنى عن الايمان. قال ان تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره قال صدقت .

قال: فأخبرنى عن الاحسان قال: ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال: فاخبرنى عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرنى عن امارتها. قال: ان تلد الامة ربتها و ان ترای الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فانه جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم و رواه ابو هريرة مع اختلاف و فيه: و اذا رايت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض: فى خمس لا يعلمهن الا الله. ثم قرأ: ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث (الاية). (متفق عليه)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল কুচকুচে কালো, তাঁর মধ্যে ভ্রমণের কোন আলামত দেখা যায়নি। আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিল না। অবশেষে, আগন্তুক রাসূল (সা)-এর অত্যন্ত নিকটে এসে বসলেন এবং রাসূল (সা)-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে স্বীয় হাঁটুদ্বয় মিলিয়ে স্বীয় হস্তদ্বয় রাসূল (সা)-এর দু'রানের উপর বা আপন রানের উপর রাখলেন।

অতঃপর তিনি বললেন- হে মুহাম্মদ (সা)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূল (সা) বললেন- ইসলাম হলো, তুমি একথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁরই প্রেরিত রাসূল। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাদানে সিয়াম সাধনা করবে, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে।
প্রশ্নকারী রাসূল (সা)-এর উত্তর শ্রবণান্তে বললেন- আপনি সত্যিই বলেছেন। বর্ণনাকারী উমর ইবনুল খাত্তাব বলেন- আমরা প্রশ্নকারীর প্রশ্নোত্তরের ধরন দেখে বিস্মিত হলাম যে, তিনি নিজেই প্রশ্নকারী এবং নিজেই উত্তরের সত্যায়নকারী। লোকটি পূনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূল (সা) বললেন- ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস। ভাগ্যের প্রতি এভাবে বিশ্বাস স্থাপন যে, ভাল-মন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়। রাসূল (সা)-এর উত্তর শ্রবণান্তে প্রশ্নকারী বললেন- আপনি সত্যিই বলেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন- আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন- ইহসান হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমনভাবে করা যে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি দেখতে না পাও, তবে ধারণা করবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি বললেন- আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূল (সা) বললেন- যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি অবগত নন।

অতঃপর তিনি বললেন- আমাকে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূল (সা) বললেন- প্রথম নিদর্শন হচ্ছে- দাসীগণ স্বীয় মনিবকে প্রসব করবে, আর তুমি দেখতে পাবে যে, যাদের পায়ে জুতা নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, যারা শূন্যহাত ও মেষ চালক তারা পরবর্তীকালে বড় বড় প্রাসাদ রচনা করছে এবং এ কাজে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে।

অতঃপর লোকটি প্রস্থান করলেন। আমরা বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ হয়ে থাকলাম। অতঃপর রাসূল (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন- হে উমর ! প্রশ্নকারী কে জান ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তখন রাসূল (সা) বললেন- ইনি হযরত জিবরীল (আঃ), যিনি তোমাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা প্রদানের জন্য আগমন করেছিলেন। এ হাদীসখানা ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসখানাই কিছু কম-বেশিসহ হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাগুলো রয়েছে- যখন তোমরা খালি পা ও উলঙ্গ দেহবিশিষ্ট বধির ও বোবাদেরকে পৃথিবীর শাসক হিসেবে দেখবে। (আর একথাও রয়েছে)- পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই। অতঃপর নবী করীম (সা) কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন-

ان الله عنده علم الساعة .....

কিয়ামত কখন হবে, সে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে .....। (বুখারী ও মুসলিম হাদীসখানি বর্ণনা করেন)

ইসলামের মূল ভিত্তি

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة والحج و صوم رمضان. (متفق عليه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল; সালাত কায়েম করা; যাকাত প্রদান করা; হজ্জ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা। [বুখারী ও মুসলিম এ হাদীস বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেন]

ব্যাখ্যা

এ হাদীসে কোন ব্যক্তির ঈমান আনয়ন করার পর, সে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলাম নামক প্রাসাদের ভিত্তি কিসের ওপর স্থাপিত হবে তার বর্ণনা পরিস্কারভাবে রয়েছে। যাতে কেউ বিভ্রান্তি থেকে

না পারে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম নামক প্রাসাদের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভ পাঁচটি হচ্ছে- ১. কালেমা, ২. সালাত, ৩. যাকাত, ৪. সাওম ও ৫. হজ্জ।
অতএব কোন মুসলমানই এ পাঁচটি মৌলিক কাজ যথাযথরূপে সম্পন্ন করা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে পারে না। যদি করে, তবে সে ইসলামের মূলকেই অস্বীকার করে।
ইসলামের প্রথম কথা, আল্লাহর প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য স্বীকার করা এবং সে সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সর্বশেষ নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর নিকট থেকে যে বিধি-বিধান পাওয়া গিয়েছে তা সর্বতোভাবে স্বীকার করা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

একজন মানুষ যখন আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেয় তখন সর্বপ্রথম দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার ওপর পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার সালাত প্রতিষ্ঠা করার কর্তব্য আরোপিত হয়।

হাদীসে সালাতের পরই যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায় যে, ইসলামে সালাতের পরই যাকাতের স্থান ও গুরুত্ব। বস্তুত আল-কুরআনে যে সকল স্থানে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় সেসব স্থানেই সালাতের পরই যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, যাকাত ফরয হওয়ার পর যে ব্যক্তি তা সঠিকরূপে আদায় না করবে, সে আল্লাহর কাছে দোষী সাব্যস্থ হবে এবং মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ 'মুসলিম' বলে গণ্য থেকে পারে না। যাকাত সম্পর্কে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত প্রদান করা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করলে চলবে না বরং ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত আদায় করতে হবে বাইতুল মাল বা ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে। ইসলামী সমাজে কোন মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করলে ইসলামী রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।

বলাবাহুল্য, ইসলাম ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, তবে এর প্রধান অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করা। আর একজন মানুষ সাধারণত পাঁচটি প্রক্রিয়ায় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। যেমন-

১. মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়তো মৌখিকভাবে করবে। আর তারই প্রতীক হলো কালেমা বা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. অথবা সে তার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কাজের মাধ্যমে পেশ করবে। আর সে কাজ দৈহিক পরিশ্রমে সম্পন্ন করতে পারে। এরই প্রতীক হল সালাত। অর্থাৎ সালাত হচ্ছে শারীরিক ইবাদত।

৩. কিংবা তা সে অর্থব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে, আর এরই প্রতীক হচ্ছে যাকাত। তথা যাকাত হচ্ছে আর্থিক ইবাদত।

৪. অথবা দৈহিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের সমন্বয়ে সম্পাদন করবে, আর এরই প্রতীক হল হজ্জ।

৫. কিংবা বান্দা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। আর তারই প্রতীক হল সাওম।

যেহেতু মানুষ আল্লাহর আনুগত্য এ পাঁচটি প্রধান উপায়েই কেবল পেশ করতে পারে, তাই এ পাঁচটি কাজকে আরকানে ইসলাম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম শাব্দিক অর্থে এ পাঁচটি আরকানেই সীমিত। বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের নাম ইসলাম। এ পাঁচটি কাজ সম্পন্ন করলেই ইসলামের সমগ্র দায়িত্ব পালন হয়ে গেল এমনটি ধারণা করা ভুল হবে। সূতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য বিষয় হল আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব এবং নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাতকে মেনে নিয়ে সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম ইত্যাদি ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতকে যথাযথভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং এর ওপর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা চালানো। তা হলে এ পাঁচটি ভিত্তি স্থায়ী হয়ে থাকবে এবং ধীরে ধীরে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الايمان بضع و سبعون شعبة. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطريق. والحياء شعبة من الايمان. (متفق عليه)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন: ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হচ্ছে, এ ঘোষণা দেয়া لا اله الا الله (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করা)। আর এর নিম্নতম শাখা হচ্ছে, পথের মধ্য থেকে কষ্টদায়ক জিনিসসমূহ দূর করা। আর হায়া বা লজ্জা ঈমানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বিশেষ। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

হাদীসে মহানবী (সা) ঈমানের শাখা সত্তরটিরও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ নির্দিষ্টভাবে এর সংখ্যা সত্তরটি নয় যে, এর বেশি থেকে পারবে না ; বরং সত্তর কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ অনেক। আরবি ভাষায় অনেক ও বহু বোঝাবার জন্য সাধারণভাবেই 'সত্তর' সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য হাদীসে সত্তরটিরও বেশি বলা হয়েছে আরো অধিক আরো বিপুল সংখ্যা বোঝাবার উদ্দেশে অর্থাৎ ঈমানের বহু ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ঈমানের শাখা বলতে বোঝানো হয়েছে যে সকল কাজ-কর্ম, নৈতিক চরিত্র এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে, যা কারো মনে ঈমান আসলে এর পরিণতি ও ফল হিসেবে তার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন- শ্যামল-সবুজ-সতেজ বৃক্ষে ফুল ও ফল স্বাভাবিকভাবেই ধরে থাকে। এর অর্থ এই যে, সকল প্রকার ভাল কাজ, সৎ চরিত্র ও পুণ্যময় পবিত্র ভাবধারা সবই ঈমানের শাখা-প্রশাখা বিশেষ। অবশ্য শ্রেণী-মর্যাদার দিক দিয়ে এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্যদানকে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত শাখা বলা হয়েছে এবং এর বিপরীতে নিম্নতম শ্রেণীর ঈমান হচ্ছে রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করা। অর্থাৎ কেবল আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করার নামই ঈমান নয়, বরং রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও ঈমানের অংশ। এখানে ঈমানের দুটো প্রান্তিক অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই দুই সীমান্তের মাঝখানে যত কিছু ভাল কাজ ধারণ করা সম্ভব তা সবই ঈমানের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা-প্রশাখা মাত্র, তা আল্লাহর 'হক' সম্পর্কীয় কাজ হোক আর বান্দাহর হক সম্পর্কীয় কাজ হোক ; এর কোন একটিও ঈমানের বাইরে নয়। আর এর সংখ্যা যে বহু ও বিপুল হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

হাদীসের শেষাংশে 'হায়া' বা লজ্জা সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে- এটা ঈমানের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। লজ্জাকে এতদূর গুরুত্ব দানের একটি কারণ এ থেকে পারে যে, মহানবী (সা) যখন এ হাদীস বলেছিলেন, তখন কারো নির্লজ্জতা কিংবা লজ্জার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং মহানবী (সা) তাকে সে সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। কিংবা মূলত ঈমানের সাথে লজ্জার যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, নবী করীম (সা) এখানে সে তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। বস্তুত মানব চরিত্রে লজ্জার স্থান সর্বাধিক, আর লজ্জা একটি এমন গুণ, যা মানুষকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে এবং অসংখ্য পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে। এজন্য ঈমান ও লজ্জার মধ্যে অতীব গভীর ও নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কেবল নিজেদের সমশ্রেণীর লোকদের কাছে লজ্জা করাই ঈমানের দাবি নয়, বরং সবচেয়ে বেশি লজ্জাবোধ করা উচিত আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রতি। সাধারণভাবে কেবল বড়দের সামনে কিছুটা বেয়াদবী ও নির্লজ্জতা দেখালেই লোকেরা তাকে বেহায়া বা নির্লজ্জ বলে অভিহিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড় নির্লজ্জ-বেহায়া হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনে লজ্জা করে না এবং আল্লাহ সবকিছু দেখেন এ কথা বিশ্বাস করেও গোপনে এবং প্রকাশ্যে সর্বোতভাবে সে আল্লাহর না-ফরমানী থেকে বিরত থাকে না।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) একদা সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন- "আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা এতদূর লজ্জাবোধ কর, যেমন করা উচিত।" উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহর শোকর, আমরা আল্লাহ সম্পর্কে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন- এরূপ নয়। আল্লাহ সম্পর্কে লজ্জা করার নিয়ম হল এই যে, মস্তক ও মস্তকের মধ্যে যত

চিন্তাধারা ও মতবাদ রয়েছে সেসব কিছুর পূর্ণনিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ সকল প্রকার খারাপ চিন্তা ও মতবাদ থেকে মস্তিষ্ককে এবং হারাম ও না জায়িয খাদ্য থেকে পেটকে রক্ষা করতে হবে। আর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর কবরে তোমাদের যে অবস্থা হবে তা স্মরণ করবে। বস্তুত, যে ব্যক্তি এসব কাজ ঠিক ঠিকভাবে করতে পারল; সে আল্লাহ সম্পর্কে লজ্জা করার পূর্ণ 'হক' আদায় করতে পারল। (তিরমিযী)

প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়

عن عبد الله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخارى و لمسلم قال ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم اى المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه و يده.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: সে প্রকৃত মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ রয়েছে। আর প্রকৃত মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করেছে। এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করল- হে আল্লাহর রাসূল ! মুসলিমদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে ? রাসূল (সা) বলেন, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ থেকে নিরাপদ থাকে।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে খাঁটি মুসলিম এবং মুহাজিরের স্বরূপ ও পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যাদের মুখের কথা এবং হাতের কোন কাজ দ্বারা অন্যান্য লোক বিন্দুমাত্র আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে-ই প্রকৃত মুসলিম। আর সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুহাজির যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে। এখানে মুখ ও হাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, মানুষ মানুষকে যত প্রকারে কষ্ট দিয়ে থাকে ও যত উপায়ে কষ্ট দিতে পারে তা সবই প্রধানত এ হাত ও মুখের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। হাদীসে 'লিসান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ জিহ্বা ও ভাষা দু'-ই। আবার ভাষা বলতে কেবল উচ্চারিত শব্দই বোঝায় না, হাতের লেখা বা ইশারা-ইংগিতও এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ খাঁটি মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার দ্বারা অপর মুসলিম কোন প্রকার মুখের ভাষা, ইংগিত কিংবা হাত প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই কষ্ট না পায়।

'মুসলিমগণ নিরাপদ রয়েছে' বাক্যাংশ থেকে এ কথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া বোধ হয় কোন অন্যায় কাজ নয়। এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, খাঁটি মুসলিম সে, যার দ্বারা কোন লোকই বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত হয় না। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে من سلم المسلمون-এর পরিবর্তে من سلم الناس উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ সকল মানুষই তার নিকট নিরাপদ থাকবে।

আলোচ্য হাদীসে যে কষ্টদানকে মুসলিম হওয়ার পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তা হচ্ছে বিনা কারণে ও বেআইনীভাবে মুসলিম ব্যক্তি কোন মানুষকেই বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে পারে না। কিন্তু অপরাধীকে আইন মোতাবিক শাস্তিদান, যালিমদের যুল্‌ম -ফাসাদ রোধ করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন, প্রয়োজন হলে দৈহিক আঘাত হানা এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার পথে কোন প্রকার বাধা আসলে তা দূর করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করা একান্তই অপরিহার্য।

ঈমানের স্বাদ গ্রহণকারী ব্যক্তি

عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله و رسوله احب اليه مما سواهما و من احب عبدا لا

يحبه الا لله و من يكره ان يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار. (متفق عليه)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করবে। আর তা হচ্ছে- ১. যার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা তাঁদের উভয় ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে অধিক পরিমাণে রয়েছে এবং রাসূল (সা) তার নিকট অপর সকলের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় হবে, ২. যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে এবং ৩, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহে কুফর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কুফরির মধ্যে পুনরায় ফিরে যেতে তেমন অপছন্দ করে, যেমন অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত থেকে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

বর্ণিত হাদীসটি মিশকাতুল মাসাবীহ-এর 'কিতাবুল ঈমান' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম থেকে সংকলন করেছেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেন।
হাদীসে প্রকৃত ঈমানদারের তিনটি গুণের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনায় এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসটি ইসলামের এক মৌলিক নীতিমালা বিশেষ। এতে তিনটি মৌলিক বিষয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে।

প্রথমতঃ, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা দ্বীন ও ঈমানের মূল কথা, সর্বোপরি এটাই প্রকৃত ঈমান। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা পোষণ এবং কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করা, তাতে বিন্দুমাত্র রাযী না হওয়ার কাজ কেবল তার দ্বারাই সম্ভব, যার মধ্যে ঈমান-দৃঢ়মূল হয়ে আসন গেড়েছে আর যার অন্তর এজন্য প্রশস্ত হয়েছে, যার রক্ত মাংশ এর সঙ্গে মিলে-মিশে আছে। অন্তর দিয়ে কেবল সে-ই দুনিয়ার সবার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অধিকতর ভালবাসতে পারে এবং কেবল সে-ই কুফরিতে ফিরে যাওয়া বা ঈমানের পর পূনরায় কুফরি কবুল করাকে ঘৃণা ও অপছন্দ করতে পারে। সব কিছুর বিনিময়ে ঈমানের ওপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কুফরির সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। এজন্যই হাদীসে সর্বপ্রথম এর উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও কুরবানী অকাতরে সহ্য করা, দুনিয়ার সকল প্রকার স্বার্থ ও সুখের বিনিময়ে দ্বীন পালন করতে পারা সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ব্যক্তির মধ্যে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'স্বাদ' কথাটি খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হলেও এখানে রূপকভাবে ঈমান সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালবাসার অর্থ আল্লাহর হুকুম পালন করা ও আল্লাহর হুকুমের বিপরীত যা কিছু আছে তা পরিত্যাগ ও পরিহার করা;। রাসূলের প্রতি ভালবাসার অর্থও তাই।

মনীষী ইবনে বাত্তাল এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহর জন্য বান্দার ভালবাসা হচ্ছে স্থায়ীভাবে তাঁর আনুগত্য করা, যাবতীয় হুকুম পালন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসাও অনুরূপ তাঁর উপস্থাপিত শরীআতকে স্থায়ীভাবে পালন করে চলা। (উমদাতুল কারী)

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা। এখানে কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অপর মানুষকে ভালবাসার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরস্পরের ভাই বানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন- তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গিয়েছ। (আল-ইমরান ঃ ১০৩)

তৃতীয়ত, ঈমান হচেছ মানব জীবনে আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নিয়ামত। যারা ঈমান গ্রহণ করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তারাই সফলকাম। আর যারা ঈমান গ্রহণ করেনি তারা আল্লাহর নিয়ামতের না শোকর করেছে। তারা কুফরিতে লিপ্ত থেকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচেছ। সুতরাং কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করার পর সে আর কুফরির দিকে ধাবিত হবে না। এটাই হচেছ ঈমানের দাবি। যে ব্যক্তি এ দাবি পূরণে সমর্থ হয়েছে সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

যারা ঈমানদার নয় তারা মুসলমান নয়। তাই মুসলিম জীবনে ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নিম্নে ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ঈমান মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে

ঈমান বা বিশ্বাস অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে আলোর পথ দেখায়। কোন মানুষ যখন কালেমা পাঠ করে ঈমানদারদের দলভুক্ত হয় তখন তার মন ও ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, যার দরুন সে কুচিন্তা কুফরি এবং ফাসেকী পরিহার করে সৎকর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। এদিক থেকে বিচার করলে ঈমানকে এমন এক পরশ পাথর বলা যায়, যার ছোঁয়ায় মুানুষের অসৎ চিন্তাধারা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তাই একজন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে কিছুতেই চুরি, ডাকাতি, খুন ও রাহাজানি করা সম্ভব হয় না।

ঈমান মনে ও কর্মে বিপ্লব সৃষ্টি করে

মন-মানুষের দেহকে পরিচালিত করে। দেহ যদি কম্পনা করা হয় একটি রেল গাড়ির ওয়াগণের সাথে তাহলে মন হল তার ইঞ্জিন। মনের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও ইচ্ছাই ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ মানুষের মনোজগতই তার সকল কর্ম ও সকল প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি। তাই মনে যখন কোন পরিবর্তন দেখা দেয় তখন তা অবশ্যই কর্মে প্রতিফলিত হয়। ভাল কর্ম সম্পাদন করতে হলে ভাল চিন্তা-ভাবনার দরকার। তাই শুভকাজ সম্পাদনের জন্য ঈমান বিপ্লবের সৃষ্টি করে কর্মে আকৃষ্ট করে।

ঈমান মনোবল ও সাহস সঞ্চার করে

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস মানুষের মধ্যে অপরিসীম মনোবল ও অফুরন্ত সাহস সঞ্চার করে। ঈমানদার মানুষ যখন কোন বিপদাপদ ও উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয় তখন সে শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করে। কেননা তাঁর সাহস ও মনোবল এত মজবুত যে, সে পার্থিব কোন লোভ লালসায় আকৃষ্ট হয় না। বিপদে সে সাহায্য কামনা না করে দুঃখ সইবার শক্তি কামনা করে। জীবনের সর্ব অবস্থায় সে এক পরম শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে, যা তাকে সুখের আতিশয্যে দিশেহারা না থেকে এবং দুঃখের দিনে হতাশ না থেকে সহায়ক হয়।

ঈমান মানব চরিত্রকে নম্র ও বিনয়ী করে

যারা প্রকৃত ঈমানদার তাদের ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ব থাকতে পারে না। কেননা সে মনে করে, তার যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহর দান। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই এগুলো কেড়ে নিতে পারেন। ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রই জানে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই ধনী- দরিদ্র ছোট-বড় সকলকেই সে সমান চোখে দেখে। তার মনে কখনো অহংকারের ছায়াপাতে কালিমা লিপ্ত থেকে পারে না। সে বিনয় ও নম্রতার সাথে সকলের সঙ্গে দিনাতিপাত করে এবং আল্লাহর দানে শুকরিয়া আদায় করে।

ঈমান ধৈর্য ধারণের প্রেরণা যোগায়

মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাসই মানুষকে দৈর্য্যধারণ করার শক্তি প্রদান করে। জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ বিপদাপদ, দুঃখ বঞ্চনা এমনকি মুত্যুর বিভীষিকাও তার মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে না। আল্লাহপ্রেম তার মন থেকে সকল ভয়-ভীতি অপসারণ করে তাকে এক দুর্দমনীয় মনোবলের অধিকারী করে তোলে। শত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েও আল্লাহর প্রতি আস্থা থেকে তাকে ফিরানো যায় না।

ঈমান মানুষকে নির্ভুল জীবন পথের সন্ধান দেয়

ঈমানদার ব্যক্তি শুধু আল্লাহর একত্বেই বিশ্বাস করে না, সে বিশ্বাস স্থাপন করে নবী-রাসূলদের প্রতি, আসমানী কিতাবের প্রতি এবং পরকাল বা শেষ বিচারের প্রতি। তাই সে নবীদের প্রদর্শিত পথেই জীবন যাপনের চেষ্টা করে। ঈমানী শক্তির বলেই সে নিজেকে আল্লাহর; আদর্শ বান্দা ও রাসূলের প্রকৃত উম্মত হিসেবে গড়ে তোলে।

ঈমান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, সবকিছুই আল্লাহর সাম্রাজ্য। কেননা ঈমান তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। দেখার দু'টি চোখ ছাড়াও তাঁর এমন দু'টি ঈমানী চোখ থাকে যা দ্বারা সে সমস্ত বিশ্বের সবকিছুই দর্শন করতে পারে।

ঈমান আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমিয়বাণী ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরকে স্বচ্ছ করে দিয়েছে। তাই সে অনুভব করতে পারে পৃথিবীর সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাসবোধ তার আত্মশক্তিকে মজবুত করে দেয়। সে বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর তাই সকল গুণাগুণ বা প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। এ বিশ্বাসই একজন মানুষের মনে আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে এবং মহৎ জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামের মৌল ভিত্তি

ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূলভিত্তি। ঈমান মুসলিম জাতির প্রাণশক্তির মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। জীবন-মরণে, সুদিন-দুর্দিনে বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপরই নির্ভরতা ঈমানের মূলকথা।

অনবদ্য চেতনা

ঈমান এক অনবদ্য চেতনা। আল্লাহর একত্ববাদ মু'মিনের প্রাণের অফুরন্ত প্রেরণা, আত্মার পরম পুলক। জীবনের দুর্যোগময় মুহূর্তে অথবা আনন্দমুখর হাস্যোজ্জ্বল দিনে কোন অবস্থায়ই মু'মিনকে একত্ববাদের পথ থেকে একবিন্দুও বিচ্যুৎ করা যায় না।

বহুত্ববাদের প্রতি অনাস্থা

এক ভিন্ন বহুর কোন স্থান ইসলামে নেই। মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ একক অধিকারে সমাসীন। তাই বহুত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, না খোদাবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম আপোষহীন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন প্রাণী, বস্তু বা শক্তিকে ইসলাম আল্লাহর সমতূল্য বলে বিশ্বাস করে না। বরং আল্লাহর সাথে তুলনা করাকে শিরক বলে মনে করে।

মাথা অবনত না করা

ঈমানদার আল্লাহর পর আর কাউকে বড় মনে করে না। তারা বিশ্বাস করে যে মানুষ তাঁরই প্রতিনিধি। এ বিশ্বাসের ফলে তারা কোন সৃষ্টজীবের কাছে মাথা নত করে না এবং কোন সৃষ্ট জীবকে ভয় ও পায় না।

চির উন্নত ও বলীয়ান করে

ঈমানদার কখনো অপমানিত, বিজিত ও অপরের হুকুমের তাবেদার হয় না। সদা-সর্বদাই সে চির বিজয়ী ও মর্যাদাবান নেতা। আর এ বিশ্বাসের ফলে সে চির উন্নত ও চির বলীয়ান থাকে। ঈমান মানবতাত্মাকে করে চির উন্নত, হৃদয়কে করে বিমল-পুণ্যালোকে সমুদ্ভাসিত। তার চির উন্নত শির আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে অবনত হয় না।

আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হয়

বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। এর ফলে ঈমানদারের মাঝে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়, সংকল্প হয় সুদৃঢ়।

ইন্দ্রীয় পুঁজারী হয় না

ঈমানদার কখনো অতি আরামপুঁজারী ইন্দ্রিয়পরতার দাস ও বলগাহারা লোভাতুর হয় না। সৎ ও পরিশ্রমলব্ধ জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়, তাই তার চেয়ে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী আর কেউ নয়। ঈমানদার ব্যক্তি সব সময় আল্লাহকে ভয় করে, তাই তার অন্তর থেকে লোভ-লালসা ও গায়রুল্লাহর ভয় দূর করার চেষ্টা করে।

সৃষ্টিলোকের আপনজন

ঈমানদার সকলের অধিকার পূরণ করে, সৃষ্টির কল্যাণে সদা ব্যস্ত থাকে। সে সৃষ্টির কোন ক্ষতি করে না। মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে সে লালন করে। ফলে গোটা সৃষ্টি তার বন্ধু বা প্রিয়জন হয়ে ওঠে।

কর্ম চেতনার মূল উৎস

ঈমানের ফলে মানুষের সকল কাজ চলে একটি অপরিমেয় চেতনায় ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে। তার কোন কাজ বিফলে যায় না। তার সব কাজ আল্লাহ দেখছেন। এ ঈমানের ফলে মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয় এক অপারগতি ও চেতনা। যা সমগ্র কর্ম চাঞ্চল্যের মূল উৎস।

স্বার্থপরতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে

ঈমানের ফলশ্রুতিতে মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার গদ্বানি থেকে মুক্ত হয়ে সকল সৃষ্টিলোকের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় সকল কাজ করে থাকে। সে সকলকে আপন বলে ভাবে এবং নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অপরের সুবিধার কথা চিন্তা করে। তাই তার মধ্যে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, হীনস্বার্থপরতা জন্ম নিতে পারে না।

ইসলামের পথে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে

ঈমানদার মানুষ সকলেই এক পরিবারের এবং একই জাতির বলে নিজেকে মনে করে। দেশ, কাল, ভাষা, বর্ণ, গোত্রে কোন বিভেদই তাদের মধ্যে অনৈক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। সবাই মিলে হয় এক অখন্ড জাতি এবং তারা সব সময় ঐক্য কামনা করে। আল্লাহর পথে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। যেমন- আল্লাহ বলেন- واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

ঈমান ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু, ইসলামের মূল ভিত্তি, এর ওপর মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মের ফল নির্ভরশীল। মানুষের জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে তাঁর বিশ্বাসের ওপর। ঈমানের ওপরই ইসলামের গোটা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। এর অভাবে ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ইসলামের অস্তিত্বই থাকে না। মোটকথা, মানুষ যা বিশ্বাস করে সেভাবেই জীবন পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়। এক কথায় বলা যায়, ঈমান প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সকল সৎকর্মের মূলভিত্তি। তাই মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক ও পার্থক্য

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দেখা যায়, 'ঈমান ও ইসলাম' উভয় শব্দ কখনো এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো ভিন্নার্থে এবং কখনো উভয়কে সম্পূরক অর্থেও ব্যবহৃত থেকে দেখা যায়। তাই মনীষীগণ উভয় শব্দের সম্পর্ক-পার্থক্য নির্ণয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা শাব্দিক বিশ্লেষণ ও পার্থক্য মাত্র। নচেৎ উভয় শব্দই এক অভিন্ন বা একে অপরের পরিপূরক, একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যিক কার্যাবলীর নাম ইসলাম, আর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের নাম ঈমান। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে জিবরাইল থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কেননা, জিবরীল (আ)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- "আল্লাহর তাওহীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতে বিশ্বাস করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং হজ্জ পালন করার নাম ইসলাম।" আর ঈমান সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, সকল কিতাব, সকল রাসূল, পরকাল এবং তাকদীরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।"

উল্লেখযোগ্য যে, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এবং উপরোক্ত হাদীসে ঈমান ও ইসলামকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবৃত করলেও শরীআতের দিক থেকে উভয় এক ও অভিন্ন। কাজেই যে ব্যক্তি মু'মিন সে-ই মুসলিম, আবার যে ব্যক্তি মুসলিম সে-ই মু'মিন। এটা বলার কোন অবকাশ নেই যে, অমুক ব্যক্তি মু'মিন, মুসলিম নয়, অথবা অমুক ব্যক্তি মুসলিম, মু'মিন নয়।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক

ঈমানের মূল অর্থ আন্তরিক প্রত্যয়ন। আর ইসলাম বলতে বোঝায় মহান স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের কাছে বান্দার দাসত্বের আত্মসমর্পণ। বাস্তব ক্ষেত্রে এ দু'শব্দের পারস্পরিক সংযোগ অত্যন্ত গভীর। নিম্নে ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক তুলে ধরা হল-

এক ও অভিন্ন অর্থবহ

সাধারণত ঈমান ও ইসলাম একই অর্থ বহন করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ "যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক, তা হলে তাঁর ওপরই ভরসা কর, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক।" (সূরা ইউনুস ঃ ৮৪)

এখানে ঈমান ও ইসলামকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মু'মিন ও মুসলিম যেমন একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ, ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটোও তেমনি পারস্পরিক ভাববিনিময়ে সুপরিস্ফুট। কাজেই একথা বলার যেমন অবকাশ নেই যে, অমুক ব্যক্তি মুসলিম কিন্তু মু'মিন নয়। অর্থাৎ ঈমান ও ইসলাম মূলত একই বিষয়। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকদের অধিকাংশের মতই এটা যে, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন জিনিস। উভয়ের মাঝে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

ইসলামের সর্বোচ্চ সোপান ঈমান

ঈমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস ও প্রত্যয়। পারিভাষিক দৃষ্টিতে ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুসারে আমল করাকে ঈমান বলে। তাই ঈমান ইসলামের সর্বোচ্চ সোপান।

অবিচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

ঈমানের সাথে ইসলামের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই ইসলাম ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। ঈমান ছাড়া ইসলাম কল্পনা করা যায় না ; আবার ইসলাম ব্যতীত ঈমানের অস্তিত্ব বোঝা যায় না।

শিকড় ও কান্ডের সম্পর্ক

শিকড়ের সাথে গাছের কান্ড, শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-পল্লব ও ফুল-ফলের যে সম্পর্ক, ঈমানের সাথে ইসলামেরও সেরূপ সম্পর্ক।

ঈমান অন্তর্নিহিত চেতনা আর ইসলাম তার রূপায়ণ

গাছের শিকড় মাটির ভেতর থেকে খাদ্যরস যোগায়, তাতেই গাছের কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব ও ফুল-ফল সজীব ও সতেজ হয় ; তেমনি ঈমানও মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর ভালবাসা লাভের বাসনা সৃষ্টি করে, তাতেই ইসলাম সজীব ও সতেজ হয়ে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়।

ভিত্তি ও ইমারত সদৃশ

ঈমান হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর। এর ওপরই ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার গোটা ইমারত গড়ে উঠেছে। কাজেই ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক যে ওতপ্রোত ও সুনিবিড় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ঈমান অন্তরের আর ইসলাম বাইরের রূপ

কুরআনের কোন কোন আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক বিষয় নয়, এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন- قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا "বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল, তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।" (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৪)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক কর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের নাম, আর ঈমান হচ্ছে আন্তরিক স্বীকৃতি বা প্রত্যয়নের নাম।

একটি আরেকটির পরিপূরক

কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর কোন কোন হাদীস থেকে বোঝা যায় যে ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট এবং একটি অপরটির পরিপূরক। যেমন-

سئل رسول الله اى الاعمال افضل قال: الاسلام. فقال اى الاسلام افعل؟ فقال الايمان .

"একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন্ আমল শ্রেষ্ঠ ? তিনি বলেন, ইসলাম। আবার জিজ্ঞাসা করা হল কোন্ ইসলাম শ্রেষ্ঠ ? তিনি বলেন, ঈমান।" (আল-হাদীস)

এর দ্বারা বোঝা যায়- ঈমান ও ইসলাম একই জিনিস। একটি আরেকটির পরিপূরক।

ঈমান ইসলামের প্রবেশদ্বার

ইসলাম হল আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আর এ বিধানকে বিশ্বাস ও মেনে নেয়ার স্বীকৃতি এবং তদনুযায়ী আমল করার ঘোষণা হল ঈমান। ঈমানের ঘোষণা দিয়েই ইসলাম নামক প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়। কাজেই ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক প্রাসাদ ও তার প্রবেশদ্বার স্বরূপ। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তাকে ইসলামের মূল কালিমা- لا اله الا الله محمد رسول الله পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করতে হয়।

ঈমান এবং ইসলামের বিষয়সমূহ

ইসলামের বিষয় ব্যাপক। আর ঈমানের বিষয় হল- আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর, আখিরাত, পুনরুত্থান দিবস ইত্যাদি।

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামের প্রধান ও প্রথম মূল বিষয় হচ্ছে ঈমান। ইসলাম হল- অনির্দিষ্ট আর ঈমান নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয় এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতীব গভীর।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, ঈমান হল প্রত্যয়নের নাম। আর ইসলাম হচ্ছে গোটা জীবন ব্যবস্থার নাম। বাস্তব কার্যকরণের দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কাজেই যে ব্যক্তি মু'মিন সেই মুসলিম। আবার যে মুসলিম সেই মু'মিন। কেননা, ঈমান ও ইসলাম পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে একটি ব্যতীত অপরটির কথা কল্পনাও করা যায় না।

সারকথা

ঈমান ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু, ইসলামের মূল ভিত্তি। ঈমান বা বিশ্বাস হল ইসলামের মূল বিষয়, এর ওপর মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মের ফল নির্ভরশীল। মানুষের জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে তাঁর বিশ্বাসের ওপর। ঈমানের ওপরই ইসলামের গোটা প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। এর অভাবে ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ইসলামের অস্তিত্বই থাকে না। মোটকথা, মানুষ যা বিশ্বাস করে সেভাবেই জীবন পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়। এক কথায় বলা যায়, ঈমান প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সকল সৎকর্মের মূলভিত্তি। তাই মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দেখা যায়, ঈমান ও ইসলাম উভয় শব্দ এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো ভিন্নার্থে এবং কখনো উভয়কে সম্পূরক অর্থেও ব্যবহৃত থেকে দেখা যায়। তাই মনীষীগণ উভয় শব্দের সম্পর্ক-পার্থক্য নির্ণয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা শাব্দিক বিশ্লেষণ ও পার্থক্য মাত্র। নচেৎ উভয় শব্দই এক অভিন্ন বা একে অপরের পরিপূরক, উভয়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যিক কার্যাবলীর নাম ইসলাম, আর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের নাম ঈমান। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে জিবরাইল থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কেননা, জিবরীল (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- " আল্লাহর তাওহীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতে বিশ্বাস করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং হজ্জ পালন করার নাম ইসলাম।" আর ঈমান সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, সকল কিতাব, সকল রাসূল, পরকাল এবং তাকদীরে বিশ্বাস করার নাম ঈমান।"

উল্লেখযোগ্য যে, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এবং উপরোক্ত হাদীসে ঈমান ও ইসলামকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবৃত করলেও শরীআতের দিক থেকে উভয় এক ও অভিন্ন। কাজেই যে ব্যক্তি মু'মিন সে-ই মুসলিম, আবার যে ব্যক্তি মুসলিম সে-ই মু'মিন। এটা বলার কোন অবকাশ নেই যে, অমুক ব্যক্তি মু'মিন, মুসলিম নয়, অথবা অমুক ব্যক্তি মুসলিম, মু'মিন নয়।

ঈমানের মূল অর্থ আন্তরিক প্রত্যয়ন। আর ইসলাম বলতে বোঝায় মহান স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের কাছে বান্দার দাসত্বের আত্মসমর্পণ। বাস্তব ক্ষেত্রে এ দু'শব্দের পারস্পরিক সংযোগ অত্যন্ত গভীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

ক. রাসূল (সা)- এর নিকট প্রশ্নকারী ব্যক্তি কে ছিলেন?
খ. 'যাকে প্রশ্ন করা হচেছ তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী অবগত নন'- এ উক্তি কার?
গ. দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয়বার সালাত কায়েম করতে হয়?
ঘ. হাদীসে ঈমানের কয়টি শাখার কথা বর্ণিত হয়েছে?
ঙ. হিজরত কয় প্রকার?
চ. হাদীসে প্রকৃত ঈমানদারের কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে?

সঠিক উত্তরে টিক্ দিন

১. আগন্তুক ব্যক্তি ছিলেন-
ক. মহানবী (সা) খ. হযরত জিবরীল (আ.) গ. হযরত আবু বকর (রা.) ঘ. হযরত আলী (রা.)।

২. ইসলাম কয়টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?
ক. ৫টি খ. ৪টি গ. ৩টি ঘ. ৭টি।

৩. ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হচেছ-
ক. রিসালাতের উপর বিশ্বাস করা খ. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা
গ. আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৪. 'হায়া' শব্দের অর্থ হল-
ক. হায়াত খ. লজ্জা গ. হারাম ঘ. হাইউন।

৫. "প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করাই বড় জিহাদ"- এ উক্তি কার?
ক. মহানবী (সা)-এর খ. ইমাম বুখারী (র.) এর গ. আল্লাহ তায়ালার ঘ. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর।

৬. ঈমান মানব চরিত্রকে-
ক. সন্ত্রাসী করে তুলে খ. নম্র ও বিনয়ী করে গ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে ঘ. খ ও গ-এর উত্তর সঠিক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের ৫টি বুনিয়াদী বিষয় সংক্ষেপে লিখুন।
২. ঈমানের উচ্চ ও নিম্ন শাখার বর্ণনা দিন।
৩. হাদীসের আলোকে 'হায়া' বা লজ্জা সম্পর্কে লিখুন।
৪. হিজরত শব্দের অর্থ লিখুন। হিজরত কত প্রকার ও কী কী?
৫. প্রকৃত মুমিনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা হাদীসের আলোকে উল্লেখ করুন।
৬. ব্যাখ্যা করুন, 'ঈমান মনোবল ও সাহস সঞ্চার করে'।
৭. ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কের কয়েকটি দিক তুলে ধরুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুবাদ করুন।
২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করুন।
৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করুন।
৪. ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৫. ঈমান ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য নিরূপণ করুন।

পাঠ ঃ ৩

ইলম সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইলম বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে তা বলতে পারবেন
- ইলম অর্জনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- লোক দেখানো কাজের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ইলম উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে বলতে পারবেন
- ফকীহ'র মর্যাদা তুলে ধরতে পারবেন।

ইলম -এর পরিচয়

আরবীতে ইলম শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিশ্বাস, কোন জিনিসকে তথ্যসহকারে জানা ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন হাদীসে ইলম অর্থ প্রধানত সেই জ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে- যা মহানবী (স) -এর মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে এবং যা মানুষের বুদ্ধি আবিষ্কার করতে পারেনি। (ইমাম গায্যালী রঃ) অর্থাৎ যে ইলম মানুষের মধ্যে তাওহীদের প্রেরণা জাগায় এবং আল্লাহভীতির সঞ্চার করে। আল্লাহ বলেন-

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং ফিরিশ্তাগণ এবং জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ.

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা আল-ফাতির : ২৮)

উপরোক্ত আয়াত দু'টি থেকে বোঝা যায় যে, তাওহীদে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহকে ভয় করা ইলমের বিশেষ গুণ। সুতরাং যে ইলমের এই গুণ নেই সে ইলম নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করা বা তজ্জন্য লোকদের উৎসাহিত করা নবী-রাসূলগণের কাজ ছিল না। নবী-রাসূলগণের আসল কাজ ছিল আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দারা কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা যার সম্পর্কে মানুষ সাধারণত সজাগ নয়। দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্যে যে সমস্ত ইলমের বা জ্ঞানের প্রয়োজন সে সব সম্পর্কে মানুষ নিজেরাই সজাগ। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নবী-রাসূলের কর্মের মাধ্যমে এবং ইলমে লাদুন্নীর মাধ্যমে তা মানুষকে দান করেছেন।

ইলম দুই প্রকারে লাভ থেকে পারে- (১) চর্চা বা শিক্ষার দ্বারা। একে ইলমে হুসুল বা অর্জনকৃত (কছবী) ইলম বলে এবং (২) জ্ঞানের উৎস আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি দানের দ্বারা -একে ইলমে ওহী বলে। এ ইলমে ওহী আবার দু'প্রকারের থেকে পারেঃ (১) ফেরেশ্তা মারফত ওহী দ্বারা। এর নাম ইলমে নববী বা ইলমে নুবুওয়াত এবং (২) ইলহাম দ্বারা। ইলহাম অর্থ কোন জিনিসের জ্ঞান অন্তরে ঢেলে দেয়া -এর নাম ইলমে লাদুন্নী। এটা নবী এবং ওলী উভয়েরই লাভ থেকে পারে; কিন্তু ওহীর ইলম নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট, পক্ষান্তরে ইলহাম, এরূপ নয়। সুতরাং ওহী যে ইলহাম থেকে উত্তম তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। নবী রাসূলের ইলহাম ব্যতীত কারও ইলহাম কারো পক্ষে শরীআতের দলীল থেকে পারে না। কতক ইলম শিক্ষা করা ফরয। ফরয আবার দুই প্রকার। (১) ফরযে আইন, যে সকল ইলম অর্জন (জ্ঞান) প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে আবশ্যক, যথা- ঈমান, সালাত ও সাওম প্রভৃতির ইলম। বালেগ হওয়ার পরই প্রত্যেকের পক্ষে প্রথমে কালিমা ও ঈমান সম্পর্কীয় জরুরী বিষয়গুলির ইলম অর্জন করা ফরয। অতঃপর যখনই দ্বীনের যে বিষয়ের আবশ্যক হবে তখনই সে বিষয়ের ইলম লাভ করা ফরয। এর প্রতি ইঙ্গিত করে মহানবী (স) বলেছেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।" এবং (২) ফরযে কেফায়া। যার ইলম সকলের মধ্যে কতক লোকের শিক্ষা করলেই চলে; যথা- কুরআন হাদীস থেকে আহ্কাম বের করার (এস্তেমবাৎ) উদ্দেশ্যে কুরআন হাদীসের গভীর ইলম লাভ করা। এছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে যে সকল বিদ্যার প্রয়োজন তা অর্জন করাও ফরযে কিফায়া। যথা- চিকিৎসা বিদ্যা ও আবশ্যক শিল্প বিদ্যা। দ্বীনের কতক ইলম আবার মোস্তাহাব। যথা- সময় ও সুযোগ থাকলে আবশ্যকতা দেখা দেয়ার পূর্বেই দ্বীনের যাবতীয় ইলম অর্জন করে রাখা। পক্ষান্তরে কতক বিদ্যা এমন আছে যা শিক্ষা করা হারাম। যথা- যাদু বিদ্যা, ভোজবাজি এবং যে সমস্ত বিদ্যা বা যেসমস্ত বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং মানুষকে হারামের প্রতি প্রলুব্ধ করে। আর যে বিদ্যার এরূপ খারাব ভালো কোন গুণ নেই তা অবশ্যই মোবাহ।

ইলমের মর্যাদা ও উপকারিতা সম্পর্কে কুরআনের বহু আয়াতে বহু ইংগিত রয়েছে। এ পাঠে ইলম সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস আলোচনা করা হয়েছে।

ইলমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغوا عنى ولو اية، وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار- رواه البخا رى

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন: আমার পক্ষ থেকে মানুষকে পৌঁছাতে থাক যদিও একটি মাত্র 'আয়াত' হয়। বনি ইসরাইলের নিকট থেকে শোনা কথা বলতে পার, এতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার বাসস্থান দোযখে প্রস্তুত করে নেয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা

কুরআনের প্রচার অত্যাবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহ স্বয়ং কুরআনের হিফাযতের বার গ্রহণ করা সত্ত্বেও যখন কুরআনের প্রচারের কথা বলা হয়েছে তখন হাদীসের প্রচারের কথা সহজেই বোঝা যায়। আর কারো কারো মতে "আয়াত" অর্থ এখানে কথা এবং বাক্য- আর তা কুরআনের হোক বা হাদীসের।

বনী-ইসরাইলের কথা অর্থে এখানে তাদের উপদেশমূলক ঘটনাসমূহকে বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে- তাদের কথা শুনতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মর্ম হচ্ছে, তাদের শরীআতের যে সকল আহ্কাম আমাদের শরীআতের বিপরীত। কারণ তাদের শরীআত আমাদের শরীআত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরি করে বলা জঘন্যতম অপরাধ। আর কারো মতে এটা পরিষ্কার কুফ্রী, কারণ শরীআতের অবিকৃতি ও বিশ্বস্ততা নির্ভর করে হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ততার উপর। এক্ষেত্রে সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শিত হলেও অবিকৃত অবস্থায় শরীআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নামে মিথ্যা বর্ণনাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের সমাবেশে বার বার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব ও মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কথা বলে, যা সম্পর্কে সে মনে করে যে, এটা মিথ্যা, সে মিথ্যুকদের একজন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। আমি নিছক বন্টনকারী, আর দান করেন আল্লাহই।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আরো বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি দ্বীনের যে সকল কথা লাভ করেছি তা তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি মাত্র। কিন্তু এটা বোঝার ক্ষমতা আল্লাহই দান করেন- কাউকে অল্প, কাউকে বিস্তর। 'সুষ্ঠু জ্ঞান'- মূলে 'ফিকহ' শব্দ রয়েছে-যার অর্থ সুষ্ঠু জ্ঞান, মেধা, জানা বিষয়ের সাহায্যে অজানা বিষয় সম্পর্কে জানা। পরবর্তী কালে ইসলামী আইন শাস্ত্রই ফিকহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং ইসলামী শরীআতের সকল বিষয়ের আহকাম নির্দেশ রয়েছে। মহানবী (স) মানুষকে সোনার খনির সাথে তুলনা করে বলেছেন-

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس معادن كمعادن الذهب والفضة' خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا رواه مسلم-

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: মানবজাতি সোনা রূপার খনিরাজির ন্যায়। যারা (যে গোত্র) জাহিলিয়া যুগে উত্তম ছিলেন তারা ইসলামী যুগে উত্তম যখন দীনের জ্ঞান লাভ করেন। -(মুসলিম)

ব্যাখ্যা

ধাতুর খনি যেমন বিভিন্ন হয়ে থাকে; কোনটি সোনার, কোনটি রূপার অর্থাৎ কোনটি উৎকৃষ্ট আর কোনটি কম উৎকৃষ্ট আবার কোনটি নিকৃষ্ট ধাতুর, মানুষের গোত্র মর্যাদারও তেমনি বিভিন্ন হয়ে থাকে। ইসলাম মানুষের এ গোত্র মর্যাদাকে তখনই স্বীকৃতি দেয় যখন সে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। ইসলামে মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি হল দ্বীনের জ্ঞান ও আল্লাহভীতি। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ -

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত:১৩)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: দু'ব্যক্তি ব্যতীত কেউ হাসাদের (ঈর্ষার) পাত্র নয়ঃ প্রথম ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ দান করেছেন এবং সংগে সংগে তাকে তা সত্যের খাতিরে বা সৎ কার্যে ব্যয় করার জন্য প্রচুর মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে- যাকে আল্লাহ তা'আলা 'জ্ঞান দান করেছেন' আর সে তাকে কাজে লাগায় এবং লোকদের তা শিক্ষা দেয়।

হাসাদ

'হাসাদ'- এর অর্থ অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়ে নিজের নিকট আসার আকাঙ্খা করা, এক কথায় পরশ্রীকাতরতা। এটা জায়িয নয়। অন্যের সম্পদ নষ্ট না হয়ে তদনুরূপ সম্পদ নিজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বলে 'গিব্‌তা'। গিব্‌তা জায়িয। সুতরাং যদি 'হাসাদ' জায়িয হত তা হলে এ দু ব্যক্তির প্রতি 'হাসাদ' করা উচিত হত। আর কেউ কেউ বলেন- 'হাসাদ' এখানে 'গিব্‌তা' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'হিকমত' - অর্থ বিচার, ইলম, দানশীলতা, বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা, সত্য বিচার ও বিজ্ঞান। কুরআনের সূরা ইস্‌রায় আল্লাহ্ তা'আলা আহ্‌কাম বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, মা বাপের খিদমত করবে, তাদের কষ্ট দিবে না, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন এবং পথিকদের হক আদায় করবে, অপব্যয় করবে না, ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, অন্যায়ভাবে কাউকেও বধ করবে না, ইয়াতীমের মাল খাবেনা। ওয়াদা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, বেচা বিক্রিতে ঠিকভাবে মাপ দেবে, ভাল করে না জেনে কোন কথা বলবে না এবং চলাফেরায় দাম্ভিকতা প্রকাশ করবে না। (সূরা ইসরা ২২-৩৯) অতপর আল্লাহ বলেছেন-

ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة-

"এ সমস্ত কথা হচ্ছে হিকমতের কথা যা তোমার প্রতি তোমার রব ওহী করেছেন।" হাদীসেও এটা ইলমে দীনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হাদীসটি এ অধ্যায়ে আনা হয়েছে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة : الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله- رواه مسلم

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল ও তার সওয়াব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমলের মাধ্যমে তাদের সওয়াব বন্ধ হয় না ঃ (১) সাদকায়ে জারিয়া, (২) এমন ইলম - যার দ্বারা (লোকের) উপকার সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান যে- তার জন্য দু'আ করে। -(মুসলিম)

ব্যাখ্যা

'সাদকায়ে জারিয়া অর্থাৎ সৎকাজে দান যার ফল জারী বা প্রবহমান থাকে। যথা- রাস্তা, ঘাট, পুল, মসজিদ মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, মুসাফিরখানা নির্মাণ কূপ খনন ইত্যাদি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার একটি ক্ষুদ্র কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিনের তার একটি বিরাট কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের একটি অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দেবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব সহজ করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে (তার দোষ ও দেহকে) ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে (তার দোষ বা দেহকে) ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার সাহায্যেরত থাকেন যতক্ষণ সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা ইলমের দ্বারা তার বেহেশতের একটি পথ সহজ করে দেবেন এবং যখনই কোন একটি দল আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পর তার আলোচনা করতে থাকে তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ থেকে আরম্ভ করে। আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেন তাঁর নিকট যারা আছেন (ফেরেশতাগণ) তাঁদের সম্পর্কে তাদের নিকট। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد- رواه الترمذى وابن ماجة

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: একজন ফকীহ (আলিম) শয়তানের পক্ষে হাজার আবেদ অপেক্ষাও মারাত্মক। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

কোন কোন সময় শয়তান হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে আসে, সে নামাযীকে বলে- চেষ্টা করে হুজুরে কলব হাসিল করতে পারলে না; হুজুরে কলব ব্যতীত তোমার এ নামাযে লাভ কি? এটা তো প্রাণহীন লাশতুল্য। খোদার এতে কি কোনো কাজ আছে? সুতরাং এটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আলিম ব্যতীত কোন লোক সহজে এটা ধরতে পারে না। কিন্তু আলিম ব্যক্তি বলে- যাক্, কিছুই না হওয়া অপেক্ষা কিছু হওয়াই ভালো। আর আমার যা ক্ষমতা তা আমি করেছি; বাকি আল্লাহর কাজ। এ কারণেই শয়তান আলিমকে এত ভয় করে এবং মানুষকে নানা রকমের ধোকা ও প্রলোভন দিয়ে ইলম থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

রিয়াকারীর পরিণতি

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- কিয়ামতের দিন রিয়াকারদের মধ্যে প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাঁকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তাকে প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত আপন নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন- তুমি এ নি'আমতসমূহের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে উত্তর করবে, আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি কাফিরদের সাথে লড়াই করেছি, এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছ- তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করনি; বরং তুমি এজন্য লাড়াই করেছিলে যাতে তোমাকে 'বীর পুরুষ' বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে ফেরেশতাদের আদেশ দেয়া হবে। তখন তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করেছে, অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং নিজে কুরআন পড়েছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে, তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে আপন নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন- তুমি এ সকল নি'আমতের শোকরিয়ায় কি করেছ? সে জওয়াব দেবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা

দিয়েছি এবং তোমাকে খুশী করার জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছিলে যাতে তোমাকে 'আলিম' বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে কারী (পড়নেওয়ালা) বলা হয় আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাদের তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি- যার রিযক আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং দান করেছিলেন তাকে সমস্ত রকমের ধন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাকে আপন নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্মরণ করবে। অতপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন- তুমি এসবের কৃতজ্ঞতায় কি করেছ? জওয়াবে সে বলবে- এমন কোন রাস্তা বাকি ছিল না যাতে দান করলে তুমি খুশী হবে, আর আমি তাতে তোমার খুশীর জন্য দান করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন- তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি এ উদ্দেশ্যে তা করেছিলে যাতে বলা হয়, তুমি একজন দানবীর। আর তা বলা হয়েছে। অতপর ফেরেশতাদের তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।- মুসলিম।

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলাম মানুষকে জ্ঞানার্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এরূপ কোন জ্ঞানের মর্যাদা ইসলাম দেয় না যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে অর্জিত না হয়। প্রকৃত পক্ষে জাগতিক কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা আল্লাহর পছন্দ করেন না। আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা তাই জানতে পারি।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذا الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا- متفق عليه-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : (শেষ যামানায়) আল্লাহ তা'আলা ইলম উঠিয়ে নেবেন তার বান্দাদের (অন্তর) থেকে টেনে বের করে; অর্থাৎ আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার দ্বারাই ইলম উঠিয়ে নেবেন; অবশেষে যখন তিনি (দুনিয়ার) কোন 'আলিমকেই বাকি রাখবেন না তখন লোক অজ্ঞ-জাহেলদের নেতারূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট মাসআলা মাসায়িল জিজ্ঞেস করা হবে। আর তারা মূর্খ অবস্থায়ই ফাতওয়া দেবে, ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে। -(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদীসে মহানবী (স) ইলম উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন। একদা নবী করীম (স) আকাশের দিকে দৃষ্টি করে বললেন। মানুষের নিকট থেকে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি মানুষ ইলম সম্পর্কে কিছু জানবে না তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! ইলম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন পড়ি এবং আমাদের সন্তানদের পড়াই, এভাবে এর ধারা অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এভাবে তা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। তখন মহানবী (স) সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে যিয়াদ! আমি তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী মনে করতাম। তুমি কি দেখ না, ইয়াহূদীরা তাওরাত কিতাব পাঠ করে এবং খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে, অথচ তারা এর মধ্যে কি আছে তা জানে না। অর্থাৎ তারা তাওরাত এবং ইঞ্জিল না বুঝে পাঠ করে। এতে কোনই উপকার হয় না। বরং এটা তোতা পাখীর মতো বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। ইলম উঠিয়ে নেয়ার অর্থ হল আলিমদের উঠিয়ে নেয়া। তাই ইলম হাসিল করা প্রত্যেকের কর্তব্য। কারণ, কেউ জানে না যে, কখন সে তার মুখাপেক্ষী হবে অথবা তার নিকটবর্তী বস্তুর মুখাপেক্ষী হবে। পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা ইলমকে পেছনে ঠেলে দেবে। ইলম শিক্ষার প্রতি কোন গুরুত্বই প্রদান করবে না। তারা মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করবে অথচ কুরআন-হাদীসের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তখন মানুষ বিদআতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের মতো দূরে সরে পড়বে। আর মুসলমানদের মধ্য থেকে আলিম উলামা লোপ পাবে। এমনকি কোন আলিম উলামা জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় মানুষ ইসলামকে জানতে চেষ্টা

করবে। মাসআলা-মাসায়িল জানার প্রয়োজন পড়বে। আলিম উলামা অবশিষ্ট না থাকায় মুর্খ ও জাহিল ব্যক্তিরা সে স্থান দখল করে নেবে এবং তারা ফাতওয়া প্রদান করবে। এতে নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে। তাই সকল যুগে ইলমকে চালু রাখার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে একদলকে ইলম শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং তারা ইলম অর্জন করে স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান করবে। নতুবা ইয়াহূদী-নাসারাদের মতোই আমাদের ইলমের অবস্থা হবে।

হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট দুজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিলেন আবিদ (সাধক) আর অপরজন ছিলেন আলিম। এ দু'জনের মধ্যে কার মর্যাদা বেশী? মহানবী (স) বললেন- আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা আমার মত একজন নবীর ফযীলত তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আল্লাহ তা'আলা, তার ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা- এমন কি পিপীলিকা তার গর্তে থেকে আর সমুদ্রের মাছ পানিতে থেকে যে ব্যক্তি মানুষকে (ভালো কথা) ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকে তার জন্য দু'আ করে। (তিরমিযী)।

কিন্তু দারেমী (র) মাকহুল থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথম দু'ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি এবং তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "আবিদের তুলনায় আলিমের মর্যাদা যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা। অতঃপর মহানবী (র) এ কথা প্রমাণের জন্য কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

انما يخشى الله من عباده العلماء

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাকে বেশী ভয় করে"। এ ছাড়া তিনি হাদীসের বাকি অংশ ইমাম তিরমিযী (র) -এর ন্যায় বর্ণনা করেন।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন : আমার পর লোক তোমাদের অনুসরণকারী হবে। দিক দিগন্ত থেকে লোক তোমাদের নিকট দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তাদের সদুপদেশ বা দ্বীনের তালীম দেবে।-তিরমিযী

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو احق بها. رواه الترْمذى وابن ماجة.

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন, অপর বর্ণনায়- মুমিনের হারানো ধন। সুতরাং যেখানে তা যার নিকট পাবে সে তার অধিকারী।" -(তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

কেউ কারো হারানো জিনিস পেলে যেমন তার পক্ষে তা গোপন করা বা মালিকের দাবি করার পর তা আটকে রাখার অধিকার নেই, তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তির নিকট যদি কোন জ্ঞানের কথা থাকে তার পক্ষেও তা গোপন করা বা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির চাহিদার পর তা আটকে রাখার অধিকার নেই। তা জ্ঞানী ব্যক্তিরই জিনিস। এরূপে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষেও কোন জ্ঞানের কথা তার অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানীকে সরবরাহ না করার অধিকার নেই। কারণ তিনি হয়ত তার দ্বারা এমন কথা আবিষ্কার করতে পারবেন যা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

হাদীসের এ অর্থও থেকে পারে যে, হারানো জিনিস প্রাপকের পক্ষে যেমন মালিককে তালাশ করে তা দেয়া ওয়াজিব তেমনিভাবে অ-জ্ঞানীর নিকটও কোন জ্ঞানের কথা থাকলে তা জ্ঞানী ব্যক্তিকে তালাশ করে দেওয়াই ওয়াজিব। তিনি তার অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন

১. ইল্‌ম শব্দের অর্থ হচ্ছে-

ক. কুরআন খ. হাদীস
গ. জ্ঞান ঘ. সাধনা করা

২. ইলমের বিশেষ গুণ হচ্ছে-

ক. তাওহীদে বিশ্বাস ও আল্লাহকে ভয় করা খ. রিসালাতে বিশ্বাস করা
গ. কুরআন-হাদীস শুদ্ধভাবে পাঠ করা ঘ. সুন্নাতের অনুসারী হওয়া

৩. ফরয কয় প্রকার ?

ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

৪. ইসলামে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কোনটি?

ক. জীবন যাপনে মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করা খ. দ্বীনের জ্ঞান ও আল্লাহভীতি
গ. ইসলামী পোশাক পরিধান করা ঘ. উচ্চ বংশীয় হওয়া

৫. ক'টি কাজ সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে স্বীকৃত?

ক. পাঁচটি খ. দু'টি
গ. তিনটি ঘ. চারটি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইল্‌ম বলতে কী বোঝায়? লিখুন।
২. ইল্‌ম-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
৩. ইল্‌ম-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. সাদকায়ে জারিয়া সম্পর্কিত হাদীসটির অনুবাদ করুন।
৫. রিয়া বলতে কী বোঝায়? রিয়াকারীর পরিণতি হাদীসের আলোকে লিখুন।
৬. "ইল্‌ম মুমিনের হারানো ধন" ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ইল্‌ম বলতে কী বুঝেন? ইল্‌মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আলিমের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসের আলোকে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ৪

পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ-তা বলতে পারবেন
- সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ করতে পারবেন
- প্রস্রাব-পায়খানা থেকে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এবং পবিত্রতা অর্জন না করলে করা আযাবের কারণ তা বলতে পারবেন;
- ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

عن ابى مالك الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملاء الميزان وسبحان الله والحمد الله تملاءان او تملا ما بين السموت والارض. والصلوة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك او عليك وكل الناس يغد و فبائع نفسه فمعتقها . او موبقها. (مسلم)

হযরত আবূ মালিক আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন: পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আর 'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্যটি আমলের পাল্লা পূর্ণ মাত্রায় ভরে দেয়, 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বাক্যদ্বয় পূর্ণ করে দেয় আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে। আর সালাত হল জ্যোতি, সাদকা হল অনস্বীকার্য দলীল, ধৈর্য হল আলো এবং কুরআন হল তোমার পক্ষের প্রমাণ অথবা তোমার বিরুদ্ধে দলীল। প্রত্যেক মানুষেরই সকাল হয়, পরে সে নিজের সত্তারই বেচা-কেনা করে। অতঃপর সে হয় তাকে (নিজকে) মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে, নতুবা তাকে (নিজকে) সে ধ্বংস করে দেয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

হাদীসটি মূলত নবী করীম (সা)-এর একটি ভাষণ। এতে ইসলামের কয়েকটি মূলনীতি সন্নিবেশিত রয়েছে বিধায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও এ হাদীসে অন্যান্য মৌল বিষয় রয়েছে তবুও পবিত্রতা ও পরিস্কার পরিচছন্নতার দলীল হিসেবে এখানে হাদীসটি গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা হাদীসের প্রথম বাক্যটিই পবিত্রতা বা তাহারাত সম্পর্কিত বিধান যা হাদীসের কিতাবসমূহে 'তাহারাত' পর্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীসে বর্ণিত طهور - অর্থ পবিত্রতা অর্জন।

হাদীসের শব্দ شطر - অর্থ অর্ধেক। ইমাম তিরমিযী অপর একজন সাহাবী থেকে অন্য ভাষায় এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তা ভাষা হল ঃ

الطهور نصف الايمان.

"পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।"

মূলত شطر ও نصف শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। আর উভয় ধরনের বর্ণনায় হাদীসের অর্থ হল, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

হাদীসে পবিত্রতাকে 'ঈমানের অর্ধেক' বলা হয়েছে। পবিত্রতার যা সওয়াব তা ঈমানের সওয়াবের অর্ধেক পরিমাণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বলা হয়েছে, ঈমান যেমন পূর্ববর্তী সব ভুলত্রুটি ও গুনাহ্ খাতা দূর করে দেয়, ওযূও অনুরূপ কাজ করে। তবে এটা ঈমান ব্যতিরেকে বৈধতা লাভ করে না। এটা যেহেতু ঈমানের উপর নির্ভরশীল, এ কারণে এটা 'ঈমানের অর্ধেক' হওয়ার সমার্থবোধক বলা হয়েছে। এখানে 'ঈমান' বলে 'সালাত'কে বোঝানো হয়েছে। আর 'তাহারাত'-

পবিত্রতা হল সালাত শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্ত। ফলে, এটা ঈমানের অর্ধেকের সমান। আর شطر শব্দ বললে যে শাব্দিক অর্থে পুরাপুরি 'অর্ধেক'ই থেকে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। ইমাম নববীর মতে এ জবাবটি অধিক গ্রহণযোগ্য। ইমাম তুরপুশতী বলেছেন, 'ঈমান' হল শিরক্ থেকে পবিত্রতা, যেমন 'তহুর' হল ওযূহীন অবস্থা থেকে পবিত্রতা লাভ। ফলে, এ দু'টি-ঈমান ও তাহারাত-উভয়ই পবিত্রতার ব্যাপার। উহাদের একটি মানুষের অভ্যন্তরীণ দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর দ্বিতীয়টি বহিরাঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইমাম গাযালীর বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে, 'তাহারাত' বা পবিত্রতার চারটি পর্যায় রয়েছে ঃ (ক) বাহ্যিক দিক অপবিত্রতা ও ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্রকরণ। (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পাপ-গুনাহ ও অপরাধ থেকে পবিত্রকরণ। (গ) খারাপ ও ঘৃণ্য চরিত্র থেকে অন্তরকে পবিত্রকরণ এবং (ঘ) আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে মন, অন্তর ও হৃদয়কে পবিত্রকরণ। সকল নবী-রাসূল এবং বিশ্বাসীগণের পবিত্রতার এটাই হল মূল কথা। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে 'তাহারাত' যেমন হল অর্ধেকটি কাজ। প্রত্যেকটি পর্যায়ে বর্জন ও ত্যাগ আছে, তেমনি আছে গ্রহণ ও অলংকরণ। এ হিসেবে বর্জন হল অর্ধেক আমল। কেননা, অপর অংশ এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর নির্ভুল পরিচিতি ও তাঁর মহব্ব হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু হৃদয় মন থেকে বিদায় গ্রহণ না করবে। কেননা কারো হৃদয়ে এ দুটি কখনো একত্রিত থেকে পারে না। অনুরূপভাবে হৃদয়-মন থেকে খারাপ চরিত্র ও পংকিল মানসিকতার বিলীন হওয়া অতঃপর এর উত্তম ও মহান চরিত্রগুণে অভিষিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর প্রথমে পাপ থেকে মুক্তি লাভ এবং পরে আল্লাহর আনুগত্যের গুণে অলংকৃত হওয়া আবশ্যক।

অতএব, বহিরাঙ্গের পবিত্রতার পর আত্মার (روح) পবিত্রতা, এর পর হৃদয়ের (قلب) পবিত্রতা এবং সর্বশেষে অন্তরলোকের গভীর গহনের পবিত্রতা বাঞ্ছনীয়। একারণে 'তাহারাত' বলতে কেবল বহিরাঙ্গের পবিত্রতাকে যথেষ্ট মনে করা মূলতই ভুল। কেননা, তাতে এ পবিত্রতার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলার সমূহ আশংকা রয়েছে।

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها ولا يستطب بيمينه و كان يأمر بثلاثة احجار و ينهى عن الروث والرمة. (رواه ابوداؤد ,ابن ماجة, والدارمى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ আমি তোমাদের জন্য পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছি। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে তখন যেন কিবলামুখী হয় এবং কিবলাকে পিছনে ফেলে না বসে। কেউ যেন তার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা লাভের কাজ না করে। এজন্য তিনি তিন খন্ড পাথর ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

ব্যাখ্যা

প্রকৃতিগত কারণে প্রস্রাব-পায়খানা করা মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রস্রাব-পায়খানা করলে মানুষের শরীর নাপাক হয়, সালাত আদায় করার উপযুক্ত থাকে না। কাজেই একদিকে যেমন পায়খানা প্রস্রাবের জন্য শরীয়তসম্মত নিয়ম জানতে হবে তেমিনি জানতে হবে তজ্জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসটির শুরুতেই এ শিক্ষাদানের ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মতের মুকাবিলায় রাসূলে করীম (সা)-এর সঠিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের পিতার মত।' এ কথাটি দ্বারা রাসূলের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, যেন মুসলমানরা তাঁর নিকট তাদের দ্বীনী ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা না পায়। ঠিক যেমন পুত্র পিতার নিকট নিজের কোন অসুবিধার কথা বলা থেকে নিছক লজ্জার কারণে বিরত থাকে না, এখানেও ঠিক তেমনি। এখানে পিতা-পুত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে নবী করীম (সা) প্রসঙ্গত একথাটিও স্পষ্ট করে তুললেন যে, পিতার কর্তব্য হল সন্তানদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং সন্তানের

কর্তব্য হল তা গ্রহণ ও পালন করা। সন্তানের কর্তব্য যেমন পিতার আদেশ-নিষেধ-উপদেশ পালন করে চলা, তেমনি সর্বসাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হল রাসূলের কথা মেনে চলা। আর রাসূলের (সা) কর্তব্য হল-উম্মাতকে সঠিক শিক্ষাদান করা।

এ হাদীসে পায়খানা-প্রস্রাবের উদ্দেশ্যে বসা ও এ থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হাদীসের মূল শব্দ غائط অর্থ নিচু স্থান। পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য বসার উদ্দেশ্যে সাধারণত নিচুস্থান নির্ধারণ করা হয় বলে এ শব্দটি পায়খানা-প্রস্রাব করার স্থান এবং পায়খানা প্রস্রাব করা এ উভয় অর্থ প্রকাশ করে। হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের কেউ যখন প্রস্রাব-পায়খানায় বসবে তখন যেন কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলাকে পিছনে ফেলে না বসে। কেননা, 'কিবলা' বিশেষভাবে নামাযের জন্য একটি পবিত্র দিক। সে দিকেই আল্লাহর ঘর-কাবা শরীফ অবস্থিত। প্রস্রাব-পায়খানার দুর্গন্ধময় ও নাপাক আবর্জনাপূর্ণ স্থানে কিবলার মুখামুখি হয়ে বসা বা একে পিছনে ফেলে বসা অত্যন্ত বেয়াদবীমূলক কাজ। সে কারণে রাসূলে করীম (সা)-এর এ নিষেধ বাণী। উন্মুক্ত স্থান হোক কিংবা প্রাচীর বেষ্টিত স্থান প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় এ নিষেধ সর্বত্রই পালনীয়।

'ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা লাভের কাজ করবে না' অর্থাৎ পায়খানা বা প্রস্রাব করার পর এর ময়লা পরিষ্কারের কাজে ডান হাত ব্যবহার করা নিষেধ। কেননা ডান হাতখানা বিশেষভাবে পানাহার ও অন্যদের সাথে মুসাফাহা ইত্যাদি কাজের জন্য নির্দিষ্ট। আর বাম হাত দেহের নিম্নাংশের কাজে এবং ময়লা আবর্জনা ও অপবিত্রতা বিদূরণের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

পায়খানা করার পর ময়লা সাফ করার জন্য নবী করীম (সা) সাধারণত তিনখানা পাথর খন্ড ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে- নবী করীম (সা) আরব দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং আরব দেশ হল ঊষর-ধূষর মরুভূমি। সেখানে সর্বত্র পানি এবং মাটি পাওয়া কঠিন। তাই জনসাধারণের পক্ষে এসব ক্ষেত্রে প্রস্তরখন্ড ব্যবহার না করে কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রস্রাব-পায়খানার ময়লা থেকে পবিত্র হওয়ার এটাই একমাত্র ও সর্বত্র ব্যবহার্য উপায় নয় এবং নবী করীম (সা)-ও সব সময় প্রস্তরখন্ড দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করতেন এমন কথাও নয়। এজন্য তিনি নিজে পানিও ব্যবহার করতেন। এ পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি অকাট্য প্রমাণ। তিনি বলেছেন ঃ

كان النبى صلى الله عليه و سلم: اذا اتى الخلاء اتيته بماء فى تور او ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضأ. (رواه ابوداؤد. وروى الدارمى والنسائى)

নবী করীম (সা) যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি তার জন্য একটি পাত্রে পানি নিয়ে এগিয়ে যেতাম। তিনি এর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করে পবিত্রতা লাভ করতেন। পরে তিনি তাঁর হাত মাটির উপর ঘষতেন। এর পর আমি তাঁর জন্য অপর এক পাত্রে করে পানি নিয়ে আসলে তিনি এর দ্বারা ওযূ করতেন। (আবু দাউদ, দারিমী, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা

প্রস্তর খন্ড কিংবা শুষ্ক মাটি দ্বারাই যে পায়খানা-প্রস্রাব পরিষ্কার করতে হবে, এমন কোন শর্ত ইসলামী শরীঅতে নেই। তবে নবী করীম (সা) নিজে পায়খানা প্রস্রাবের পরে ঢিলা/কুলূখ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন। এরপর অধিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য তিনি হাত মাটিতে ঘষেছেন। মাটিতে ঘষে কিংবা সাবান জাতীয় পদার্থ দ্বারাও হাত ধৌত করা যেতে পারে। ইবনে হাজার আল-আসকালানী 'ইস্তিঞ্জা' বা 'পায়খানা-প্রস্রাবের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করে পবিত্রতা অর্জনের' এ পদ্ধতিকেই 'সুন্নাত' বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, প্রস্রাব-পায়খানা করার পর এর ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কেবল পানি ব্যবহার করা এবং পানি ব্যবহারের পূর্বে কোন পাথরখন্ড কিংবা শুষ্ক মাটির ঢেলা ব্যবহার করা আল্লাহর নিকটও অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। কুবাবাসী তা-ই করতেন বলে কুরআন মাজীদে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। কেননা পূর্ণ মাত্রায় ময়লা পরিষ্কার করা ও পবিত্রতা অর্জন করা কেবল পানি দ্বারাই সম্ভব। এ কারণে এ কাজে শুষ্ক গোবর কিংবা হাড় ব্যবহার করতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এর সাহায্যে প্রকৃতভাবে ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

পায়খানা-প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব

عن ابن عباس قال: مر النبى صلى الله عليه و سلم بقبرين فقال اما انهما ليعذبان و ما يعذبان فى كبير اما احدهما فكان لا يستتر. وفى رواية مسلم: لا يستنزه من البول و اما الاخر فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله. لم صنعت هذا . فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. (بخارى. مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন- এ কবরদ্বয়ে সমাহিত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। আর তেমন কোন বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট-খাটো গুনাহের দরুন আযাব হচ্ছে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল না)। তাদের একজনের উপর আযাব হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্য কোন চিন্তা বা চেষ্টাই করত না। আর দ্বিতীয় জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ এই যে, সে চোগলখুরী করত। পরে রাসূলে করীম (সা) (খেজুর গাছের) একটি তাজা শাখা নিয়ে ওটাকে মাঝখান থেকে চিরে দু'ভাগ করলেন। পরে এক এক ভাগ এক একটি কবরের উপর পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি এ কাজ করলেন কি উদ্দেশ্যে ? তিনি বললেন ঃ আশা করা যায়, এ শাখাখন্ড দুটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এ দু' ব্যক্তির উপর আযাব অনেকটা লাঘব করে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

হাদীসটি থেকে প্রথমত একথা জানা গেল যে, কবর আযাব থেকে পারে, হয় এবং এটা সত্য। দুনিয়ার সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে কবর আযাব দেখতে বা অনুভব করতে না পারলেও নবী-রাসূলগণ আল্লাহর দেয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তা স্পষ্ট অনুভব করতে ও বুঝতে পারতেন। অতএব, কোন ব্যক্তির গুনাহের কারণে কবরে যে আযাব হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

হাদীসে উল্লিখিত কবর দু'টিতে আযাব হওয়ার কথা বলে মহানবী (সা)-এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। একটি কবরে আযাব হওয়ার কারণ সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, লোকটি প্রস্রাবের কদর্যতা থেকে বেঁচে থাকতে ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করত না। অর্থাৎ পায়খানা-প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের যে সকল নিয়ম বা পদ্ধতি ইসলাম নির্দেশ করেছে তার কোনটিই সে পালন করত না। আলোচ্য হাদীসে لا يستنزه , لا يستتر এবং বুখারী শরীফে উল্লেখিত لا يستبرى এই তিনটি শব্দের একই অর্থ, একই মর্ম ও তাৎপর্য এবং তা হল পবিত্র হত না বা পবিত্রতা অর্জন করত না।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদির কদর্যতা ও অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের দেহ ও পোশাককে এসব ময়লা থেকে সুরক্ষিত রাখা আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত না হওয়া কিংবা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করা বড় অপরাধ এবং সেজন্য কবরে আযাব ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয় কবরটিতে আযাব হওয়ার কারণ সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন, সে চোগলখুরী করত অর্থাৎ একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের নিকট কথা লাগাত। চোগলখুরী করা একটা অতি বড় গুনাহের কাজ। কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ . هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ

"এবং অনুসরণ করো না তার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী। " (সূরা আল-কালাম : ১০-১১)

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কা'ব আহবার বলেছেন- তওরাতে চোগলখুরীকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলা হয়েছে।

যে দুটি গুনাহের কারণে এ দু'ব্যক্তি কবর আযাব ভোগ করছিল, সে দুটি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) আরো বলেছেন-

و ما يعذبان فى كبير.

"লোক দুটি কোন বড় গুনাহের কারণে আযাব ভোগ করছে না।"

এর অর্থ এ নয় যে, এ গুনাহ দুটি বড় নয়-খুবই সামান্য ও নগণ্য। না, তা নয়। বরং এর অর্থ এই যে, এ গুনাহ্ দুটি এমন কাজ নয়, যা না করলেই নয়, যা ত্যাগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং সত্য কথা এই যে, এ কাজ দুটি না করে খুব সহজেই চলা যেতে পারে। যদি কেউ এটা পরিত্যাগ করার সংকল্প গ্রহণ করে, তা হলে তাকে সেজন্য কোন বিশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। কোনরূপ অসুবিধায় পড়তে হবে না। কোন ক্ষতিও হবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও লোক দু'জন এ গুনাহ দুটি করেছে এবং তার ফলেই আজ কবরে তাদেরকে নিজ নিজ গুনাহের শাস্তিস্বরূপ আযাব ভোগ করতে হচ্ছে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, কবর আযাব কিংবা জাহান্নামের আযাব- যা-ই যাকে ভোগ করতে হবে, তা হবে তার নিজের ইচ্ছামূলক গুনাহের কারণে। ইচ্ছামূলকভাবে গুনাহ না করলে কাউকেও আযাব ভোগ করতে হবে না। তাই, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ছোট গুণাহ ইচ্ছাবশত মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমাদের সকলকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. لا تقبل صلاة بغير طهور.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : পবিত্রতা ব্যতীত সালাতই কবুল করা হয় না। -(তিরমিযী)

ব্যাখ্যা

পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কোন সালাতই কবুল করা হয় না, প্রত্যেক সালাতের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য। পূর্বে পবিত্রতা অর্জন না করে কোন প্রকারের সালাত পড়লে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। হাদীসটির মাধ্যমে আমরা তাই জানতে পেরেছি।

মূল হাদীসের শব্দ হল طهور (তুহুরুন)। তুহুরূন শব্দ দ্বারা ওযূ করা এবং গোসল করা উভয় কাজই বোঝায়। আরবী আভিধানিকদের মতে 'তুহুর' শব্দের অর্থ 'ওযূ' করা। আর 'তাহুর' طهور শব্দের অর্থ সেই পানি, যা দিয়ে ওযূ করা হয়। আর 'কবুল' শব্দের তাৎপর্য হল নির্ভুল নিয়মে এর পালন ও বিশুদ্ধ হওয়া এবং এর বিনিময়ে প্রতিফল দান। অন্য কথায় আল্লাহর হুকুম পালনের দ্বারা স্বীয় দায়িত্ব আদায় করা ও এর জন্য নির্দিষ্ট ফল লাভ এভাবে যে নেক কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফললাভ করা হয়, তা কবুল হয়, আর যা এভাবে করা হয় না, তা কখনও কবুল হয় না। বস্তুত সালাত আল্লাহর সম্মুখে হাযির হওয়ার একটি অতীব পবিত্র ভাবধারাপূর্ণ ইবাদত। এ ইবাদত প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কখনো কবুল থেকে পারে না।

এর কারণ হল- আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন -

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ .

"অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।" (সূরা আল-মায়িদা : ২৭)

আলোচ্য হাদীসটি এ কথারই প্রতিধ্বনি এবং এরই বাস্তব রূপ। এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সালাতের জন্য পূর্বেই 'তাহারাত' বা পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। সমগ্র মুসলিম উম্মত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'তাহারাত' বা পবিত্রতা পূর্বশর্ত। 'তাহারাত' ব্যতীত সালাত পড়া সম্পূর্ণ হারাম-

'তাহারাত' ব্যতীত কোন সালাতই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। এটা এক নিরংকুশ, সার্বিক ও চুড়ান্ত ঘোষণা। ফরয সালাত কিংবা নফল সালাত পবিত্রতা ব্যতীত কবুল না হওয়ার ব্যাপারে সবই সমান। জানাযার সালাতও যেহেতু এক প্রকারের সালাত, তাই ওটাও 'তাহারাত' ব্যতীত কবুল হবে না। অতএব, জানাযার সালাত পড়ার পূর্বেও যথারীতি পবিত্রতা অর্জন করে নিতে হবে। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ জানাযার সালাতকে সালাত বলা হয়েছে, যদিও তাতে রুকু সিজদা নেই, তাতে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা বা আয়াত পাঠ করা হয় না। তাতে শুধু দোয়া, তাকবীর ও সালামই রয়েছে মাত্র। হযরত ইবন উমর (রা.) এ হাদীসের ভিত্তিতেই বলেছেন-

لا يصلى عليها الا طاهر. (فتح البارى)

জানাযার সালাত পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যতীত আদায় করা যাবে না। (ফাতহুল বারী)

لاايمان لمن لا امانة له. ولا صلوة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلوة له و انما موضع الصلوة من الدين كموضع الرأس من الجسد. (المعجم الصغير للطبرانى)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ যার মধ্যে আমানত নেই তার ঈমানও নেই ; যার পবিত্রতা নেই তার সালাত গ্রহণযোগ্য থেকে পারে না ; আর যার সালাত নেই তার দ্বীনও নেই। দ্বীন-ইসলামে সালাতের স্থান বা গুরুত্ব তা-ই যা মানবদেহে মস্তকের গুরুত্ব। (তাবারানী, মুজামুস-সাগীর)।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে ঈমান, দ্বীন-ইসলাম, পবিত্রতা, সালাত ও আমানত বা বিশ্বাসপরায়ণতার গুরুত্ব এবং এ সবের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা সংক্ষেপে অত্যন্ত সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে ঃ যার আমানতদারী নেই বা যে আমানতদারী রক্ষা করতে পারে না তার ঈমান নেই। অন্য কথায়, প্রত্যেক বেঈমান ব্যক্তিই খিয়ানতকারী-বিশ্বাসঘাতক। ঠিক এর বিপরীত- প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই আমানতদার। ঈমান থাকলেই একজন লোক আমানতদারী রক্ষা করতে পারে। এ থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে, কারো মধ্যে আমানতদারী না থাকলে, খিয়ানত কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিলে বুঝতে হবে যে, তার হাজার ধার্মিকতার অন্তরালে সত্যিকার ঈমান বলতে কোন জিনিসের অস্তিত্ব তার মধ্যে নেই। ঈমান যে কোন নিঃসম্পর্ক একক জিনিস নয় ; বরং বাস্তব কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছেঃ যার পবিত্রতা নেই, তার সালাতও নেই। অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে সালাত পড়া জায়েয নয়। সালাতের পূর্বে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। গোসল ওয়াজিব হলে তা করতে হবে, অন্যথায় শুধু ওযূ করেই সালাত পড়তে দাঁড়াবে। বস্তুত বিনা ওযূতে সালাত শব্ধ হয় না। শুধু তা-ই নয়, বরং বিনা ওযূতে সালাত পড়া বড় গুনাহ।

তৃতীয়ত বলা হয়েছেঃ যার সালাত নেই, তার দ্বীনও নেই। বস্তুত সালাত হচ্ছে দ্বীন-ইসলামের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাই সালাত না পড়লে দ্বীন-এর প্রাসাদ ধুলিসাৎ থেকে ও চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে আর কিছুই বাকী থাকে না।

সালাতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবী করীম (সা) হাদীসের শেষাংশে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একটি দেহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মস্তক। হাত, পা, কান ইত্যাদি কোন কিছুই না থাকলে মানুষের মৃত্যু ঘটে না ; কিন্তু কারোও মস্তক ছিন্ন হলে এক মুহূর্তেই প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায়। বস্তুত মস্তকবিহীন মানুষ বা প্রাণী যেমন ধারণা করা যায় না, সালাত বিহীন দ্বীন ও অনুরূপভাবে ধারণা করা যায় না।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে, এর বাস্তব রূপ এ হাদীসে সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ঈমান হচ্ছে মানুষের মনের বিশ্বাসের ব্যাপার, কিন্তু এ বিশ্বাস বাস্তব কর্মের সাথে মোটেই সম্পর্কহীন নয় ; বরং বাস্তব কর্মের সাথে এর এত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে যে, কর্মের ভিতর দিয়ে ঈমানের রূপায়ণ থেকে না থাকলে ঈমানের অস্তিত্ব আছে বলেও বিশ্বাস করা যায় না। অনুরূপভাবে ঈমান না থাকলে কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য থেকে পারে না। তাই বলতে হবে যে, ঈমান, আমল, বিশ্বাস ও কাজ একটি অভিন্ন জিনিস না হলেও তা ঠিক বীজ ও বৃক্ষের মতই অবিচ্ছেদ্য।

পবিত্রতা অর্জনের মর্যাদা

عن ابى ايوب و جابر و انس رضى الله تعالى عنه ان هذه الاية لما نزلت فيه: رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا معشر الانصار! ان الله قد اثنى عليكم فى الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلوة و نغتسل من الجنابة و نستنجى بالماء قال فهو ذلك فعلتكموه. (ابوداؤد. ترمذى. ابن ماجه)

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী, হযরত জাবির ও হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল- 'এ মসজিদে এমন সব লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ তাআলাও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে 'ভালবাসেন' তখন নবী করীম (সা) আনসার সমাজের লোকদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

'হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জনের ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। আমি জানতে চাই, তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি? তখন জবাবে তাঁরা বললেন ঃ (পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি হল) আমরা সালাতের জন্য ওযূ করি, শরীর না-পাক হলে গোসল করি এবং পানি দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানায় শৌচ করি। এটা শুনে নবী করীম (সা) বললেন, হ্যা, এটাই হল কুরআনে তোমাদের প্রশংসার কারণ। অতএব নিয়মিতভাবে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলাই তোমাদের কর্তব্য। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা

উল্লিখিত হাদীসে কুরআন মাজীদের যে আয়াতের অংশ উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা তাওবার ১০৮ নং আয়াতের শেষ অংশ। এ আয়াতাংশ 'কুবা'বাসী আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তা রাসূলে করীম (সা)-এর কথা থেকেই জানা গেল। এ আয়াতে তাদের পবিত্রতা অর্জন প্রবণতার প্রশংসা করা হয়েছে। আর এ প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এ প্রশংসা দেখে নবী করীম (সা)-এর মনে ধারণা জন্মেছিল যে, পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা আল্লাহর বিশেষ পছন্দ হয়েছে। তাই, তিনি তা সরাসরি তাঁদের নিকট থেকে জেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে 'কুবা'র মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তাঁরা যা বলেছেন, তা আলোচ্য হাদীসে শুধু এতটুকুই উদ্ধৃত হয়েছে- আমরা সালাতের জন্য ওযূ করি- ওযূ করে সালাত পড়ি। আর ওযূ তাঁরা নিশ্চয়ই সে নিয়মেই করতেন যা নবী করীম (সা) তাঁদেরকে শিখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত বললেন-শরীর নাপাক হলে আমরা গোসল করি ও গোসল করে শরীরকে পবিত্র করে নিই। তৃতীয়ত, বললেন- আমরা প্রস্রাব ও পায়খানার পর পানি দ্বারা শৌচ করি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (সা) নিজে বলেছেন ঃ

نزلت هذه الاية فى أهل قبا ... كانوا يستنجون بالماء. (رواه البغوى والترمذى)

এ আয়াতাংশ 'কুবা'বাসীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে- তারা পানি দ্বারা শৌচ করে। (বাগাবী ও তিরমিযী)

সারকথা

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করা ইবাদাতের অংশ। পানি, মাটি, টিস্যু পেপার, পাথরের টুকরা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে মাটি বা পাথরের টুকরা দ্বারা পরিস্কার হওয়ার পর পানি দ্বারা ধৌত করা উত্তম। প্রস্রাব-পায়খানা থেকে উত্তমরূপে পরিস্কার ও পবিত্র না হলে সালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে না। পায়খানা-প্রসাব থেকে যথাযথ অর্থাৎ ইসলামের বিধি অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন না করা বড় গুনাহের কাজ এবং সে জন্য কবরের আযাব অবধারিত। যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। সূরা তাওবার ১০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদের প্রশংসা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন

১. 'আলহামদুল্লিাহ' শব্দটি বলার উপকারিতা হল-

ক. সাওয়াবের দ্বারা আকাশকে ভরে দেয় খ. আকাশ ও জমিনকে পূর্ণ করে দেয়
গ. আমলের পাল্লা পূর্ণ করে দেয় ঘ. খ ও গ -এর উত্তর সঠিক।

২. তুহুরুন শব্দের অর্থ হচেছ-

ক. পবিত্রতা অর্জন করা খ. পবিত্রতা
গ. পবিত্র পানি ঘ ঈমানের অর্ধেক।

৩. তাহারাত বা পবিত্রতার ৪টি পর্যায় রয়েছে-এ মতবাদটি-

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর খ. ইমাম সূয় তী (র)-এর
গ. ইমাম গাযালী (র)-এর ঘ. ইমাম মালিক (র)-এর।

৪. গোবর ও হাড় পবিত্রতা হাসিলের জন্য ব্যবহার করা -

ক. বৈধ খ. অবৈধ
গ. মাকরূহ ঘ. মুবাহ।

৫. কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-প্রস্রাব করা-

ক. হারাম খ. বৈধ
গ. মাকরূহ ঘ. বেয়াদবিমূলক কাজ।

৬. কবর আযাবের কারণ কী?

ক. ইবাদত না করা খ. অপবিত্র অবস্থায় থাকা
গ. কুফরি করা ঘ. সব ক'টিই উত্তরই সঠিক।

৭. পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত সালাত আদায় করার বিধান কী?

ক. সম্পূর্ণ হারাম খ. মাকরূহ তাহরিমী
গ. বিদআত ঘ. কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ব্যাখ্যা করুন-পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।
২. ইমাম গাযালী (র)-এর মতে তাহারাতের ক'টি পর্যায় রয়েছে? তা লিখুন।
৩. প্রস্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।
৪. প্রস্রাব-পায়খানায় মহানবী (সা) কী পানি ব্যবহার করতেন? দলীল দ্বারা আপনার মতামত দিন।
৫. অপবিত্রতা কবর আযাবের কারণ-ব্যাখ্যা করুন।
৬. ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৭. পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব হাদীসের আলোকে আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ-হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
২. অপবিত্রতা কবর আযাবের কারণ-এ হাদীসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখুন।
৩. সালাত ও অন্যান্য ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা অতীব প্রয়োজনীয়-হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৫

সালাত সম্পর্কিত হাদীস

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ করতে পারবেন
- সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- সালাত আদায় না করার পরিণতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- সালাত ফরয হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন

◆ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সালাত আদায়ের নির্দেশ

عن بريدة رضى الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان العهد الذى بيننا و بينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر. (مسند احمد. ترمذى . نسائى. ابن ماجه)

হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : নিশ্চয় আমাদের ও ইসলাম গ্রহণকারী সাধারণ লোকদের পরস্পরের মধ্যে সালাতের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কাজেই যে লোক সালাত ত্যাগ করবে, সে যেন কুফরির পথ গ্রহণ করল। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজহ)

ব্যাখ্যা

এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি ও মানদন্ড হচ্ছে সালাত তরক করা। যে লোক সালাত পড়ে না, সে মুসলিম রূপে গণ্য নয়। যে সালাত পড়ে- ত্যাগ করে না সে মুসলমান। এ কারণে নবী করীম (স.) ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের নিকট থেকে সালাত পড়ার ও ত্যাগ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন। এ পর্যায়ের লোকদের সাথে যে চুক্তি গৃহীত হত তার ভিত্তি ছিল সালাত। কেননা সালাত পড়াই ঈমান ও মুসলমান হওয়ার বাস্তব প্রমাণ। সূতরাং সালাত কায়েম করা ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে করীম (স.) বলেছেন ঃ কুফর ও শিরক-এর মাঝে সালাত ত্যাগ করাই ব্যবধান মাত্র। (মুসলিম)

ইমাম নববী লিখেছেন, যে কাজ না করলে কুফরি হয়ে যায় তা দেখানোই এ ধরনের হাদীসমূহের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তাআলা ইবলীসকে বলেছিলেন আদমকে সিজদা করার জন্য। কিন্তু ইবলীস এ আদেশ অমান্য করে। এ ঘটনার উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে- كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

"সে কাফির হয়ে গেল।"

সালাত পড়ার জন্যও আল্লাহ তাআলা বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন- اقيموا الصلوة.

"সালাত কায়েম কর।"

এ নির্দেশ পালন না করলে এবং অমান্য করলে কাফির হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। এটা শুধু সালাত ত্যাগ করা বা না পড়া সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কেউ ইবলীসের ন্যায় অহংকার বশতই সালাত প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সালাতকে ফরয হিসেবে মেনে না নেয়, তা হলে তার কাফির হয়ে যাওয়া অকাট্য ও অবধারিত। এরূপ ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার যোগ্য। অবশ্য নিছক গাফিলতির কারণে যদি কেউ সালাত না পড়ে ; কিন্তু তা ফরয হওয়ার প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস অক্ষণ্ন থাকে এবং ফরয মনে করে, তা হলে এ ব্যক্তি কাফির গণ্য হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে সে লোক কাফির নয়, সে ফাসিক। তাকে তাওবা করে রীতিমত সালাত পড়ার জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। যদি সে তাওবা না করে তাহলে ঃ

قتلناه حدا كالزانى المحصن.

আমরা তাকে মৃত্যুদন্ড দেব-বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে যেমন দন্ড দেওয়া হয় ঠিক সেরূপ।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মনীষী ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন; তাকে মৃত্যুদন্ড নয়, সাধারণ শাস্তি দানই বিধেয়।

হযরত আবূদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার প্রিয় বন্ধু ও সুহৃদ নবী করীম (সা) আমাকে এ বলে উপদেশ দিয়েছেন ঃ

১. আল্লাহর সাথে এক বিন্দু পরিমাণও শিরক করবে না- তোমাকে ছিন্নভিন্ন ও টুকরো টুকরো করা কিংবা আগুনে ভস্ম করে দেয়া হোক না কেন।

২. সাবধান, কখনো ইচ্ছা বা সংকল্প করে কোন ফরয সালাত ত্যাগ করবে না। কেননা যে লোক ইচ্ছা পূর্বক সালাত ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহ তাআলার সে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, যা অনুগত ও ঈমানদার বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন।

৩. আর কখনো মদ্য পান করবে না। কেননা তা সর্ব প্রকার অন্যায়, পাপ ও বিপর্যয়ের চাবি কাঠি। (ইবনে মাজাহ)

হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর সাথে কাউকে এবং কোন জিনিসকেই শরীক করবে না। এমনকি শিরক না করার জন্য যদি নিহত থেকে, ছিন্নভিন্ন ও টুকরো টুকরো থেকে কিংবা অগ্নিকুণ্ডলিতে নিক্ষিপ্ত থেকে হয়, তবুও তা করা যাবে না। অন্তত কোন ঈমানদার ব্যক্তিই তা করতে পারে না। ঈমান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হলেও ঈমানদার লোকদের অকুণ্ঠিত চিত্তে ও নির্ভীক হৃদয়ে সে জন্য প্রস্তুত হওয়াই ঈমানের ঐকান্তিক দাবী।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যক, অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পড়ে যদি কেউ কেবল মুখে কুফরি কিংবা শিরকী কথার উচ্চারণ করে, তবে আল্লাহর নিকট সে নিশ্চয়ই কাফির বা মুশরিক হয়ে যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَن كَفَرَ بِٱللَّـهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِٱلإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّـهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (النحل-١٠٦)

কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত। (সূরা আল-নাহল : ১০৬)

এ আয়াতে প্রধানত দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ ঈমানের পর যারা কুফরি কবুল করবে ও তাদের উপরই এবং তাদের জন্যই বড় আযাব নির্দিষ্ট। আর দ্বিতীয় হল, যাদেরকে কুফরি বা শিরক করতে বাধ্য করা হবে, তাদের হৃদয় মন যদি আল্লাহর প্রতি ঈমানে পূর্ণ উন্মুক্ত, নিশ্চিত ও আশ্বস্ত থাকে, তা হলে তারা আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে বলেন- যে লোক কেবল মুখের ভাষায় আল্লাহর সাথে কুফরি বা শিরক করবে ও কেবল মৌখিক কথায় কাফির মুশরিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে- এ কারণে যে, তা করার জন্য তার উপর জোর জবরদস্তি করা হয়েছে, মারধর করা হয়েছে এবং নানাভাবে অত্যাচার- নিপীড়নে জর্জরিত করে তোলা হয়েছে, -কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে যার হৃদয় মন অন্তর সম্পূর্ণ স্থির ও সম্পূর্ণ অবিচল থাকবে, সে লোক আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর গজব ও আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- এ আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তাঁকে মুশরিকরা নির্মমভাবে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত করেছিল হযরত মুহাম্মদ (স) কে নবী ও রাসূল বলে স্বীকার করার কারণে। তিনি এতে অতিষ্ঠ ও নিরুপায় হয়ে তাদের সাথে একমত প্রকাশ করেন। পরে তিনি রাসূলে করীমের নিকট এ ঘটনা বিবৃত করেন। এর পরই কিংবা এ প্রসঙ্গেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তখন নবী করীম (স.) হযরত আম্মার (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন-

كيف تجد قلبك "তুমি তোমার মনের অবস্থা কিরূপ পেয়েছ ?"

তিনি বললেন-مطمئنا بالايمان ঈমানে অবিচল ও পূর্ণ আশ্বস্ত। তখন নবী করীম (সা) বললেন-

ان عادوا فعد তা হলে কোন আশংকাই নেই। তারা যদি আবার তোমাকে বাধ্য করে, তবে তুমিও মৌখিক ঐক্য জানানোর কাজ করতে পার।

আলোচ্য হাদীসে দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে ফরয সালাত সম্পর্কে। ইচ্ছা করে কখনই ফরয সালাত ত্যাগ করবে না। কেননা যে লোক ইচ্ছা করে ফরয সালাত ত্যাগ করে তার সম্পর্কে আল্লাহর গ্রহণ করা রহমত দান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এ হাদীসে সালাত পর্যায়ে বলা হয়েছে, ইচ্ছাপূর্বক ফরয সালাত ত্যাগ করা একটা সাধারণ সামান্য ও নগণ্য গুনাহ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর বিরোধিতামূলক একটা অতিবড় অপরাধ, তাতে সন্দেহ নেই। এ অপরাধ করার পর কোন লোকই আল্লাহর সে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ লাভের অধিকারী থাকতে পারে না। তখন আল্লাহর নিজের দয়ায় গ্রহণ করা দায়িত্ব আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসে ফরয সালাত ইচ্ছাপূর্বক তরক করার পরিণাম সম্পর্কে এ কথাই বলা হয়েছে।

সালাত সম্পর্কিত অপর একটি হাদীসের শেষভাগে রাসূলে করীম (সা)-এর এ বাক্যাংশে উদ্ধৃত হয়েছে-

من تركها متعمدا فقد خرج من الملة.

"যে লোক ইচ্ছা করে ফরয সালাত ত্যাগ করবে, সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যায়।" সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় না করা কুফরি এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে গিয়েছে বলে বুঝতে হবে।

এসব হাদীসে দুটি মূল কথা বলা হয়েছে। একটি এই যে, ফরয সালাত তরক করা কুফরী পর্যায়ের কাজ। আর দ্বিতীয় হল, এর দরুন কার্যত মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাওয়া হয়। এর কারণ এই যে সালাত ইসলামের সর্ব প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এটা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা এমন একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ, যা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ, রাসূল ও দীন ইসলামের সাথে এ লোকটির কার্যত কোন সম্পর্ক নেই এবং সে নিজেকে সালাতী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সমাজ ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। সে নিজেই নিজেকে এর বাইরে নিয়ে গিয়েছে। বিশেষত রাসূলে করীম (সা)-এর সোনালী যুগে কোন মুসলমান সালাত তরককারী থেকে পারে তা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই সেকালে সালাত পড়া মুসলমান হওয়ার এবং সালাত তরক করা কাফির হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে পরিগণিত হতো।

অর্থাৎ সালাত তরক করলে কুফরী হয়, এটাই ছিল সাহাবীদের বিশ্বাস, তৃতীয়ত বলা হয়েছে মদ্যপান সম্পর্কে। এতে মদ্যপান করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াতেই মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدة-٩٠)

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আল-মায়িদা : ৯০)

আয়াতের বক্তব্য হল, মদ্য প্রথমত অপবিত্র, দ্বিতীয়ত তা পান করা সম্পূর্ণ শয়তানী কাজ। তৃতীয়ত এটা পরিহার করার এটা স্পষ্ট নির্দেশ এবং চতুর্থ তা পরিহার করলেই কল্যাণের আশা করা যায়। আর মদ্যপানে এ সমস্ত অন্যায় ও মলিনতায় নিমজ্জিত হওয়া অনিবার্য। পরবর্তী আয়াতে এ নিষেধের কারণ বলা হয়েছে ঃ শয়তান এ মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর যিকর ও সালাত থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে।

সালাত আদায় করা মুক্তির কারণ হবে

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح و انجح و ان فسدت فقد خاب و خسر فان انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك و تعالى انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তার সালাত যদি যথাযথ প্রমাণিত হয় তবে সে সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করবে। আর যদি সালাতের হিসাবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সালাতের ফরযের মধ্যে যদি কিছু কম পড়ে, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন ঃ তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল সালাত বা নফল ইবাদত আছে কিনা? যদি থাকে, তা হলে এর দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। পরে তার অন্যান্য সব আমল এরই ভিত্তিতে বিবেচিত হবে ও অনুরূপভাবে ঘাটতি পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা

ইসলামী শরীআতে ইবাদতসমূহের মধ্যে সালাত সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ সালাত সঠিকভাবে ও রীতিমত আদায় করার উপরই বান্দার পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। আর বান্দার উপর আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে এ সালাত সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হিসাব নেয়া হবে। এ হিসাবে যদি কারো সালাত ঠিক ঠিকভাবে পড়া হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় তবেই সে নিস্কৃতি পাবে, পাবে কল্যাণ ও সাফল্য। বুঝতে হবে সে লোক তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। আর যদি কারো সালাতের হিসাবে দেখা যায় যে, সে তা পড়েনি কিংবা পড়েছে বটে, কিন্তু নির্ভুলভাবে নয়, এমনভাবে পড়েছে যা ভুল ও গ্রহণ অযোগ্য, তবে তার ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা অবধারিত। সে সাফল্য ও কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। আযাব পাওয়া থেকে তার নিস্কৃতি লাভ সম্ভব হবে না।

সালাত পড়েছে এমন বান্দার হিসাবে যদি দেখা যায় যে, ফরয সালাত আদায়ের ব্যাপারে কিছু ঘাটতি পড়েছে, মাত্রা কিংবা মান যথাযথ রক্ষিত হয়নি, তখন আল্লাহ তাআলা তার নফল সালাত বা নফল ইবাদত দ্বারা সে ঘাটতি পূরণ করে দেবেন। মুসনাদে আহমদ-এ এখানে আল্লাহর হুকুমের ভাষা হল ঃ

فكملوا بها فريضته .

"সেই নফল দ্বারা তার ফরয সম্পূর্ণ করে নাও।"

এ সম্পর্কে বলা হয়েছে -

و الله سبحانه و تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا من الصلوات المفروضة .

"আল্লাহ তাআলার বান্দার সহীহভাবে আদায় করা নফল সালাত বা নফল ইবাদত ফরয সালাতের বদলে ও বিকল্পরূপে কবুল করবেন।"

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم من اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه مايقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذا هو يسئل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرهن قال لا الا ان تطوع و صيام شهر رمضان فقال هل على غيره فقال لا الا ان تطوع و ذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكوة فقال هل على غيره قال لا الا ان تطوع قال فادبر الرجل و هو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم افلح ان صدق. (مسلم)

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নজদের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট আগমন করল। লোকটির মাথার চুল উস্কুখুসকু ছিল। তার মুখনিঃসৃত শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু এর কোন অর্থ আমরা বুঝতে পার ছিলাম না। পরে সে লোকটি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকটে উপস্থিত হল এবং সহসা সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। তখন রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ দিন ও রাত্রের মধ্যে পাঁচবার সালাত পড়তে হবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এটা ছাড়া আরও সালাত পড়া কি আমার কর্তব্য? বললেন ঃ না। তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কর। আর (দ্বিতীয় কর্তব্য হল) রমযান মাসের রোযা পালন করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এটা ছাড়াও রোযা রাখা আমার কর্তব্য কি ? বললেন ঃ না, তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কর। অতঃপর রাসূলে করীম (সা) সে লোকটিকে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি বলল, এটা ছাড়াও আমার উপর কর্তব্য আছে কি? বললেন, না। তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কর। এর পর লোকটি এ কথা বলতে বলতে পিছনে সরে গেল যে, আল্লাহর শপথ, আমি এর উপর কিছুই বাড়াব না ও এটা থেকে কিছুই কমাব না। একথা শুনে রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ যদি লোকটি সত্য বলে থাকে, তা হলে সে নিশ্চয় কল্যাণ লাভ করবে। (মুসলিম)

এ হাদীসে নজদবাসী এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা)-এর বলা কথাগুলো থেকে ইসলামের প্রধান রূকনগুলোর মধ্যে তিনটির উল্লেখ পাওয়া য়ায়। তা হলঃ সালাত, সাওম ও যাকাত। সালাত পর্যায়ে জানা গেল, দিন-রাতের মধ্যে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয এবং ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে অবশ্য কর্তব্য। রোযার পর্যায়ে জানা গেল, কেবল রমযানের একটি মাস রোযা থাকা কর্তব্য। আর যাকাত পর্যায়ে বলা হয়েছে, কেবল যাকাত আদায় করাই ফরয। এর পরও কিছু কর্তব্য আছে কিনা, প্রত্যেকটির উল্লেখের পর লোকটি রাসূলে করীম (সা) কে এ প্রশ্ন করেছে। আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কথাটি হল ঃ

لا الا ان تطوع .

না, তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কিছু কর।

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ করা যায়। একটি-

لكن يستحب لك ان تطوع .

"তবে তুমি অতিরিক্ত আরো কিছু কর, এটাই তোমার জন্য ভালো।"

অর্থাৎ কেবল ফরয সালাত পড়েই ক্ষান্ত হয়ে থেকো না। তা ছাড়া অতিরিক্ত নফল হিসাবে তোমার আরও সালাত আদায় করা উচিত, যেমন বিতর, সুন্নাত এবং নফল সালাত ইত্যাদি। কেবল রমযান মাসের রোযা থেকেই দায় এড়াতে চেয়ো না, বরং কিছু কিছু নফল রোযা রাখাও ভালো। আর কেবল শতকরা চল্লিশ ভাগ হিসাব করে ও গণনা করে যাকাত আদায় করেই মনে করো না যে, আর একটি পয়সা কাউকেও দিতে হবে না। না, তা আদায় করার পরও সাধারণ দান হিসাবে নফল স্বরূপ দান-সাদকা করা উচিত। এ বাক্যটির দ্বিতীয় অর্থ হল ঃ

من شرع فى صلاة نفل اوصوم نفل وجب عليه اتمامه .

ফরয সালাত ও রোযা আদায়ের পর কেউ যদি নফল সালাত পড়তে এবং নফল সাওম পালন শুরু করে, তাহলে তাকে সম্পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব।

এসব প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর লোকটি চলে যাবার সময় যে কথাটি বলেছিল, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। লোকটি বলেছিল ঃ আমি এর উপর কিছুই বাড়াব না এবং এ থেকে কিছুই কমাব না। এটা প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি। বস্তুত ইসলামের মৌল ভাবধারা যার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, সে কখনও ইসলামের মূল বিধানের উপর নিজ থেকে কিছু বৃদ্ধি করে না, মূল বিধান থেকে কাট-ছাট করেও নেয় না। বরং মূল বিধান ও ব্যবস্থাকেই পূর্ণ আন্তরিকতা ও অপরিসীম আল্লাহ ভীতি সহকারে অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করাই ঈমানদার লোকের কাজ। কেননা ইসলাম সম্পূর্ণ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। এটা কোন লোকের মনগড়া বিধান নয়। ইচ্ছা করে কেউ এর উপর বৃদ্ধিও করতে পারে না, কেউ কমও করতে পারে না। তা করার অধিকার কারো নেই। বৃদ্ধি কিংবা কমতি যা-ই করা হোক না কেন, তাতে তা আর আল্লাহর বিধান থাকবে না, তার মনগড়া বিধান হয়ে যাবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফরয সালাত হিসেবে ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব এবং ঈশা এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রত্যেকটি প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানবান মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় ও নাম অন্যান্য হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে কম করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। ফরয সালাত হিসেবে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত তাকে আদায় করতেই হবে। নতুবা সে অবহেলাবশতঃ আদায় না করলে ফাসেক এবং অহংকার বশতঃ আদায় না করলে কাফির হয়ে যাবে। তাই, প্রতিটি মুকাল্লাফ অর্থাৎ শরীআতের বিধান যার উপর প্রযোজ্য হয়েছে এমন ব্যক্তিকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করতে হবে। এ থেকে সে কখনো নিষ্কৃতি লাভ করবে না বা অব্যাহতি পাবে না।

সালাত ফরয হওয়ার ইতিহাস

عن انس بن مالك قال فرضت على النبى صلى الله عليه و سلم الصلوات ليلة اسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودى يا محمد انه لا يبدل القول لدى وان لك بهذه الخمس خميسن. (مسند احمد. ترمذى. نسائى)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর প্রতি মিরাজের রাতে প্রথম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল। পরে তা কম করে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত স্থায়ী করে রাখা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হয়, হে মুহাম্মদ ! নিশ্চয় জেনে রেখো, আমার নিকট গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনও পরিবর্তিত হয় না। আপনার জন্য এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা

উদ্ধৃত হাদীসটি 'হাদীসুল ইসরা' বা মি'রাজ সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। এটা থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়েছে মি'রাজের রাত্রে, যখন নবী করীম (সা) আল্লাহর অতীব নিকটে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উপণীত এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছিলেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রতি প্রথমত দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন। কিন্তু এত বেশী সালাত যথারীতি আদায় করা মুসলমানদের পক্ষে অপরিসীম কষ্টকর হবে বিধায় আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই বহাল রাখলেন এবং এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব বহন করবে, এ কথাও তিনি জানিয়ে দিলেন।

এ হাদীসটি থেকে একথাও জানা গেল যে, ফরয সালাত কেবল এ পাঁচ ওয়াক্ত। এটা ছাড়া আর কোন সালাত ফরয নয়। জুমুআর সালাত শুক্রবার দিন যুহরের স্থলাভিষিক্ত, জুহরের ওয়াক্তে তা পড়া হয় এবং তাও ফরয।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয এটা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মি'রাজের পূর্বে নবী করীম (স) সালাত পড়তেন। কিন্তু তখনকার সালাত ছিল প্রধানত রাত্রিকালীন এবং তখন সালাতের রাকআতও নির্দিষ্ট ছিল না, এমন কি তখন তার জন্য সময়ও নির্ধারিত ছিল না।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়

عن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وقت الظهر اذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر و وقت العصر ما لم تصفر الشمس و وقت صلوة المغرب ما لم يغب الشفق و وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط و وقت صلوة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلوة فانها تطلع بين قرنى الشيطان. (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন: যুহরের সালাতের সময় হয় তখন, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তার দৈর্ঘের সমান হয়। আর এটা আসরের সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত থাকে। আসরের সালাতের সময় সূর্যের হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত স্থায়ী হয়, মাগরিবের সালাতের সময় অস্ত আকাশের লালিমা বিলীন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত থাকে। ইশার সালাতের সময় থাকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের সালাতের সময় প্রথম উষা লগ্ন থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। কিন্তু যখন সূর্যোদয় থেকে থাকে তখন সালাত পড়া থেকে বিরত থাক। কেননা, ওটা শয়তানের দুই শৃংগের মধ্যবর্তী স্থানে উদিত হয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদীসে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার সালাত পড়ার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সালাতের ওয়াক্তের সূচনা ও শেষ সীমা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সালাতের ওয়াক্তসমূহ নিম্নরূপ-

১. যুহরের সময় সূর্যের মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ার সময় থেকে আসরের সালাতের সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত থাকে। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলেছে কিনা তা অনুমান করার জন্য হাদীসে একটি মানদন্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে একজন মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হবে, তখনি যুহরের সালাতের সময় হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

২. আসরের সালাতের সময় হয় এর পর সূর্যের দীপ্ত খরতাপ যখন কিছুটা নিস্তেজ হয়ে আসবে এবং সূর্যরশ্মির ফ্যাকাশে রঙ ধারণ করা পর্যন্ত তা স্থায়ী হবে।

৩. মাগরিবের সালাতের সময় হয় সূর্যাস্ত হওয়ার পর মুহূর্ত থেকে এবং তা স্থায়ী থাকে পশ্চিম আকাশের লালিমা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত।

৪. অস্ত আকাশের লালিমা বিলীন হয়ে গেলে তখন ইশার সালাতের সময় উপস্থিত হয়। এটা স্থায়ী থাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত।

৫. পূর্ব আকাশে প্রথম উষার উদয় হলে ফজরের সালাতের সময় হয় ও সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা স্থায়ী থাকে। সূর্যোদয় থেকে শুরু করলে তখন সালাত পড়া নিষেধ। কেননা শয়তানের দুই শৃংগের মধ্যবর্তী স্থানে তা উদিত হয়। 'শয়তানের শৃংগ' অর্থ, এর সম্মুখভাগ, এর ললাট দেশ। সূর্যোদয়ের সময় শয়তান তার সম্মুখদেশে নিজেকে স্থাপন করে এবং সূর্যপূজারীদের নিকট থেকে পূজা গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যত সূর্যের পরিবর্তে শয়তানের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শয়তান মনে করে, এরা সূর্যের নয়, তারই পূজা করছে। এজন্য ঠিক এ সময় সালাত পড়তে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন। কেননা এ সময় সালাত পড়লে সূর্য পূজারীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للصلوة اولا واخرا وان اول وقت صلوة الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان اول وقت صلوة العصر حين يدخل وقتها وان أخر وقتها حين تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الافق. وان اول وقت العشاء حين يغيب الأفق. وان

اخر وقتها حين ينتصف الليل وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان اخر وقتها حين تطلع الشمس. (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন : প্রত্যেক সালাতেরই একটা প্রথম সময় রয়েছে এবং রয়েছে একটা শেষ সময়। এর বিবরণ এই যে, যুহরের সালাতের প্রথম সময় শুরু হয় তখন, যখন সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে। এর শেষ সময় আসরের সালাতের সময় শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে। আসরের সালাতের প্রথম সময় শুরু হয় ঠিক এর সময় সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। আর এর শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করে। মাগরিব সালাতের সময় শুরু হয় যখন সূর্যাস্ত ঘটে। আর এর শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম বর্ণের লালিমা নিঃশেষে মুছে যায়। ইশার সালাতের প্রথম সময় সূচিত হয় যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম আভা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এর শেষ সময় দীর্ঘায়িত হয় অর্ধেক রাত পর্যন্ত। আর ফজরের সালাতের প্রথম সময় শুরু হয় প্রথম উষার উদয়লগ্নে এবং এর শেষ সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা

সালাতের সময়সূচির ব্যাপারে আরো অধিকতর সতর্ক থাকার জন্য এখানে আরো একটি হাদীসের উদ্বৃতি দেওয়া হল। যদিও হাদীস দু'টির বিষয়বস্তু প্রায় একই।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় এবং এর আরম্ভ ও শেষ সময় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) এ হাদীসের কথাগুলো বলেছেন। হাদীসটি পাঠ করলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, নবী করীম (সা) যাঁদের সম্মুখে সালাতের সঠিক সময়ের এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তাঁরা সালাতের সময় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সে কারণেই কথার ধরন এমন হয়েছে যেমন আসরের সালাতের প্রথম সময় শুরু হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'আসরের সালাতের সময় শুরু হয় ঠিক এর সময় সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।' আসরের সালাতের শেষ সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে- তা তখন পর্যন্ত থাকে, যখন সূর্যরশ্মি হরিৎ বর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের সালাতের জন্য ভালো ও পছন্দসই সময়। কিন্তু এর পর যে আসরের সালাত আর পড়া যাবে না এমন নয়। কেননা প্রয়োজনের সময় সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত এ সালাত আদায় করা যেতে পারে। তবে সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করার পূর্বেই আসরের সালাত পড়ে নেয়া বাঞ্ছনীয়। আর যদি কারো পক্ষে যথাসময়ে আসরের সালাত আদায় করে নেওয়া বিশেষ কোন কারণে সম্ভবপর না হয়, তবে সে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত আদায় করতে পারে। তাতেও সালাত হবে। এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর অপর দুটি বাণী স্মরণীয়। একটিতে তিনি বলেছেন-

من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر.

যে লোক সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত সালাতও পড়তে পারল, সে পুরা আসরই পেল।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر.

যে লোক সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজদাও দিতে পারল সে যেন পূর্ণ আসরই পড়তে পারল।

এর অর্থ এই যে, যদি কেউ যথাসময়ে আসরের সালাত পড়তে না-ই পারে, সময় যদি শেষ হয়েই যায়, তাহলে সে যে আসরের সালাত পড়বে না তা নয়, বরং অনতিবিলম্বে তাকে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকআত পড়তে পারলেও ধরা যাবে যে, সে সেই দিনের আসরের সালাত পড়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. কাফির ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়-

ক. সালাতের মাধ্যমে; খ. রোযার মাধ্যমে;
গ. সুন্নাত পালনের মাধ্যমে; ঘ. ইসলামের বিধান বোঝার মাধ্যমে।

২. স্বেচ্ছায় সালাত বর্জনের পরিণতি কী?

ক. শিরক; খ. কুফর;
গ. ফাসিক; ঘ. জাহিল।

৩. মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন?
ক. মদ্য অপবিত্র জিনিস; খ. মদ্য পান করা শয়তানের কাজ;
গ. মদ্যপানে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৪. মৃত্যুর পর কোন আমল সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন করা হবে?
ক. যাকাতের বিষয়ে; খ. ঈমানের বিষয়ে;
গ. সাওমের বিষয়ে; ঘ. সালাতের বিষয়ে।

৫. দৈনিক কতবার সালাত আদায় করা ফরয?
ক. পাঁচবার; খ. ছয়বার;
গ. চারবার; ঘ. তিনবার।

৬. মিরাজের রাতে প্রথমে কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল?
ক. পাঁচ ওয়াক্ত; খ. পঞ্চাশ ওয়াক্ত;
গ. পাঁচশত ওয়াক্ত; ঘ. চল্লিশ ওয়াক্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) ক'টি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন? লিখুন।
২. যারা জীবনের ভয়ে মুখে কুফরি প্রকাশ করে তাদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী? লিখুন।
৩. হাদীসের দৃষ্টিতে সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৪. হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি লিখুন।
৫. সালাত ফরয হওয়ার ইতিহাস লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কিত হাদীসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করুন।
২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার হাদীসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখুন।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হাদীসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করুন।
৪. সালাতের গুরুত্ব, সালাতের ফরয হওয়ার বিষয় এবং সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৬

যাকাত সম্পর্কিত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- এ পাঠের হাদীসগুলোর অনুবাদ করতে পারবেন
- মহানবী (সা) হযরত মুআযকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করতে পারবেন
- ঋণগ্রস্ত এবং নাবালেগ শিশুদের যাকাতের বিধান বলতে পারবেন
- যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর গৃহীত পদক্ষেপ বলতে পারবেন
- যাকাত না দেয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- যাকাত ফরয হওয়ার কারণ নির্ণয় করতে পারবেন
- যাকাত ফরয হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণ ও স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতের বিধান কি তা বলতে পারবেন।

যাকাত

عن ابن عباس (رضي الله تعالي عنه) ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذ بن جبل (رضـ) الى اليمن قال انك تأتى قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا إله الا الله و انى رسول الله فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله عز و جل افترض عليهم خمس صلوت فى كل يوم و ليلة فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة فى اموالهم تؤخذ من اغنيائهم و ترد الى فقرائهم فان هم اطاعوك لذلك فايك و كرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها و بين الله عز و جل حجاب. (بخارى. مسلم. مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) যখন হযরত মুআয (রা)-কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁকে বলেছেন ঃ তুমি আহলি কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌঁছবে। আর তাঁদেরকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ তাআলার রাসূল। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তারপর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দিনরাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয করে দিয়েছেন। তোমার এ কথাও যদি তারা স্বীকার করে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে ও তাদেরই গরীব-ফকীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তোমার এ কথাও যদি তারা মেনে নেয় তবে তাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবদ আদায় করে না নাও। আর তুমি মজলুমের দোয়াকে সব সময় ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহর মাঝখানে কোন আবরণ-অন্তরাল বর্তমান নেই। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহ্মদ)

ব্যাখ্যা

যাকাত ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের অন্যতম একটি বুনিয়াদ। সালাতের পরই যাকাতের বিষয় আলোচিত হয়েছে। সাহেবে নিসাবের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মুসলিমের উপর যাকাত আদায় করা ফরয। রাসূলে করীম (সা) দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্জে গমনের পূর্বে হযরত মুআয (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠিয়ে ছিলেন। অবশ্য কারো মতে নবম হিজরী সনে তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে হযরত মুআযকে ইয়েমেনে পাঠানো হয়েছিল। আবার কেউ বলেছেন যে, অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের বৎসর তাঁকে পাঠানো হয়। (সারহুল মুসনাদ, ৮ম খন্ড, পৃ-১৮৯)

অতঃপর হযরত মুআয (রা) ইয়েমেনেই অবস্থান করছিলেন। তিনি তথা থেকে হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে ফিরে আসেন। তাঁকে ইয়েমেনে শাসনকর্তা হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, কি বিচারপতি হিসেবে, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আবদুল বার দ্বিতীয় মত পোষণ করেন, আল-কাসানী প্রথম মত সমর্থন করেন।

মহানবী হযরত রাসূল (সা) মুআয (রা) কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় যে উপদেশ বা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আলোচ্য হাদীসে তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মুআযকে আহলি কিতাবদের সম্মুখে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করতে বলা হয়। কেননা ইসলাম ও ঈমানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে এ দুটি। এ দুটি বিষয়ে ঈমান সর্বপ্রথম আনা না হলে ইসলামের অপর কোন কাজই শুদ্ধ থেকে পারে না। আর আহলি কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক তাওহীদ বিশ্বাসী থাকলেও প্রথমত তাদের ঈমান সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহর রাসূলরূপে মেনে না নিলে সে তাওহীদ বিশ্বাসের কোনই মূল্য হয় না। এ কারণে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত সর্বপ্রথম দেওয়ার কথা শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুত যে কোন সময়ে, যে কোন যুগে যে কোন সমাজের লোকদের সম্মুখে ইসলামের এটাই প্রথম দাওয়াত। তারপরই তদনুযায়ী আমল করা, শরীঅতের হুকুম আহকাম মেনে নেয়া ও পালন করার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরই যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া ফরয তেমনি ঈমানদার ধনী লোকদের উপর নিয়মিত যাকাত আদায় করা ফরয এবং ইসলামী সরকার, হয় নিজস্ব ক্ষমতায় সরাসরিভাবে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে এ যাকাত আদায় করার অধিকারী হয়। এমতাবস্থায় কোন মুসলিম ধনী ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় না করে কিংবা যাকাত আদায় করতে রাযী না হয়, তবে ইসলামী সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে এটা আদায় করতে পারবেন।

এখানে মূল হাদীসে 'সাদকা' (صدقة) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এখানে 'সাদকা' অর্থ যাকাত, যা আদায় করা ফরয, সাধারণ দান-খয়রাত নয়। কেননা কুরআন মাজীদেও 'সাদকা' এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত সাধারণ দান খয়রাত কখনো ফরয নয় এবং তা জোর প্রয়োগে আদায় করার নিয়ম নেই। অথচ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি 'সাদকা' ফরয করে দিয়েছেন।

কুরআন মাজীদে 'সাদাকা' অর্থাৎ যাকাত ব্যয়ের আটটি খাত ঘোষণা করা হয়েছে ; কিন্তু আলোচ্য হাদীসে তন্মধ্যে মাত্র একটি খাতেরই উল্লেখ করা হয়েছে। এটা থেকে ইমাম মালিক এ মত গ্রহণ করেছেন যে, আটটি খাতের যে কোন একটি খাতে যাকাত ব্যয় করলে তা অবশ্যই জায়েয ও যথেষ্ট হবে। তবে ইবনে দাকীকুল-ঈদ এখানে একটি মাত্র খাতের উল্লেখ করার কারণ দর্শায়ে বলেছেন যে, প্রধানত ও সাধারণত ফকীর-গরীব লোকদেরকেই যাকাত দেয়া হয় বলে এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা এর অর্থ কখনো এই নয় যে, একটি খাতে যাকাত ব্যয় করলেই তা যথেষ্ট হবে।

ইমাম খাত্তাবী এ হাদীসের ভিত্তিতেই বলেছেন যে, ঋণগ্রস্ত লোকদের উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা এ ঋণ পরিমাণ সম্পদ বাদ দিলে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ সম্পদ তার নিকট অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে ধনী বলে গণ্য থেকে পারে না। তবে ঋণ আদায় করা বা ঋণ পরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পর যে পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট্য থাকবে, তা যদি যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ (نصاب) হয়, তবে তার উপর অবশ্যই যাকাত ফরয এবং তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

না-বালেগদের উপরও যাকাত ফরয। কেননা যাকাত আদায়ের কথা সাধারণভাবে সর্ব শ্রেণীর ধনীদেরই শামিল করে। শাফেয়ী মাযহাব মতে বালকদের উপর নয়, তাদের ধন-সম্পদ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। পাগল ও বুদ্ধিহীন লোকদের সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। দলীল হিসেবে একটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

الا من ولى يتيما له مال فليتجر فى ماله ولا يتركه حتى تأكله لصدقة. (ترمذى)

তোমরা জেনে রেখে, যে লোক কোন ইয়াতীমের অভিভবক হয়ে বসে, সে যেন সে ইয়াতীমের ধন-মাল মুনাফাজনক কাজে নিয়োগ করে এবং তা যেন যাকাত দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য ফেলে না রাখে।

বস্তুত ইয়াতীমের ধন-সম্পদ থেকে যে যাকাত দিতে হয়-তা কোন লাভজনক কাজে নিয়োজিত করা হোক বা না হোক, যাকাত দিতে দিতে মূল সম্পদ নিঃশেষ হোক বা না হোক একথা এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে একথা স্বীকৃত হয়নি। তাঁরা বলেছেন, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ধন-সম্পদের মালিকের সুস্থ জ্ঞন-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও পূর্ণ বয়স্ক হওয়া অনিবার্য শর্ত। অতএব না-বালেগ ও অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির ধন-মালে যাকাত ফরয নয়।

যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা) এর যুদ্ধ ঘোষণা-

عن ابى هريرة (رضـ) قال لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم و استخلف ابو بكر (رضـ) بعده و كفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب (رضـ) لابى بكر (رضـ): كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله و نفسه

الا بحقه و حسابه على الله. قال ابو بكر (رضـ): والله لا قاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب (رضـ). فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابى بكر (رضـ) للقتال فعرفت انه الحق.
(بخارى . مسلم. ترمذى. نسائى. ابوداؤد. مستد احمد)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (সা) যখন ইন্তিকাল করলেন ও তাঁর পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা (নির্বাচিত) হলেন, আর আরবদেশের কিছু লোক 'কাফির' হয়ে গেল, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন, অথচ নবী করীম (সা) তো বলেছেন ঃ 'লোকেরা যতক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মাবূদ নেই) মেনে না নিবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছে। যদি কেউ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, স্বীকার করে, তবে তার ধন-সম্পদ ও জানপ্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য এর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, যে লোকই সালাতহ ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তার বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের হক। আল্লাহর শপথ, তারা যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত এমন এক গাছি রশিও দেয়া বন্ধ করে, তবে অবশ্যই আমি তা দেয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা আর কিছু নয়। আমার মনে হল, আল্লাহ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে, এটাই ঠিক (তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন)।
(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা

এ হাদীসটি দ্বীন ইসলামের এক ভিত্তি বিশেষ। এতে কয়েক প্রকারের জরুরী ইলম সন্নিবেশিত হয়েছে। ফিকহের কয়েকটি জরুরী মাসআলাও এ হাদীস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমত হাদীসটির ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। রাসূলে করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর আরবের কয়েকটি গোত্র মুর্তাদ হয়ে যায়। এরা প্রধানত দু-ধরনের লোক ছিল। এক ধরনের লোক, যারা মূল দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে পুরোপুরি কাফির হয়ে গিয়েছিল এবং সম্পূর্ণ কুফরী সমাজের সাথে মিলিত হয়েছিল। আলোচ্য হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা) আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল বলে এদের কথাই বুঝিয়েছেন। আর মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসের ভাষা হল- وارتد من ارتد কিছু লোক মুর্তাদ হয়ে গেল। এ লোকগুলো আবার দু দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল মুসায়লিমাতুল কায্যাব ও আসওয়াদুল আনাসীর মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। এরা সকলেই হযরত মুহাম্মদের (সা) নবুওয়াত অমান্য করেছিল এবং তাঁর বিরোধী ব্যক্তিদের নবুওয়াত দাবী সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এ যুদ্ধের ফলে মুসায়লিমা ও আসওয়াদ উভয়ই নিহত হয় এবং তাদের দলবল নির্মূল হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয় দলে ছিল সেসব লোক, যারা দ্বীন ইসলামের আইন বিধান পালন করতে অস্বীকার করে। তারা সালাত ও যাকাত ইত্যাদি শরীঅতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম অমান্য করে ও জাহিলিয়াত যুগের মতই সম্পূর্ণ বে-দ্বীন হয়ে জীবন যাপন করতে শুরু করে। এর দরুন তখনকার সময়ে পৃথিবীর বুকে মক্কার মসজিদ, মদীনার মসজিদ ও বাহরাইনের 'জাওয়াসাই' নামক গ্রামে অবস্থিত 'মসজিদে আবদুল কাইস'-এ তিনটিই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করার জন্য অবশিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের লোক ছিল তারা, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করত। তারা সালাতকে ফরয হিসেবে মানত। কিন্তু যাকাত আদায় করা ও তা বায়তুলমালে জমা করানো ফরয মনে করত না। আসলে এরাই ছিল বিদ্রোহী দল। কিন্তু সেকালে তাদেরকে 'বিদ্রোহী' নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। কেননা তখন এরা সাধারণ মুর্তাদের মধ্যেই গণ্য হত। এদের মধ্যে এমন লোকও অবশ্য ছিল, যারা যাকাত দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এজন্য তাদেরকে বাধা দান করেছিল।

যে বিদ্রোহী লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করত, তাদের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা কুরআনের একটি আয়াতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আয়াতটি এই ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا – التوبة-١٠٣)

হে নবী ! তাদের ধন-মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। এর সাহায্যে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন। (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

বস্তুত যাকাত দেয়া যে কত বড় ফরয এবং তা না দিলে বা দিতে অস্বীকার করা হলে ইসলামী রাষ্ট্রকে যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়, এ হাদীস থেকে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهز متيه يعفى شد قميه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم قال. ولا يحسبن الذين (الاية). (بخارى. نسائى)

হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার ধন-মাল তার জন্য অধিক বিষধর সর্পের আকার ও রূপ ধারণ করবে। এর কপালের উপর দুটি কালো নমুনা কিংবা দুটি দাঁত বা দুটি শৃঙ্গ থাকবে। কিয়ামতের দিন তা তার গলায় পেচিয়ে দেওয়া হবে। অতপর তা তার মুখের দুপাশ, দুগাল কিংবা দু কর্ণলগ্ন মাংসপিন্ডের গোশত খাবে ও বলতে থাকবে- আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত-সম্পত্তি। অতপর নবী করীম (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন- (এর অর্থ) যারা কার্পণ্য করে তাদের সম্পর্কে ধারণা করিও না। (বুখারী, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা

হাদীসটির সর্বপ্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হল, দুনিয়ায় যার নিকট যতটুকু ধন-সম্পদ রয়েছে তা সবই আল্লাহর দান। আল্লাহ তাআলা তাকে তা দিয়েছেন বলেই সে তা পেরেছে। আল্লাহ তাআলা না দিলে কারো পক্ষে কিছু পাওয়া সম্ভবপর হত না। অতএব ধন-সম্পত্তির যে কেউ মালিক হবে তারই প্রথম কর্তব্য হল ওটাকে আল্লাহর দান মনে করা।

দ্বিতীয়ত যে আল্লাহ তা দিয়েছেন, তিনিই এর প্রকৃত মালিক। যার নিকট ধন-সম্পদ আছে, সে ওটার প্রকৃত মালিক নয়। কেননা সে ওটা সৃষ্টি করেনি। আর যে যা সৃষ্টি করেনি, সে তার প্রকৃত মালিক থেকে পারে না। অতএব আল্লাহর এ মালিকানায় আল্লাহরই মর্যী চলবে। আল্লাহর আইন বিধান অনুযায়ীই এর বণ্টন ও ব্যয় থেকে হবে। এর উপর অন্য কারো নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলতে পারে না।

আল্লাহ মানুষকে ধন-সম্পত্তি দান করেছেন অতপর তিনি এর উপর সর্বপ্রথম যাকাত ধার্য করেছেন।

যাকাত শব্দের অর্থ-

زكوة শব্দটির আভিধানিক অর্থ- النماء বৃদ্ধি। ক্ষেতের ফসল যখন সবুজ শ্যামল সতেজ হয়ে উঠে তখন আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ زكا الزرع কৃষি ফসল শ্রী-বৃদ্ধি লাভ করেছে। এর আর একটি অর্থ হচেছ- الطهارة পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ.

"সে ব্যক্তি নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে।" (সূরা আল-আলা : ১৪)

এ পবিত্রতা অর্জনকেই যাকাত বলা হয়। এর নাম 'যাকাত' রাখা হয়েছে এজন্য যে-

لان مؤد بها يتزكى الى الله اى يتقرب اليه بمصالح العمل.

যাকাত আদায়কারী আল্লাহর কাছে পরিশুদ্ধতা লাভ করে অর্থাৎ নেক ও কল্যাণকর কাজের সাহায্যে সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।

আর যে লোক কল্যাণকর কাজের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সে আসলে আল্লাহর দিকেই পরিশুদ্ধতা পায়। ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়ার ফলে উহাতে যে শ্রী-বৃদ্ধি ঘটে, যে বরকত পরিদৃষ্ট হয়, সে দৃষ্টিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে।

শরীঅতের পরিভাষায় 'যাকাত' বলতে বোঝায় -

ايتاء جزء من النصاب الحول الى فقير.

সম্পদের বাৎসরিক পরিমাণের একটা অংশ গরিব-মিসকীন এমন ব্যক্তিকে আদায় করে দেওয়া।

এ দেওয়ার মূল কথা হল ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কেবল আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে-আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেওয়া।

যাকাত ফরয হয় এমন পরিমাণ ধন-সম্পদ নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি বৎসরকাল যার মালিকানাধীন থাকবে, তাকেই যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত দানের লক্ষ্য

سقوط الواجب فى الدنيا و حصول الثواب فى الاخرة.

দুনিয়ার বুকে আবশ্যিক কর্তব্য পালন এবং পরকালে প্রতিফল লাভ।

এ যাকাত নিয়মিত আদায় করা আল্লাহ তাআলার দেয়া ফরয-অবশ্য করণীয় কর্তব্য। কুরআন মাজীদে বহুবার اتوا الزكوة 'যাকাত দাও' বলে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) যাকাত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ও অপরিহার্য কর্তব্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নানাভাবে এবং বহুবিধ ভাষায় করেছেন।

ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা যাবে না

عن بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما من احد لا يؤدى زكوة ماله الا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع حتى يطوق به فى عنقه. (ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলে করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, তার সম্পদ কিয়ামতের দিন বিষধর স্বর্পের রূপ পরিগ্রহ করবে। শেষ পর্যন্ত সে সর্পটি তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা

উপরে উল্লিখিত কয়টি হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ফরয। তা যথাযথভাবে আদায় না করার পরিণাম সালাত আদায় না করার পরিণতি থেকেও অধিক ভয়াবহ ও সাংঘাতিক। কেননা যাকাত আদায় না করার যে কঠিন, কঠোর ও নির্মম পরিণতির কথা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট-বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, তা সালাত আদায় না করা পর্যায়ে ঘোষিত হয়নি। এ পর্যায়ে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি স্মরণীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দাও। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে এবং সেদিন বলা হবে, এগুলো তা তোমরা যা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। সুতরাং তোমরা জমা করেছিল তা আস্বাদন করো। (সূরা আত-তাওবা : ৩৪-৩৫)

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়

عن خالد بن اسلم (رضـ) قال خرجنا مع عبد الله بن عمر (رضـ) فقال أعرابى اخبرنـى قول الله: و الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله قال ابن عمر (رضـ) من كنزها فلم يؤد زكوتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكوة فلما انزلت جعلها الله طهورا للاموال. (بخارى – نسائى)

হযরত খালিদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন এক আরব বেদুঈন - আল্লাহর বাণী 'যারা স্বর্ণ ও রোপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না এর প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা আমাকে বলুন। তখন ইবনে উমর বললেন- যে লোক তা সঞ্চয় করে রাখে এবং এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য বড়ই দুর্ভোগ। আসলে একথা প্রযোজ্য ছিল যাকাতের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে। পরে যখন যাকাত সম্পর্কিত বিধান নাযিল হল তখন আল্লাহ তাআলা তা ধন-সম্পদকে পবিত্রকরণের মাধ্যম বানিয়ে দিলেন। (বুখারী, নাসাঈ)

ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট জনৈক বেদুঈন কুরআনের উল্লেখিত আয়াতটির তাৎপর্য বুঝতে চাচ্ছিলেন। এর জবাবে তিনি তিনটি কথা বলেছেন। একটি হল, কুরআনে ব্যবহৃত كنز শব্দটির প্রয়োগ ও ব্যবহারিক অর্থ। দ্বিতীয়টি হল, এ আয়াতটির প্রয়োগক্ষেত্র বা সময়সীমা এবং তৃতীয় হল, যাকাতের ব্যবহারিক মূল্য। হযরত ইবনে উমর প্রথমত যাকাত না-দেয়া লোকদের জন্য ويل 'অয়লুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ ঃ দুঃখ, ধ্বংস, আযাবের জ্বালা-যন্ত্রণা-কষ্ট। আর তাঁর কথা অনুযায়ী আয়াতটির অর্থ হল ঃ 'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের জন্য দুঃখ-ধ্বংস, আযাবের জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট রয়েছে অর্থাৎ যাকাত না-দেয়া সঞ্চিত সম্পদকে আরবি পরিভাষায় كنز বলা হয়।

বস্তুত যাকাতের কল্যাণ ও উপকারিতার তিনটি দিক অত্যন্ত সুস্পষ্ট। **প্রথমত** এই যে, মু'মিন বান্দা সালাতে দাঁড়িয়ে ও রুকু সিজদা করে আল্লাহর সম্পর্কে নিজের দাসত্ব বন্দেগী ও বিনয়াবনত ভাবের বাস্তব প্রকাশ ঘটায়। আল্লাহর সন্তোষ, রহমত ও নৈকট্য লাভের জন্য মন-মানসিকতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আকুল আকুতি জানায়। যাকাত আদায় করে বান্দা ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহর দরবারে নিজের ধন-সম্পদের অর্ঘ্য পেশ করে। সেসঙ্গে একথারও বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপিত করে যে, যেসব ধন-সম্পদ তার করায়ত্ত তার প্রকৃত মালিক সে নিজে নয়, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। যাকাত এ হিসেবেই ইসলামের মৌল ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

যাকাতের **দ্বিতীয় দিক হল**, এর সাহায্যে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা হয়। কেননা আসলে এটা ধনীর ইচ্ছা বা মর্যীর উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের ব্যাপার নয়। ধন-সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আল্লাহর হকও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে। সম্পদের এ অংশ ধনীর হাতে থাকলেও আসলে সে এর মালিক বা অধিকারী নয়। সে যখন এ অংশ মূল সম্পদ থেকে আলাদা করে নির্দিষ্ট উপায়ে আদায় করে দেবে তখনই সে সেই মূল সম্পদ হালালভাবে ব্যয় এবং ব্যবহার করার অধিকারী হবে, তার পূর্বে নয়। এদিক দিয়ে যাকাত মানুষের নৈতিকতার একটা বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

তৃতীয় দিক হল, যাকাতদাতার মন-মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন। ধন-সম্পদকেই উপাস্যের উচ্চ মর্যাদায় সংস্থাপন করে। অপরদিকে তা মানুষকে বানায় হাড়-কৃপণ। আর এ দুটিই ব্যক্তির ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী- ঈমানের পবিত্র ভাবধারার পক্ষে এটা অত্যন্ত মারাত্মক। এটা ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও চরিত্রকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করে। মানুষকে যেমন বানায় অর্থলোভী তেমনি বানায় দয়ামায়াহীন কৃপণ। অর্থ তার চরিত্রকে চরমভাবে পংকিল ও কলুষিত করে দেয়। নিয়মিত যাকাত আদায় একদিকে তার মনের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করে। অপরদিকে গন্ধময় বিষাক্ত প্রভাব থেকে ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও মানসিকতাকে পরিচ্ছন্ন পবিত্র ও মহান করে তোলে।

যাকাত ফরয হওয়ার কারণ

عن ابن عباس (رضـ) قال لما نزلت هذه الاية. والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر (رضـ) انا افرج عنكم فانطلق فقال: يا نبى الله انه كبر على اصحابك هذه الاية. فقال ان الله لم يفرض الزكوة الا ليطيب ما بقى من اموالكم و انما فرض المواريث

لتكون لمن بعد كم فكبر عمر (رضـ) ثم قال: الا اخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته و اذا امرها اطاعته و اذا غاب عنها حفظته. (ابوداؤد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কুরআনের আয়াত- 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে ও তা আল্লাহর পথে খরচ করে না'- যখন নাযিল হল, (-এতে ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারীদের পরকালে কঠিন শাস্তি হওয়ার কথা বলা হয়েছে), এ কারণে সাহাবায়ে কিরামের মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ল এবং তাঁরা চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হযরত উমর (রা) তা বুঝতে পেরে বললেন ঃ আমি তোমাদের এ চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করতে চেষ্টা করব। অতঃপর তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! এ আয়াতটির কারণে আপনার সাহাবীগণ বিশেষ চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা যাকাত এ উদ্দেশ্যে ফরয করেছেন যে, এটা আদায় করার পর অবশিষ্ট ধন-সম্পদ যেন পবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার আইন জারী করেছেন- এ উদ্দেশ্যে যে, এর দরুন তোমাদের পরবর্তী লোকদের জন্য সম্পদের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হবে। হযরত উমর (রা) রাসূলে করীম (সা)-এর এ ব্যাখ্যা শুনে আনন্দে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। এরপর রাসূলে করীম (সা) বললেন- আমি কি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম সঞ্চয়ের কথা বলব? তা হল কোন ব্যক্তির পবিত্র স্বভাব-চরিত্রের স্ত্রী, যার দিকে সে যখন তাকাবে, সে তাকে সন্তুষ্ট করে দিবে, যখন তাকে কোন কাজের আদেশ করবে, সে তা পালন করবে। আর যখন সে তার সম্পদের নিকট থেকে অনুপস্থিত থাকবে তখন সে তার সংরক্ষণ করবে। (আবু দাউদ)

যাকাত ফরয হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণ

عن ابى سعيد ن الخدرى (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة و ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. (بخارى ابوداؤد)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ পাঁচ অসক-এর কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নেই। পাঁচ 'আওকিয়া'র কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নেই এবং পাঁচটি উষ্ট্রের কম সংখ্যায় যাকাত নেই। (বুখারী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা

নবী করীম (সা)-এর সময়ে মদীনা ও আশেপাশের যে লোক স্বচ্ছল ও ধনশালী ছিল, তাদের নিকট সাধারণত তিন প্রকারের মধ্যে যে কোন এক প্রকারের সম্পদ থাকত ঃ (১) তাদের বাগানের খেজুর (২) রৌপ্য এবং (৩) উষ্ট্র। রাসূলে করীম (সা) উপরিউক্ত হাদীসে এ তিন প্রকারের সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণের কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে প্রত্যেকটি জিনিসের যে পরিমাণ বা সংখ্যার উল্লেখ হয়েছে, তা কারো নিকট থাকলে তাতে যাকাত ফরয হবে। সে পরিমাণ বা সংখ্যার কম সম্পদ কারো নিকট থাকলে তাতে যাকাত ফরয হবে না।

খেজুর সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, উহা পাঁচ অসক-এর কম পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে না। এক 'অসক' প্রায় ছয় মণ। এ হিসেবে পাঁচ 'অসক' ত্রিশ মণের কাছাকাছি। রৌপ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ পাঁচ 'আওকিয়ার' কম পরিমাণে যাকাত নেই। এক 'আওকিয়া' পাঁচ 'দিরহাম' সমান। এ হিসেবে পাঁচ আওকিয়া দুইশত দিরহামের সমান। আমাদের দেশে চলতি ওযন হিসেবে এতে সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয় অর্থাৎ কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকলে এবং এ মালিকানায় এক বৎসর কাল অতিক্রান্ত হলে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ দিতে হবে, এটাই ফরয।

আর উষ্ট্র সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন, পাঁচটির কমে যাকাত হয় না। সেকালে ত্রিশ মণ খেজুর একটা ছোট-খাটো পরিবারে পূর্ণ বছরের খরচের জন্য যথেষ্ট হত। অনুরূপভাবে দুইশত দিরহাম পরিমাণের নগদ অর্থে বছরের খরচ চলে যেত। এ মূল্যমানের দৃষ্টিতে পাঁচটি উষ্ট্রের মালিককেও সচ্ছল অবস্থায় যাকাত দিতে সক্ষম ব্যক্তি মনে করা হত।

যাকাত দেয়ার নির্দিষ্ট তারিখে যে লোক ৮৭.৫ গ্রাম স্বর্ণ কিংবা ৬১২.৫ গ্রাম রৌপ্যের কিংবা সম পরিমাণ মূল্যের নগদ অর্থ থাকবে, কিংবা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত পণ্য দ্রব্যের মালিক থাকবে, তার উপরই যাকাত ফরয, সে নিসাব পরিমাণের মালিক।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

عن على بن ابى طالب (رضـ) عن النبى صـلى اللـه عليـه و سلم قـال: اذا كانـت لـك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم و ليس عليك شئ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينـارا فـاذا كانـت لك عشرون دينـارا و حـال عليهـا الحـول ففيها نصف دينار. (ابوداؤد)

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন: তোমার যখন দু'শত দিরহামের সম্পদ হবে এবং এর এ অবস্থায় একটি বৎসর কাল অতিবাহিত হবে তখন এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম। আর স্বর্ণে কোনই যাকাত হবে না যতক্ষণ না এর অর্থমূল্য বিশ দীনার হবে। তাই তোমার সম্পদ যখন বিশ দীনার হবে ও এ অবস্থায় একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন এতে অর্ধ দীনার যাকাত ফরয হবে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা

দু'শত দিরহামের মালিকানা এক বৎসরকাল পর্যন্ত থাকলে তা থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত বাবদ দিতে হবে। এটা সর্বসম্মত মতামত। আর অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে স্বর্ণের নিসাব-যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ 'বিশ দীনার' অর্থ ২০ মিসকাল। কেননা এক দীনার স্বর্ণমুদ্রার ওযন এক মিসকাল। এ হিসেবে ২০ দীনারের ওযন বিশ মিসকাল হবে। এক মিসকাল সাড়ে চার মাশা। আর মিসকালে সাড়ে সাত তোলা ওযন হবে। এ হিসেবে কোন দ্বিমত নেই। আর আড়াই ভাগ যাকাত তথা ৪০ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ কারো মালিকানায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ এক বছর কাল অতিবাহিত হলে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ আদায় করা ফরয।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মহানবী (সা) ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন?

ক. হযরত আবু বকর (রা)-কে; খ. হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা)-কে;
গ. হযরত মুআয (রা)-কে; ঘ. হযরত উমর (রা)-কে।

২. মহানবী (সা) মুআয (রা)-কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন-

ক. শাসনকর্তা হিসেবে; খ. বিচারপতি হিসেবে;
গ. সেনাপতি হিসেবে; ঘ. ক ও খ নং উত্তর সঠিক।

৩. সাহিবে নিসাব বলা হয়-

ক. মালদার ব্যক্তিকে; খ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে;
গ. যাকাত দেয়ার মতো সম্পদ ১ বছর সঞ্চয়কারীকে; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৪. হাদীসে বর্ণিত 'সাদাকা' দ্বারা বোঝানো হয়েছে-

ক. দান-খয়রাত; খ. সাদাকাতুল ফিতর;
গ. যাকাত; ঘ. ট্যাক্স।

৫. যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন-

ক. হযরত উমর (রা); খ. হযরত ইমাম হোসাইন (রা);
গ. হযরত আবু বকর (রা) ঘ. হযরত মুআবিয়া (রা)।

৬. বাহরাইনে অবস্থিত মসজিদটির নাম কি?

ক. মসজিদে কুবা; খ. মসজিদে দেরার;
গ. মসজিদে নামেরা; ঘ. মসজিদে আবদুল কায়েস।

৭. যাকাত শব্দের অর্থ- হচেছ-

ক. শ্রী বৃদ্ধি; খ. কৃষি ফসল বৃদ্ধি;
গ. সম্পদের পবিত্রতা; ঘ. সকল উত্তরই সঠিক।

৮. 'অয়লুন' শব্দের অর্থ হচেছ-

ক. কষ্ট; খ. দুর্ভোগ;

গ. যাকাত না দেওয়া; ঘ. ক ও খ উত্তর সঠিক।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মুআয (রা)-কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন হাদীসের আলোকে তা লিখুন।
২. হাদীসের আলোকে ইয়াতিম ও নাবালেগের যাকাত সম্পর্কে লিখুন।
৩. হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব লিখুন।
৪. যাকাত না দেওয়ার পরিণতি লিখুন।
৫. যাকাত শব্দের শাব্দিক ও পরিভাষাগত অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।
৬. হাদীসের আলোকে ধন-সম্পদ পূঞ্জীভূত করে রাখার পরিণতি লিখুন।
৭. ব্যাখ্যা করুন- 'যাকাত ধন-সম্পদ পবিত্রকরণের মাধ্যম'।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব, যাকাতের নিসাব, যাকাত আদায় না করার পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৭

সাওম সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রমযানের আগমন সম্পর্কিত হাদীসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- রমযান শব্দের ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- রমযানের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- রোযা রাখা এবং রোযা ভঙ্গ করা চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল- সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন
- রমযানের রোযা রাখার পরকালীন ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন
- কা'দের জন্য রমযানের রোযা কাযা করার ও না রাখার অনুমতি রয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।

রমযান মাসের গুরুত্ব

عن سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى اخر يوم من شعبان. فقال: يا ايها الناس! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من الف شهر. جعل الله صيامه فريضة و قيام ليلته تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. و من ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه. و هو شهر الصبر. والصبر ثوابه الجنة و هو شهر المواساة. و شهر يزاد فيه رزق المؤمن . من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شى . قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يعطى الله! هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء . و من اشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظماء حتى يدخل الجنة و هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة و أخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار. (بيهقى. فى شعب الايمان)

হযরত সালমান আল-ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, হে মানব মন্ডলী ! এক মহাপবিত্র ও বরকতের মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করতে চলছে । এ মাসের একটি রাত বরকত ও ফযীলত- মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক দিয়ে সহস্র মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ মাসের রোযা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন এবং এর রাতগুলো আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে ব্যক্তি এ রাতে আল্লাহর সন্তোষ ও তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন অ-ফরয ইবাদত-সুন্নাত বা নফল আদায় করবে, তাকে এর জন্য অন্যান্য সময়ের ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে ফরয আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরযের সমান সওয়াব লাভ করবে। এটা সবর, ধৈর্য ও ত্যাগের মাস। আর সবরের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহর নিকট জান্নাত পাওয়া যাবে। এটা পরস্পর সহৃদয়তা, সহমর্মীতা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মু'মিনের রিযক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার ফলস্বরূপ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে ও জাহান্নাম থেকে তাকে নিস্কৃতি দান করা হবে। আর তাকে আসল রোযাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে। কিন্তু সেজন্য আসল রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না। আমরা নিবেদন করলাম- হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই

রোযাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য রাখে না। এ দরিদ্র লোকেরা এ সওয়াব কিভাবে পেতে পারে ? তখন রাসূলে করীম (সা) বললেন- যে ব্যক্তি রোযাদারকে একটা খেজুর, দুধ বা এক গদ্বাস সাদা পানি দ্বারাও ইফতার করাবে, সে লোককেও আল্লাহতাআলা এ সওয়াবই দান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার 'হাওয' থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।

এটা এমন এক মাস যে, এর প্রথম দশদিন রহমতের বারিধারায় পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় দশদিন ক্ষমা ও মার্জনার জন্য এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট।

আর যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের অধীনস্ত লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা দান করবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি ও মুক্তি দান করবেন। (বায়হাকী-শুআবিল ঈমান)

ব্যাখ্যা

হাদীসটি হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর একটি দীর্ঘ ভাষণ। ভাষণটিতে রমযান মাস আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। একে এ মাসটির সম্বর্ধনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। রমযান মুসলিম জাহানের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের আগমনে মুসলিম জীবন ও সমাজে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ দৃষ্টিতেই রাসূলে করীম (সা)-এর এ মূল্যবান ভাষণটি বিবেচ্য।

ভাষণটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলিল ভাষায় দেয়া হয়েছে। হাদীসটি বুঝতে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এটা সত্ত্বেও এখানে কয়েকটি অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এ ভাষণে সর্বপ্রথম রমযান মাসকে একটি বিরাট মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনে বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ. (البقرة – ١٨٥)

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

কুরআনের এ বাক্য থেকেই রমযান মাসের গুরুত্ব ও মহাত্ম স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ মাসে কেবল যে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে তাই নয়, অন্যান্য বহু আসমানী কিতাবও এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন-

نزلت صحف ابراهيم اول ليلة من رمضان وانزلت التوراة لست مضين والا نجيل لثلاث عشرة و القران لاربع عشرين. (مسند احمد . الطبرانى)

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ রমযান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হয়েছে। তাওরাত কিতাব রমযানের ছয় তারিখ দিবাগত রাত্রে, ইঞ্জীল এ মাসের তের তারিখে এবং কুরআন মাজীদ রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে নাযিল করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)

বস্তুত আল্লাহর কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার সাথে রমযান মাসের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে এ মাসে রোযা থাকাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। কুরআনের পূর্বোদ্ধৃত আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

"তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা রাখে।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)

এ আয়াত ও অপর এক আয়াতে মুসলমানদের প্রতি রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয করে দেওয়া হয়েছে। এটা দ্বিতীয় হিজরী সনের কথা। মুসলমানগণ ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনে দৃঢ় এবং আল্লাহর আনুগত্যে অপরিসীম নিষ্ঠাবান হয়ে গড়ে ওঠার পরই রোযার মত একটি কষ্টসাধ্য ফরয পালনের নির্দেশ দেয়া হয়। এতে আল্লাহর বিজ্ঞানসম্মত কর্মনীতির মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্ণিত হাদীসে রমযান মাসের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রথম যে কথাটি বলা হয়েছে, তা হলো ঃ এ মাসে এমন একটি রাত আসে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ রাত্রিটি হল 'কদর' এর রাত্রি। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. (القدر-٣)

কদর রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (সূরা আল-কদর : ৩)

কদর রাত্রিটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহর অনুগত ও আল্লাহর সন্তোষ লাভে উৎসাহী লোকেরা এ একটি মাত্র রাত্রিতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের দূরত্ব এত সহজে অতিক্রম করতে পারে, যা প্রাচীনকালে শত শত রাত্রিতে অতিক্রম করা সম্ভব হত না। এটা সর্বজনজ্ঞাত। অনুরূপভাবে 'কদর' রাত্রিতে আল্লাহর সন্তোষ ও তাঁর নৈকট্য লাভ এতটা সহজ ও দ্রুত সম্ভব হয় যা সত্যানুসন্ধিৎসুরা শত শত মাসেও লাভ করতে পারে না।

এ দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (সা)-এর এ কথাটির তাৎপর্যও অনুধাবন করার মতো যে, তিনি বলেছেন, এ মাসে যে লোক কোনরূপ নফল ইবাদত করবে, সে এ নফল ইবাদতে অন্যান্য সময়ের ফরয আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করবে। আর এ মাসের একটি ফরয আদায় করার সওয়াব অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান হয়ে থাকে। এটা যে কত বড় কথা তা অবশ্যই লক্ষ্মণীয়।

মহানবী (সা) -এর এ ভাষণে রমযান মাস সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'এ মাস সবর-এর মাস'। অর্থাৎ এ মাসের করণীয়-রোযা পালন-'সবর' অর্থাৎ ধৈর্য, সহনশীলতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাস। বস্তুত 'সবর' না হলে রোযা পালন কিছুতেই সম্ভব নয়। লোভ সংবরণ না করলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার থেকে নিজেকে বিরত রাখা অসম্ভব। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য না থাকলে ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালা-যন্ত্রণা কেউ সহ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ মাসের একটানা দীর্ঘ সময়ের রোযা পালন মানুষকে ধৈর্য শিক্ষা দেয়, সহনশীলতার গুণ উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে। ক্ষুৎ-পিপাসা মানুষকে কতখানি কষ্ট দেয় তা রোযা পালনের মাধ্যমে হাড়ে হাড়ে অনুভব করা যায়। সমাজের সাধারণ দরিদ্র লোকদেরকে খাদ্যের অভাবে যে কি কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাওয়া যায় রোযা রাখার মাধ্যমে। ফলে দরিদ্র ও ক্ষুধা-কাতর মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জাগ্রত হওয়া রোযা পালনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। রোযার সামাজিক কল্যাণের এটা একটি দিক মাত্র।

এ বরকতের মাসে ঈমানদার লোকদের রিযক্ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়- রাসূলে করীম (সা) একথা ঘোষণা করেছেন। বস্তুত রিযক দান এক আল্লাহর নিজস্ব ক্ষমতা- ইখতিয়ারের ব্যাপার। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন-

ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ . (الرعد-٢٦)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন। (সূরা আর-রাদ : ২৬)

কাজেই তিনি যদি কারও রিযক প্রশস্ত করে দেন, তবে তাতে বাধাদানের ক্ষমতা কারো থাকতে পারে না। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ কথার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। বস্তুতঃ রোযার মাসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যতটা প্রশস্ততা আসে, ততটা অন্যান্য সময় কল্পনাও করা যায় না। এ মাসে একে অন্যকে উদারভাবে খাদ্য দান করে এবং একজন অপরজনের জন্য অকুণ্ঠ চিত্তে অর্থ ব্যয় করে। এর ফলে সাধারণ সচ্ছলতা সর্বত্র পরিলক্ষিত থেকে থাকে। আর গোটা সমাজও এ প্রাচুর্যে বিশেষভাবে লাভবান হয়। এটা দ্বারা জনগণকে এ শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ধন-সম্পদ আটক ও পুঞ্জীভূত করে না রেখে সমাজে যত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যাবে, উহার সাধারণ কল্যাণ ততই ব্যাপক হবে এবং প্রত্যেকের সচ্ছলতাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহরই সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে রোযা পালনকারীদের প্রতি এটা যে তার একটা বিশেষ অনুগ্রহমূলক ব্যবস্থা, তা স্বতঃসিদ্ধ।

ভাষণটির শেষভাগে বলা হয়েছে- রমযান মাসের প্রথম অংশ রহমতে পরিপূর্ণ, মধ্যম অংশ মাগফিরাত লাভের অবকাশ এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়।

এ কথাটির মোটামুটি তাৎপর্য এ থেকে পারে যে, রমযান মাসের বরকত ও মর্যাদা লাভে আগ্রহী লোক তিন প্রকারের থেকে পারে। এক শ্রেণীর লোক, যারা স্বতঃই তাকওয়া-পরহেযগারী সম্পন্ন এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্ত যত্নবান হয়ে থাকে। তারা কোন ভুলত্রট্টি করলে চেতনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাওবা ইস্তিগফার করে নিজেদেরকে সংশোধন ও ত্রট্টিমুক্ত করে নেয়। এ ধরনের লোকদের প্রতি রমযান মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রমযানের প্রথম রাত্রিতেই রহমতের বারিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সব লোক, যারা প্রথম শ্রেণীর লোকদের মত উচ্চমানের তাকওয়া-পরহেযগারী সম্পন্ন না হলেও একেবারে খারাপ লোক নয়। তারা রমযান মাসের প্রথম ভাগে রোযা পালন, তাওবা-ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা উন্নত এবং নিজেদেরকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত পাওয়ার যোগ্য করে নেয়। তখন এ মাসের মধ্যম অংশে এদেরও ক্ষমা করে দেয়া হয়। তৃতীয় পর্যায়ে সেসব লোক, যারা সাধারণত গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে এবং নিজেদের অব্যাহত পাপ কার্যের দরুন জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। তারাও যখন রমযান মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে রোযা রেখে, তাওবা ইস্তিগফার করে নিজেদের পাপ মোচন করে নেয় তখন

শেষ দশদিন - আল্লাহর রহমত যখন সর্বাত্মক হয়ে বর্ষিত হয়- তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী রমযান মাসের প্রথমাংশের রহমত, দ্বিতীয়াংশের মাগফিরাত এবং শেষাংশের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ উপরোল্লিখিত লোকদের সাথেই সংশ্লিষ্ট বলে মনে করতে হবে। (তাফসীরে কুরতুবী ও মাআরিফুল হাদীস)

এ মাসে চারটি কাজ গুরুত্ব সহকারে করা আবশ্যক- আল্লাহর ইলাহ্ তাওহীদ ও মা'বুদ (দাস) হওয়ার কথা বারবার স্বীকার্য ও ঘোষণা করা, তাঁর নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাতের প্রার্থনা করা, জান্নাত পাওয়ার জন্য দোয়া করা এবং জাহান্নাম থেকে বেশি বেশি মুক্তি চাওয়া। অন্য কথায়, আল্লাহর আল্লাহ হওয়া ও এর মুকাবিলায় নিজের বান্দা হওয়ার অনুভূতি বেশী প্রকাশ করা এবং নিজের জীবনের সমস্যাবলী বারবার আল্লাহর সামনে পেশ করা আবশ্যক।

রমযান মাসের গুরুত্ব

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قار رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم و تغلق فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم. (نسائى . مسند احمد . بيهقى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। এটা এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ তাআলা এ মাসের রোযা তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহরই জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা অনেক উত্তম। যে লোক এ রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী)

এ হাদীস হযরত সালমান (রা) বর্ণিত হাদীসের মতই রমযান মাসের অসীম মাহাত্ম্যের ঘোষণা করেছে। এ পর্যায়ে 'রমযান' শব্দটির ব্যাখ্যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

'রমযান (رمضان) শব্দটি رمض শব্দমূল থেকে গৃহীত। এর অর্থ 'দহন', বা 'জ্বলন'। রোযা রাখার দরুন ক্ষুৎ-পিপাসার তীব্রতায় রোযাদারের পেট জ্বলতে থাকে। এ অবস্থা বোঝানোর জন্য আরবী ভাষায় বলা হয় الصائم يرمض রোযাদার দগ্ধ হয়। এটা থেকে গঠিত হয়, الرمضاء উত্তাপের তীব্রতা'। এ অর্থই প্রকাশ করে নিম্নের হাদীসে-

صلوة الاوا بين اذا رمضت الفصال. (مسلم)

সূর্যোদয়ের পর সূর্যতাপে প্রাচীর যখন জ্বলে উঠে, তখনি আওয়্যাবীন সালাত পড়ার সময়। (মুসলিম)

আর সূর্যতাপের তীব্রতা পায়ে জ্বলন ধরিয়ে দেয় এবং ক্রমে সূর্যতাপ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে। মোটকথা رمضان অর্থ দহন, তীব্রতা এবং জ্বলে উঠা। এ অর্থের দিক দিয়ে 'রামযান' মাসটি হল অব্যাহত তীব্র দহনের সমষ্টি।

আরবী মাসের নাম নির্ধারণকালে যে সময়টি সূর্যতাপ তীব্র হওয়ার দরুন দহন বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল, সে সময়টিরই তীব্রতার সাথে এ নামকরণের পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রয়েছে। --এটা এক শ্রেণীর ভাষাবিদের ব্যাখ্যা।

অন্য লোকদের মতে এ মাসটির 'রমযান' নামকরণের কারণ হল ঃ

انه يرمض الذ نوب اى يحرقها بالأعمال الصالحة .

এ মাসে যেসব নেক আমল করা হয়, তার বিনিময়ে সমস্ত পাপ-কর্ম জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়া হয়।

অপর লোকদের মতে এ নামকরণের কারণ -

لان القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة فى امر الاخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس .

এ জন্য যে, এ মাসে লোকদের হৃদয় ওয়ায-নসীহত ও পরকাল চিন্তার দরুন বিশেষভাবে উত্তাপ গ্রহণ করে থাকে- যেমন সূর্যতাপে বালুরাশি ও প্রস্তরসমূহ উত্তপ্ত হয়ে থাকে।

আর একটি মত হল, আরব জাতির লোকেরা রমযান মাসে তাদের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করে নিত, যেন শাওয়াল মাসে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। কেননা যেসব মাসে যুদ্ধ করা হারাম, তার পূর্ববর্তী মাস হল শাওয়াল-আর এটাই রমযান মাসের পরবর্তী মাস। এ খানে রমযান নামকরণের যে ৪টি মত পেশ করা হল তার মধ্যে দ্বিতীয় মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

মাসটি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ شهر مبارك এটা অত্যন্ত 'বরকতময়' মাস। 'বরকত' শব্দের অর্থ আধিক্য, প্রাচুর্য। আর 'রমযান' মাসকে 'মুবারক' মাস বলা হয়েছে এজন্য যে, এ মাসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অশেষ কল্যাণ এবং অপরিমেয় সওয়াব ও রহমত নাযিল করেন এজন্য যে, বান্দা এ মাসেই আল্লাহর ইবাদতে সর্বাধিক কষ্টভোগ করে। ক্ষুধা ও পিপাসার মত জ্বালা এবং কষ্ট আর কিছুই থেকে পারে না। আর এ কষ্ট ও জ্বালা অকাতরে ভোগ করাই হল রমযান মাসের বড় কাজ। রমযান মাসের রোযার ন্যায় আল্লাহর নির্দিষ্ট করা অন্য কোন ইবাদতে এত কষ্ট ও জ্বালা ভোগ করতে হয় না। এজন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও সওয়াব এ মাসের ইবাদতে অনেক বেশী। আসমানের দুয়ার খুলে যাওয়ার কথাটি দুই দিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়ার রোযাদার বান্দাদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহের অজস্র ধারা বর্ষণের দিক দিয়ে এবং বান্দার দোয়া ও ইবাদত-বন্দেগীসমূহ উর্ধ্ব লোকে আরোহণ ও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। আর যেসব বড় বড় শয়তান আল্লাহর উর্ধ্বলোকের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিরন্তর চেষ্টারত থাকে, এ মাসে তারা বন্দী হয়ে থাকে। তাদের উর্ধ্বগমণ রুদ্ধ হয়ে যায়। অথবা বলা যায়- প্রকৃত নিষ্ঠাবান সচেতন সতর্ক রোযাদারের উপর শয়তানের প্রতারণা-প্ররোচনা নিষ্ফল হয়ে যায়।

এ মাসেই কদর-রাত্রি। যে রাত্রিটি একান্তভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ রাত্রিতে আল্লাহর তরফ থেকে এত অধিক কল্যাণ বর্ষিত হয়, যার সাথে হাজার মাসের রাত্রিগুলোরও কোন তুলনা হয় না এবং এ রাত্রির এ অফুরন্ত ও অপরিমেয় কল্যাণের কোন অংশই যে লোক লাভ করতে পারল না, তার মত বঞ্চিত ও হতভাগ্য আর কেউ থেকে পারে না। এ ধরনের লোক সকল প্রকার কল্যাণ ও আল্লাহর রহমত থেকে চিরকালই বঞ্চিত থেকে যাবে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ কথাই প্রতি ধ্বনিত হয়েছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন-

রমযান মাসের মধ্যে একটি রাত্রি আছে, যা হাজার মাসের তুলনায় উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, সে সমগ্র কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় কেবল সে ব্যক্তি, যে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

عن ابى امامة رضى الله تعالى عنها قال: قلت يا رسول الله مرنى بامر ينفعنى الله به فقال عليك الصوم فانه لا مثل له – (نسائى)

হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন এক কাজের কথা বলে দিন, যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে কল্যাণ দেবেন। জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, তোমার রোযা পালন করা কর্তব্য। কেননা রোযার কোন তুলনা নেই। (নাসাঈ)

ব্যাখ্যা

হাদীসের বক্তব্য অনুসারে, রোযা এক অতুলনীয় ইবাদত। অতএব রীতিমত রোযা পালন এমন এক কাজ, যা বাস্তবিকই মানুষকে কল্যাণ দান করে। বস্তুত রোযা যে এক তুলনাহীন ইবাদত, কুরআন ও হাদীসের ঘোষণাসমূহ থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। তার কারণ রোযার কোন বাহ্যিক ও দৃশ্যমান রূপ নেই। এটা সঠিকরূপে পালন করা হচ্ছে কিনা, তা রোযাদার নিজে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'এটা কেবল আমারই জন্য' অতএব আমি এর প্রতিফল দিব। ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেন-

রোযা নফসের লোভ-লালসা ও স্বাদ-আস্বাদন প্রবৃত্তি দমন করে, যা অন্য সব ইবাদত এরূপ করে না।

চাঁদ দেখে রোযা রাখা-চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضى الله تعالى عنه انه خطب فى اليوم الذى يشك فيه فقال: الا انى قد جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و سألتهم الا وانهم حدثونى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرويته وأنسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين يوما و ان شهد شاهدان مسلمان فصوموا و افطروا. (مسند احمد- نسائى)

আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সে দিন ভাষণ দিলেন, যে দিন রোযা রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। তিনি বললেন- তোমরা জেনে রেখে, আমি রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীদের মজলিসে বসেছি এবং এ ধরনের বিষয়ে আমি তাঁদের নিকট জিজ্ঞেস করেছি। এ ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও। তাঁরা আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন- তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখতে শুরু কর এবং চাঁদ দেখেই রোযা ভঙ্গ কর। আর এভাবে কুরবানী ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন কর। (উনত্রিশ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে (ও চাঁদ দেখা না গেলে) তোমরা সে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। আর যদি দু'জন মুসলমান সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তদনুযায়ী রোযা রাখ ও রোযা ভঙ্গ কর। (মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যা

চাঁদ দেখে রোযা রাখতে শুরু করা ও চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করা অর্থাৎ ঈদ করা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সমস্ত হাদীসের মূল কথা হল, চাঁদ দেখে রোযা রাখা বন্ধ করে ঈদুল-ফিতর পালন করতে হবে। তাতে শাবান মাস ও রমযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হোক, অথবা উনত্রিশ দিনের অপূর্ণ মাসই হোক না কেন। রাসূলের বাণী ঃ 'চন্দ্রের উদয় দেখে রোযা থাক, চন্দ্রের উদয় দেখে রোযা ভঙ্গ করাও থেকে এ কথা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। এটা হল ইতিবাচক কথা। এ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে-

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. (بخارى – مسلم)

তোমরা রোযা রাখবে না যতক্ষণ চাঁদ দেখতে পাবে না এবং রোযা ভাঙ্গবে না যতক্ষণ চাঁদ দেখতে পাবে না। (২৯ তারিখ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সে মাসের দিন পূর্ণ করে লও। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. (بخارى- مسلم)

চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ কর। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

এর স্পষ্ট অর্থ হল ঃ রমযানের রোযা রাখতে হবে যখন চাঁদ দেখা যাবে এবং রোযা ভাঙ্গতে হবে যখন শাওয়ালের চাঁদ দেখা যাবে।

রোযার নিয়াত

عن حفصة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له .

হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে লোক ফজরের পূর্বেই রোযার নিয়াত করল না, তার রোযা হয়নি।
(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা

এ হাদীসে রোযার নিয়াত করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা থেকে দু'টি কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একটি হল, রোযার নিয়াত অবশ্যই করতে হবে। নিয়াত করা না হলে রোযাই হবে না। আর দ্বিতীয় কথা হল- ফযরের পূর্বে নিয়াত করতে হবে। উভয় বিষয়ে ফিকাহ বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

উপরে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান হাদীস সংগ্রহকারীদ্বয় এটা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা হাদীসটিকে নবী করীম (স)-এরই বাণীরূপে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারে কুতনীও নিজ গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, একে নবী করীম (স)-এর কথা মনে করা ঠিক নয়। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটিকে হযরত ইবনে উমরের কথা মনে করাই যথার্থ। মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে হাদীসটি সহীহ সনদে উদ্ধৃত হয়েছে।

انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر.

তিনি বলেন, যে লোক ফজরের পূর্বে নিয়াত করেছে, সে ছাড়া অন্য কেউ (যেন) রোযা না রাখে।

মোটকথা, বহু সনদে হাদীসটি বর্ণিত হলেও কেবল একটি সনদ থেকেই এটাকে রাসূল কারীম (স)-এর কথা বলে জানা যায়। কিন্তু এটা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসগণ একে নবী করীম (সা)-এর কথা ও অবশ্য গ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও সকল মুহাদ্দিসীনের এটাই মত। কেননা সাহাবীরা মনগড়া কথা বলেন না, রাসূলের নিকট থেকে শোনা কথাই বলেন, এটা হাদীসশাস্ত্রের একটি মূলনীতি বিশেষ।

ইমাম যুহরী, আতা ও যুফার-এর মতে রমযান মাসের রোযার জন্য নিয়াতের প্রয়োজন নেই। কেননা রমযানে রোযা না থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্য রোগী ও মুসাফির যাদের জন্য রোযা ফরয নয়, তাদের জন্য নিয়াত করা জরুরী।

ইমাম আবূ হানীফার মতে, যে রোযার দিন নির্দিষ্ট, এর নিয়াত সেই দিনের দ্বিপ্রহরের মধ্যে করলেই চলবে। কিন্তু যে রোযার দিন নির্দিষ্ট নয় সে দিনের রোযার নিয়াত ফযর উদয় হওয়ার পূর্বে হওয়া আবশ্যক। এ মূলনীতির দৃষ্টিতে রমযান মাসের রোযার ও নির্দিষ্ট দিনের জন্য মানত করা রোযার নিয়াত সে দিনের দ্বিপ্রহরের মধ্যে করলেই কর্তব্য সম্পাদন হবে। কিন্তু কাফ্ফারা, কাযা ও অনির্দিষ্ট মানতের রোযার নিয়াত রাত্রিকালেই করতে হবে। তাঁর দলীল হল- হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়। তা শুনে নবী করীম (সা) ঘোষণা করে দিলেন যে, যে লোক কোন কিছু খেয়েছে, সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময়ে কিছুই না খায়। আর যে লোক এখন পর্যন্ত কিছুই পানাহার করেনি, সে যেন রোযা রাখে।
(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)

হযরত হাফসা (রা) বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীস সম্পর্কে হানাফী ফিকহবিদদের বক্তব্য হল- প্রথমত উক্ত হাদীসটি রাসূলে করীম (সা)-এর কথা, (مرفوع) না সাহাবীর কথা (موقوف) এ বিষয়েই মতভেদ রয়েছে। উহাকে যদি সহীহ হাদীস মেনে নেয়া যায়, তবুও বলা যায়, তাতে রোযা আদৌ না হওয়ার কথা বলা হয় নি ; বরং বলা হয়েছে রোযার সাওয়ার না হওয়ার কথা। অর্থাৎ কোন লোক যদি রমযানের রোযার নিয়াত রাত্রে না করে দিনের দ্বিপ্রহরের মধ্যে করে, তবে সে রোযার মাহাত্ম্য লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। রোযা তার হয়ে যাবে। তবে এর শুভ প্রতিফল পাবে সে সময় থেকে যখন সে নিয়াত করবে। (আল-কাওবুদ দুররী, তুহফাতুল আহওয়াজী ও আল-লুম'আত)

অন্যান্য ফিকহবিদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি অনুযায়ী আমল করা যাবে কেবল তখন, যখন দিনের বেলাই রোযা শুরু হওয়ার কথা জানতে পারবে। কেননা তখন তো আর রাত্রিকাল ফিরে পাওয়া যাবে না। ইমাম যাইলায়ী ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীও এ মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম শাওকানী লিখেছেন, হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি থেকে রাত্রিকালেই রোযার নিয়াত করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে উমর ও জাবির ইবনে ইয়াযীদ এ মত গ্রহণ করেছেন। রোযা ফরয কিংবা নফল এ ব্যাপারে তাঁরা কোন পার্থক্য করেননি। আবূ তালহা, আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেনঃ

لا يجب التبيت فى التطوع.

নফল রোযার নিয়াত রাত্রিকালে করা ওয়াজিব নয়।

হযরত আয়েশা (রা)-এর মত হল- দ্বিপহরের পর নিয়াত করলে রোযা সঠিক হবে।

রোযার পরকালীন ফল

عن ابى هريرة رضى الله تعالىعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনাসহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

ব্যাখ্যা

রমযানের রোযা ফরয। এ রোযা যথাযথভাবে রাখার জন্য এ হাদীসে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক সুসংবাদ দান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে দুটি শব্দের উল্লেখ হয়েছে। একটি ايمانا আর দ্বিতীয়টি احتسابا এখানে প্রথম শব্দটির অর্থ, নিয়াত এবং দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ দৃঢ়সংকল্প। অর্থাৎ রোযা রাখতে হবে ঈমান সহকারে এবং এ বিশ্বাস সহকারে যে, রোযা আল্লাহ তাআলাই ফরয করেছেন এবং মুসলমান হিসেবে এটা আমার উপর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এ রোযা রাখতে হবে একান্তভাবে আল্লাহর সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে, লোক দেখানোর জন্য নয় এবং তা রাখতে হবে এ আশায় যে, এজন্য আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে বিশেষ সাওয়াব ও প্রতিফল পাওয়া যাবে। উপরন্তু এজন্য মনে দুরন্ত ইচ্ছা বাসনা ও একান্তভাবে কাম্য। রোযা রাখার প্রতি একবিন্দু অনীহা ও বিরক্তিভাব থাকতে পারবে না, একে একটা বোঝা মনে করা যাবে না রোযা রাখা যতই কষ্টকর হোক না কেন। বরং রোযার দিন দীর্ঘ হলে ও রোযা থাকতে কষ্ট অনুভূত হলে একে আল্লাহর নিকট থেকে আরো বেশী সওয়াব পাওয়ার কারণ মনে করতে হবে। অতএব এমন মানসিকতা সহকারে রোযা রাখা হলে এর ফলস্বরূপ অতীতের যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

রোযা না রাখার অনুমতি

عن بن عباس رضى الله تعالى عنه فى قوله: و على الذين يطيقونه فد ية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير و المراة الكبيرة و هما يطيقان الصيام ان يفطرا و يطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا يعنى على اولا دهما افطرتا و اطعمتا .

কুরআন মাজীদের আয়াত - 'যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয়, এমন ব্যক্তির জন্য একজন দরিদ্র ব্যক্তির খাবারের বিনিময় মূল্য হিসেবে দেয়া তাদের কর্তব্য'- সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন : অত্যন্ত বয়:বৃদ্ধ ও খুব বেশী বয়সের বৃদ্ধার জন্য রোযা রাখতে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও এ সুবিধাদান করা হয়েছে যে, তারা দু'জন রোযা ভাঙ্গবে (রোযা রাখবে না)। আর প্রত্যেক দিনের রোযার পরিবর্তে একজন গরীব ব্যক্তিকে খাওয়াবে এবং গর্ভবতী ও যে স্ত্রীলোক শিশুকে দুগ্ধ সেবন করায়-এ দু'জন যদি তাদের সন্তানদের ব্যাপারে আশংকাবোধ করে, তবে তারা রোযা ভাঙ্গবে ও মিসকীনকে খাওয়াবে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা

কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি সূরা আল-বাকারার ১৮৪ নম্বর আয়াত। এ আয়াতটি সম্পর্কে তাফসীরকার ও হাদীসবিদদের মধ্যে বিশেষ মতভেদের উদ্ভব হয়েছে। উপরিউক্ত হাদীসটিতে হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত হয়েছে। তাঁর মত হল, এ আয়াতটি শাশ্বত। এর অর্থ ও তাৎপর্য চির কার্যকর। এ আয়াত

অনুযায়ী গর্ভবতী বা যে মেয়েলোক নিজের গর্ভজাত সন্তানকে দুগ্ধ সেবন করায় তাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। যে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে, তাকে রোযা রাখতে হবে। সে বিনিময় মূল্য ফিদইয়া দিয়ে রোযা রাখার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। কিন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা- যে দুগ্ধ সেবন করায় -রোযার মাসে রোযা ভাঙ্গলে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন করে মিসকিনকে খাওয়াতে হবে এবং অসুবিধার সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর রোযা কাযা করতে হবে। তাদের উপর না-রাখা রোযা কাযা করার বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সঙ্গে মিসকীন খাওয়ানোর দায়িত্ব এজন্য চাপানো হয়েছে যে, তারা নিজেদের নয়, অন্যের কারণে রোযা ভাঙ্গছে। রোযা রাখলে গর্ভস্থ কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হবে এ ভয় ও আশংকাই তাদের রোযা ভাঙ্গার মূল কারণ, পক্ষান্তরে থুরথুরে বৃদ্ধকে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও মিসকীন খাওয়ানোর দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। কেননা সে রোযা ভাঙ্গছে নিজের দৈহিক অক্ষমতার কারণে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ (র) এ মত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু যে থুরথুরে বৃদ্ধ রোযা থাকতে অক্ষম, সে শুধু মিসকীন খাওয়াবে। তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। হযরত আনাস (রা) থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি যখন খুব বেশী বয়োবৃদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেই এটা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর মতে গর্ভবতী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা না-রাখা রোযা শুধু কাযা করবে, মিসকীন খাওয়াতে হবে না। এ দুইজনের অবস্থা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত। হযরত হাসান বসরী, আতা, নাখয়ী ও যুহরী থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলেছেন, গর্ভবতী নারী রোগীর মতই শুধু রোযা করবে, মিসকীনকে খাওয়াবে না। আর শিশুকে দুগ্ধ সেবন করানোর কারণে যে স্ত্রীলোক রোযা ভাঙ্গবে, সে মিসকীনও খাওয়াবে এবং রোযা কাযাও করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

رخص للشيخ الكبير ان يفطر و يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه – (دار قطنى)

থুরথুরে নড়বড়ে বৃদ্ধকে রোযা ভাঙ্গার ও প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাকে না-রাখা রোযার কাযা করতে হবে না। (দারাকুতনী)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. রমযান সম্পর্কিত দীর্ঘ ভাষণটি মহানবী (স.) কোন মাসে দিয়েছেন-

ক. শাওয়াল মাসে; খ. শাবান মাসে;
গ. শাবান মাসের মধ্যভাগে; ঘ. শাবান মাসের শেষ দিকে।

২. কোন মাসের একটি ফরয সাওয়াবের দিক থেকে অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সমান?

ক. রামযান মাসের; খ. শাওয়াল মাসের;
গ. শাবান মাসের; ঘ. মুহাররম মাসের।

৩. তাওরাত কিতাব কখন নাযিল হয়?

ক. রমযান মাসে; খ রমযান মাসের তের তারিখে;
গ. রমযান মাসের ছয় তারিখ; ঘ. উত্তর ১ ও ২ সঠিক।

৪. কল্যাণ ও মর্যাদার দিক থেকে রমযান মাসকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

ক. তিন ভাগে; খ. দুই ভাগে;
গ. চার ভাগে; ঘ. সাত ভাগে।

৫. রমাযান শব্দের অর্থ হচেছ-

ক. পিপাসার্ত হওয়া; খ. দহন বা জ্বলন;
গ. ধৈর্য ধারণ; ঘ. আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ।

৬. রমাযানের পরবর্তী মাস কোনটি?
ক. জিলহাজ্জ; খ. শাওয়াল;
গ. শাবান; ঘ. রজব।

৭. আল-মুয়াত্তা গ্রন্থটি কার রচিত?
ক. ইমাম মালিক (র)-এর; খ. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর;
গ. ইমাম শাফেঈ (র)-এর; ঘ. ইমাম বুখারী (র)-এর।

৮. দ্বি-প্রহরের পর নিয়াত করলে রোযা সহীহ হবে- এটি কার মাযহাব?
ক. ইমাম আবু হানিফা (র)-এর; খ. হযরত আলী (রা)-এর;
গ. হযরত আয়িশা (রা)-এর; ঘ. ইমাম শাফেঈ (র)-এর;।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম- ব্যাখ্যা করুন।
২. রমাযান ধৈর্যের মাস- ব্যাখ্যা করুন।
৩. রমাযান মাসে রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়- আলোচনা করুন।
৪. রমাযান শব্দের টীকা লিখুন।
৫. রমাযান শব্দের নামকরণের সার্থকতা লিখুন।
৬. রোযার নিয়াত করা কি আবশ্যক? ইমামগণের মতভেদসহ লিখুন।
৭. রোযা না রাখার অনুমতি আছে কি? হাদীসের আলোকে লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. রমাযানের আগমন উপলক্ষে মহানবী (সা) যে দীর্ঘ ভাষণ দান করেছিলেন তার বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. হাদীসের আলোকে রমাযান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।
৩. রোযা না রাখার অনুমতি সংক্রান্ত হাদীসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখুন।

পাঠ ঃ ৮

হজ্জ সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- সংশ্লিষ্ট হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন
- হজ্জের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বলতে পারবেন
- উমরার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বলতে পারবেন
- ইবাদত হিসেবে উমরার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয

عن ابن عباس (رضـ) قال قال رسول الله صلى اللـه عليـه و سلم: يـا ايهـا النـاس ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس (رضـ) فقال افى كل عام يا رسول اللـه! قال لو قلتها نعم. لوجبت و لو وجبت لم تعملوا بهـا ولـم تستطيعوا. الحـج مـرة فمن زاد فتطوع. (ترمذى. مسند احمد. نسائى. دارمى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন: হে মানবজাতি ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ করা ফরয ? মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বললেন- আমি যদি এর জওয়াবে 'হ্যাঁ' বলি, তবে সেটাই ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি তা ওয়াজিব হয়ে যেত, তবে তোমরা তদানুযায়ী আমল করতে না। আর তোমরা তা করতে পারতেও না। হজ্জ মূলত একবারই ফরয, যদি কেউ এর অধিক করে, তবে তা নফল। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, দারেমী)

ব্যাখ্যা

হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর একটি ভাষণের উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে 'হে মানবজাতি'- রাসূলের এই সম্বোধনই এ কথা প্রমাণ করে। অবশ্য হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এ বিষয়েরই অপর একটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে-

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

আল্লাহর রাসূল (সা) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করলেন।

মুসনাদে আহমাদ-এ উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এ হাদীসের শুরুতেও এ কথার উল্লেখ রয়েছে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ প্রসঙ্গে আরও তথ্য পাওয়া যায়। তা হল, যখন কুরআন মাজীদের আয়াত-

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে-ইমরান : ৯৭) নাযিল হয়, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ভাষণ প্রদান করেন। কুরআন থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা অর্থাৎ তথায় যাওয়া-আসার মতো শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিই ফরয। কিন্তু এটা জীবনে কয়বার আদায় করতে হবে, কিংবা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ আদায় করলেই দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যাবে কিনা, তা হাদীস থেকে জানা যায় যে, হজ্জ জীবনে একবার আদায় করাই ফরয। একবার ফরয আদায় করার পরও যদি কেউ হজ্জ করে তবে তা নফল হবে এবং তাতে নফল হজ্জ পালনেরই সওয়াব পাওয়া যাবে।

হযরত আকরাম (রা)-এর মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। সেজন্যই তিনি রাসূলের কথা শোনার পরই প্রশ্নটি পেশ করেছিলেন। অন্য হাদীসের বর্ণনা মতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা) প্রশ্নটির জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেননি। বরং তিনি চুপ করেছিলেন। রাসূলের প্রথমত চুপ থাকার তাৎপর্য থেকে এটাই বুঝতে পারা যায় যে, তিনি এভাবে প্রশ্নকরাকে মোটেই পছন্দ করতে পারেননি বলে এ ধরনের ক্ষেত্রে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেন। অন্যকথায় অধিক শরীয়াতী দায়িত্ব পেয়ে বসার আশংকা রয়েছে। পূর্বেও কয়েকবার এরূপ প্রশ্ন উঠেছে। নবী করীম (সা) তা নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নবী করীম (সা) যেহেতু দুনিয়ায় শরীঅতের জরুরী জ্ঞান বিস্তারের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, এজন্য তিনি বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রশ্নকারী যখন একবার, দুবার, তিনবার প্রশ্নটি উত্থাপন করল, তখন নবী করীম (সা) বললেন- এর উত্তরে আমি 'হ্যা' বললে প্রত্যেক বছরেই হজ্জ করা ফরয হয়ে পড়ত। প্রত্যেক বছরেই হজ্জ করা হবে, না এক বছর করলেই একজনের সারা জীবনের কর্তব্য পালন হয়ে যাবে, সে সম্পর্কে ফয়সালা করার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলে করীমের (সা) উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্য তিনি জবাবে বলেছেন যে, 'আমি হ্যা' বললেই তা ওয়াজিব হয়ে যেত ; কিন্তু তোমরা তা করবে না বা করতে পারবে না। তাই জীবনে একবার হজ্জ করাকেই ফরয করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন- আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহরই জন্য হজ্জ করল এবং এ সময়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস ও কোনরূপ ফাসিকী কাজ করল না, সে তার মা কর্তৃক ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই নিষ্পাপ হয়ে গেল।

হজ্জের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। 'হজ্জ' শব্দের অর্থ- القصد 'কোন বিষয়ের বা কাজের ইচ্ছা বা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ।' খলীল বলেছেন- 'হজ্জ' অর্থ كثرة القصد الى معظم
কোন মহৎ বিরাট কাজের বারবার ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করা।

আযহারী বলেন- হজ্জ অর্থ 'কোন স্থানে একবারের পর দ্বিতীয়বার আসা'। এ কারণে মক্কা গমনকে حج البيت আল্লাহর ঘরের হজ্জ বলা হয়।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় হজ্জ শব্দের অর্থ হচেছ-

الحج قصد الى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بافعال مخصوصة .

আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে কতকগুলো বিশেষ ও নির্দিষ্ট কাজ সহকারে মহান ঘরের যিয়ারতের সংকল্প করাই হল হজ্জ। বদরুদ্দীন আইনী হজ্জের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

الحج قصد زيارة البيت على وجه التعظيم.

আল্লাহর ঘরের সম্মান ও মহত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে উহার যিয়ারতের সংকল্প করাই 'হজ্জ'।
কিরমানী হজ্জের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

الحج قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة.

কা'বা ঘরের অনুষ্ঠানাদি পালন ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করাই হজ্জ।

আল কুরআনে হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল

কুরআন মাজীদের যে আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তা হল-

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . (ال عمران. ٩٧)

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে-ইমরান : ৯৭)

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাতায়াত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়, সুযোগ-সুবিধা ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ফরয। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও হজ্জ ফরয হওয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে হজ্জ একটি। এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ১৬ জন সাহাবী কর্তৃক অত্যন্ত

নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণিত ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হয়েছে। সব কয়টি হাদীসে হজ্জকে ইসলামের পঞ্চম 'রুকুন' বলা হয়েছে এ ভাষায়-

وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا.

আল্লাহর ঘরের হজ্জ- যদি তথায় যাতায়াতের সামর্থ্য তোমার থাকে।

এ 'আল্লাহর ঘরই' হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ। আর আল্লাহর ঘর 'কা'বা শরীফ' মাত্র একটি। এজন্য হজ্জ জীবনে মাত্র একবারই ফরয। জীবনে একাধিকবার হজ্জ করা ফরয নয়। যে লোক 'হজ্জ' করে তাকে বলা হয় الحاج 'আলহাজ্জ'- 'হাজী'। কিন্তু এটা কোন পদবী বা উপাধি নয়। এর এ আলহাজ বা হাজী শব্দটি হজ্জ করার পর নামের পূর্বে ব্যবহার করা যথার্থ নয়। কারণ কেউ যদি নামায আদায় করে তবে তার নামের পূর্বে নামাযী বা যাকাত আদায় করলে তাকে যাকাত দাতা বলা হয় না। অনুরূপ হজ্জ করলে তাকে হাজী নামে ডাকা ঠিক নয়।

হজ্জ কখন ফরয হয়

কেউ কেউ বলেছেন- হজ্জ হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। কিন্তু এটা সর্বজনগ্রাহ্য কথা নয়। ইমাম কুরতুবী বলেছেন- হজ্জ ফরয হয়েছে হিজরতের পঞ্চম বৎসর। অধিকাংশ আলিমদের মত হল, হজ্জ ফরয হয়েছে ষষ্ঠ হিজরী সনে। কেননা এ সনেই কুরআনের আয়াত ঃ

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পালন করো।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯৬)

কিন্তু নবম হিজরী সনে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা অধিক সঠিক। আল্লামা মাওয়ার্দী বলেছেন- অষ্টম হিজরী সনে হজ্জ ফরয হয়েছে। হজ্জ ফরয হওয়ার তারিখ বা সাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও ইসলামের পঞ্চম বুনিয়াদ এবং সামর্থ্যবানদের উপর তা ফরয তাতে কোন মতভেদ নেই। সুতরাং ফরয হওয়ার তারিখ নিয়ে মতভেদ হজ্জ ফরয হওয়ার গুরুত্বকে খাটো করে না।

হজ্জ ও উমরার গুরুত্ব

عن عبد الله بن مسعود (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة و ليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. (ترمذى. ابوداؤد. مسند احمد. ابن خزيمة. ابن حبان)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা হজ্জ ও উমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর। কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ্-খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন রেত লৌহের মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূর বা কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিববান)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এ বাণীতে হজ্জ এবং উমরাহ উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি যা বলেছেন- উহার শাব্দিক অর্থ হল 'হজ্জ ও উমরার মধ্যে একটিকে অপরটির পরে পরে কর। অর্থাৎ এ দুটি অনুষ্ঠান কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পালন কর। এ হাদীসের নির্দেশ অনুসারে 'হজ্জে কিরান' করে এ আদেশ পালন করা যায়, নতুবা হজ্জ করে উমরা আদায় করা যায় বা উমরা করে হজ্জ করা যায়। তায়্যিবী বলেছেন, রাসূল (সা)-এর এ কথাটির অর্থ হল ঃ

اذا اعتمرتم فحجوا و اذا حججتم فاعتمروا.

তোমরা যখন উমরা সমাপন করলে তখন তোমরা হজ্জ কর, আর যখন হজ্জ অনুষ্ঠান শেষ করলে, তখন তোমরা অবশ্যই উমরা করবে।

উমরা عمرة শব্দের অর্থ الزيارة 'সাক্ষাত বা দেখার জন্য উপস্থিত হওয়া'। আর শরীঅতের পরিভাষায় - উমরাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে-

الاتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة.

পরিচিত এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলো অনুষ্ঠান বিশেষ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে পালন করা। (ইমাম শাওকানী)

মুল্লা আলী-আলকারী বলেন, শরীঅতের পরিভাষায় والسعى قصد الطواف আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা ও সাফা-মারওয়ায় দৌঁড়ানোর সংকল্প করার নাম উমরা।

হজ্জের জন্য সময় ও দিন-তারিখ নির্দিষ্ট। সেই সময় ও দিন-তারিখ ছাড়া হজ্জ আদায় হয় না। কিন্তু উমরার জন্য কোন সময় বা দিন-তারিখ নির্দিষ্ট নেই। উহা সব সময় এবং যে কোন সময়ই থেকে পারে।

কেউ কেউ হজ্জের মাসে উমরা করা মকরূহ মনে করেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ও দলীল নেই। কেননা স্বয়ং মহানবী (সা) ও হজ্জের সময় ও মাসে উমরা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) আরাফাতে অবস্থানের দিন উমরা করা মাকরূহ মনে করেছেন মাত্র।

'হজ্জে মাবরুর' বলতে বোঝায়, যে হজ্জ আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে, কিংবা যে হজ্জ উদযাপন কালে এক বিন্দু গুনাহের স্পর্শও লাগেনি, তাই 'হজ্জে মাবরুর।' বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বটে ; কিন্তু সব কথার সার একই। আর তা হল- যে হজ্জ পালনে যাবতীয় নিয়ম বিধান যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি কাজ ঠিক সেভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে যেভাবে সম্পন্ন হওয়া আল্লাহর পছন্দ এবং তাঁর সম্মতি ও সন্তোষের কারণ, তাই হজ্জে মাবরুর। হজ্জে মাবরূর শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইমাম নববী (র) বলেন ঃ

الذى لا يخالطه شئ من الاثم.

হজ্জে মাবরুর তাই, যা করার সময় কোনরূপ গুনাহ করা হয়নি।

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ, এটা ফরয। এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ বা মতবিরোধ নেই। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সা) হজ্জ ও উমরা পালনের নির্দেশ এক সঙ্গে দিয়েছেন। এ কারণে শরীঅতে উমরাহর আসল মর্যাদা কি, তা আলোচনা করা আবশ্যক। নিম্নে উমরাহর গুরুত্ব তুলে ধরা হল।

উমরার গুরুত্ব

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহর নির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছে-

وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ. (البقرة-١٩٦)

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯৬)

প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র) বলেন-

العمرة سنة ولا نعلم احدا ارخص فى تركها.

উমরা করা সুন্নাত। তা তরক করার অনুমতি কেউ দিয়েছে, এমন কথা আমার জানা নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) উমরা করা হজ্জের মতই কর্তব্য বলে মনে করতেন। তবে তাঁর মতে উমরাহ রাসূলে করীম (সা)-এর প্রবর্তিত 'সুন্নাত' এবং দলীল দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহও এমত প্রকাশ করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন- একটি লোক রাসূল (সা)- কে সালাত, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে- أواجب هو এ কাজ কি অবশ্য কর্তব্য ? জবাবে মহানবী (সা) বললেন ঃ 'হ্যা'। পরে জিজ্ঞাসা করল উমরা সম্পর্কে أواجبة هى উমরা করাও কি ওয়াজিব ? জবাবে মহানবী (সা) বললেন-

لا وان تعتمر خيرلك .

উহা ঠিক ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য নয়। তবে তুমি যদি উমরাহ আদায় কর, তা হলে উহা তোমার জন্য খুবই কল্যাণবহ হবে।

হযরত আমের ইবনে রবীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ এক উমরা থেকে আর এক উমরা পর্যন্ত এ দু'টির মধ্যবর্তীকালের সমস্ত গুনাহ ও ভুলত্রুটির জন্য উহা কাফফারা স্বরূপ। আর হজ্জে মাবরুর-এর একমাত্র প্রতিফল হল জান্নাত। (মুসনাদে আহমদ)

আলোচ্য হাদীসে হজ্জ ও উমরাহর সওয়াব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। হাদীসের প্রথমাংশে উমরাহর সওয়াব ও কল্যাণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হল, 'একটি উমরাহ থেকে আর একটি উমরাহ পর্যন্ত যে সময়, এ সময়ে যত গুনাহ খাতা হবে, তা সবই ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। অবশ্য কেবল সগীরা গুনাহই মাফ হয়ে যাবে, কবীরা গুনাহ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

العمرة الى العمرة كفرة لما بينهما. (ترمذى)

এক উমরা থেকে অপর উমরা পর্যন্ত মাঝখানে করা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (তিরমিযী)

সারকথা

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি। হজ্জ ফরয হওয়ার তারিখ সম্পর্কে উলামাদের মতভেদ রয়েছে। মহানবী (সা) জীবনে একবার হজ্জ পালন করেছেন। শারিরীক ও আর্থিক সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্য কাবা ঘরে গিয়ে হজ্জ করা ফরয। এ হজ্জ ইবরাহীম (আ.) এর সময় থেকেই পালিত হয়ে আসছে। হজ্জে গিয়ে কোন পাপাচারে ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। ইহরাম অবস্থায় কোন প্রাণী এমনকি মশা-মাছি মারাও নিষিদ্ধ। হজ্জ শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করতে হয়। আর তার বিনিময়স্বরূপ আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। হজ্জের ন্যায় উমরাহ করার গুরুত্বও কম নয়। উমরাহ করা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সুন্নাত। হজ্জ যেমন নির্দিষ্ট সময় ও দিনক্ষণ অনুসারে আদায় করতে হয় উমরাহ কিন্তু তেমন নয়। যে কোন সময়ে উমরাহ আদায় করা যায়। উমরাহর সাওয়াব হিসেবে মহানবী (সা) বলেন- এক উমরাহ করা থেকে অপর উমরাহ করা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে মানুষ যত সগীরা গুনাহ করবে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং সামর্থ্যবান মুসলমান নর-নারীদের জন্য এ আমল দু'টি করা বাঞ্ছনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. হজ্জ কোন স্তরের ইবাদত?

ক. ফরযে আইন; খ. ইসলামের ৫ম ভিত্তি;
গ. আরকানে ইসলাম; ঘ. সব ক'টি উত্তর সঠিক।

২. কেউ একাধিক হজ্জ করলে তার বিধান কী?

ক. প্রথমটি ফরয দ্বিতীয়টি সুন্নাত; খ. প্রথমটি ফরয দ্বিতীয়টি ওয়াজিব;
গ. প্রথমটি ফরয দ্বিতীয়টি মাকরূহ; ঘ. প্রথমটি ফরয দ্বিতীয়টি মুবাহ।

৩. হজ্জ শব্দের অর্থ হচেছ-

ক. নিয়াত করা; খ. কোন কাজে দৃঢ় সংকল্প করা;
গ. কোন স্থানে একবারের পর দ্বিতীয়বার গমন করা; ঘ. ২ এবং ৩ নং উত্তর সঠিক।

৪. আল্লাহর জন্যই হজ্জ ও উমরা পালন কর- এটি কার বাণী?

ক. আল্লাহর; খ. মহানবী (সা); -এর
গ. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর; ঘ. হযরত আলী (রা.)-এর।

৫. উমরা করার বিধান কী?

ক. উমরা করা ফরয; খ. উমরা করা ওয়াজিব;
গ. উমরা করা সুন্নাত; ঘ. উমরা করা মাকরূহ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হজ্জ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
২. হজ্জের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখুন।
৩. উমরা শব্দের অর্থ কী? ইবাদত হিসেবে উমরার গুরুত্ব লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হজ্জ ও উমরার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৯

উপার্জন সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- হারাম বস্তু/জিনিস খাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- হালালভাবে উপার্জন করে তা থেকে আহার করা উত্তম-এ কথার বর্ণনা দিতে পারবেন
- হারাম উপার্জন থেকে দান-সাদকাহ করার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- এ পাঠের শিক্ষা উপস্থাপন করতে পারবেন।

অবৈধ খাদ্যের দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে

عن جابر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت و كل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به. (رواه احمد والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যে গোশত হারাম বস্তু দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে সকল গোশত হারাম মাল থেকে গঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান। (আহমাদ, দারিমী ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা

আমরা যে সকল বস্তু ভক্ষণ করি, যে সকল পানীয় দ্রব্য পান করি, তার নির্যাস বা সার পদার্থ আমাদের দেহের শিরা-উপশিরায় ও রক্তে মিশে দেহকে সবল, সতেজ ও কর্মক্ষম করে। শারীরিক অবকাঠামো গড়ে তোলে এবং বৃদ্ধি ঘটায়। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রি মানব শরীর বর্ধন ও সংরক্ষণে সহায়তা করে।

আল্লাহ তাআলা এ নিখিল বিশ্বে আমাদের জীবিকার জন্য সবরকম আয়োজন করেছেন। আমাদের দেহ গঠন ও পরিপূষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন এবং তা হালাল ও বৈধ উপায়ে উৎপাদন ও উপার্জন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে বৈধ জিনিষ গ্রহণ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। মহান আল্লাহর নির্দেশ-

كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .

"তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার করো।" (সূরা আল-বাকারা : ১৭২)

আমাদের এ রিয্ক বা জীবিকা দু'রকমের। হালাল ও হারাম। হালাল বা বৈধ যির্ক গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে। আর হারাম বা অবৈধ বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার দ্রব্যের মধ্যে কিছু আছে যা এমনিতেই আমাদের জন্য খাওয়া বা গ্রহণ করা অবৈধ ও হারাম। এ হারাম বস্তু খেয়ে আমাদের যে শরীর হবে, তা জাহান্নামের উপযুক্ত। কেননা, হারাম বস্তু ভক্ষণে যে শরীর পরিপুষ্ট হয়, তা আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের পরিবর্তে তার অবাধ্যতার দিকে মানুষকে ধাবিত করে। এজন্য আল্লাহ প্রকৃতগতভাবে যেগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন তা ভক্ষণ করতেও নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া আমাদের শরীরের গঠন-বর্ধন ও সংরক্ষণে অসুবিধা নেই কিন্তু তা বৈধ বা হালাল উপায়ে অর্জিত নয়, বরং হারাম উপায়ে উপার্জিত এরূপ খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা যে শরীর গঠিত হবে, তা জান্নাতের উপযুক্ত নয় বলে ঘোষণা করেছেন। হারাম খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ করে যে দেহ পরিপুষ্ট হবে- তা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, হারাম ভক্ষণকারীদের রক্ত, মাংস সবই হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে দেহ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ শরীর অপবিত্র। জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম বস্তু ভক্ষণ করতে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

অন্য হাদীসে রাসূল (সা) হারাম বস্তু ভক্ষণ ও উপার্জন নিষিদ্ধ করে বলেছেন, হালাল খাদ্য ভক্ষণ শরীর সংরক্ষণে সহায়তা করে, মানব চরিত্রকে পবিত্র রাখে এবং সৎ ও পুণ্যময় পথে চলতে উৎসাহিত করে। কুরআন ও হাদীসে হারাম উপার্জনকে ইহকালে অশান্তি ও পরকালে শাস্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হালাল সম্পদ উপার্জন ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ ব্যতীত পরকালীন মুক্তি অসম্ভব। কেননা হালাল ভক্ষণকারীর মনোবল দৃঢ় থাকে, সে সদা সত্য কথা বলে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, সকল প্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে পুত-পবিত্র জীবনযাপনে সচেষ্ট থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। ফলে সে পরকালে জান্নাত লাভ করার আশা করতে পারে। অপরদিকে হারাম খাদ্যদ্রব্য শরীর বর্ধন ও সংরক্ষণে সহায়তা করলেও আখিরাতে এর পরিণাম ভয়াবহ। হারাম ভক্ষণকারীর রক্তমাংস সবই হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাই সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে ব্যক্তির আয় হারাম, তার সন্তানের শরীর বর্ধিত হয় হারাম দ্বারা এবং তার নিজের ও স্ত্রীর শরীর গড়ে ওঠে হারাম দ্বারা। এরূপ হারাম দ্বারা গঠিত শরীর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। তাই রাসূল (সা) হারাম উপার্জন ও ভক্ষণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি উপার্জনকারীর ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদেরও তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। যারা হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে, জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত স্থান। সেখানে তাদের বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ব্যাখ্যা

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা লাভ করি যে-

- হালাল উপার্জন করে হালাল রিয্ক খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।
- হারামের দ্বারা গঠিত শরীর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না।
- হারামের দ্বারা গঠিত শরীর জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জাহান্নামের আগুনে তা দগ্ধ হবে।
- হারাম উপায়ে উপার্জিত খাদ্য দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিজনের শরীর গঠিত হলে তাও জাহান্নামের ইন্ধন হবে।
- হারাম উপার্জন ত্যাগ করার এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।
- হারাম থেকে বেঁচে না থাকলে কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না। জাহান্নামই হারাম শরীরের ঠিকানা হবে।

عن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما أكل احد طعاما قط خيرما من ان يأكل من عمل يديه وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه. (رواه البخاري)

হযরত মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: কেউ নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা প্রাপ্ত খাদ্যের চেয়ে কোন উত্তম খাদ্য খেতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারাই আহার করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসটিতে শ্রমের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজ করে খেতে কোন অপমান বা আপত্তি থাকতে পারে না। পেশা ক্ষুদ্র হোক-বৃহৎ হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। নিজে পরিশ্রম করে শ্রমলব্ধ অর্থে নিজের ও নিজের পবিবারবর্গের আহার যোগানোর জন্য সংগ্রাম করা অতিশয় সম্মান ও পুণ্যের কাজ। কোন পেশাকে হেয় মনে করা ঠিক নয়। এছাড়া অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা অতিশয় নিন্দনীয় কাজ। শ্রমের মর্যাদার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মহানবী (সা) হযরত দাউদ (আ)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আল্লাহর কালামে পাকও এ বিষয়ে সাক্ষী। আল্লাহ পাক বলেন-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ

"আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৮০)

যুদ্ধাস্ত্রগুলোর মধ্যে যেগুলো পরিধান করা হত বা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হত সেগুলোকে لبوس বলা হয়েছে। এখানে لبوس বলতে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হত। আলোচ্য আয়াতে বর্মনির্মাণ শিল্প শিক্ষাদানের সাথে এর উদ্দেশ্যও বলে দেয়া হয়েছে যে- لتحصنكم من بأسكم অর্থাৎ বর্ম

তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করবে। এ শিল্প শিক্ষাকে আল্লাহ তাআলা একটি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এজন্য শুকর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন মেটান যায়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া অতি পুণ্যের কাজ, যদি তাতে মানব জাতির খিদমতের নিয়াত থাকে। আল্লাহর নবীগণ কোন না কোন শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) বর্মশিল্পে নিয়োজিত ছিলেন বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি (সম্ভবত প্রথম জীবনে) চাষী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শস্য বপন ও কর্তন করতেন। মহানবী (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তি মানুষের খিদমতের জন্য কোন কাজ করে তাঁর দৃষ্টান্ত মূসা (আ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন, আবার ফিরআউনের কাজ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন।

হারাম উপার্জন থেকে দান করা

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار. ان الله لا يمحوا السيئ بالسيئ و لكن يمحوا السيئ بالحسن. ان الخبيث لا يمحوا الخبيث. (رواه احمد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: কোন বান্দা হারাম সম্পদ উপার্জন করে তা থেকে দান করলে তা কবুল হবে না। তা নিজ কাজে খরচ করলে তাতে বরকত হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মন্দকে দিয়ে মন্দ দূর করেন না। তিনি মন্দকে উত্তম দ্বারা দূর করেন। নিশ্চয় খারাপ জিনিস খারাপ জিনিসকে দূর করতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ)

এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান বিন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ কথা মুখস্ত করে রেখেছি- যা তোমার মনে খটকা লাগে তা ছেড়ে দিয়ে যাতে খটকা লাগে না তা গ্রহণ কর। সত্য শান্তি আনে। নিশ্চয়ই মিথ্যাই খটকা সৃষ্টি করে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারিমী বর্ণনা করেছেন।)

আলোচ্য হাদীসটি মিশকাতুল মাসাবীহ-এর 'কিতাবুল বুয়ু' পর্বের হালাল উপার্জন ও হালাল জীবিকা অনুসন্ধান অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে- যা আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী থেকে সংকলিত।

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃজন করেছেন এবং সম্মানজনকভাবে চলার জন্য অনেক বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। যেগুলো তারা ভোগ-ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সব বস্তু ভোগ- ব্যবহারের অনুমতি আল্লাহ তাদের দেননি। কিছু বৈধ কিছু অবৈধ করেছেন। জাহিলী যুগে মানুষ বৈধ-অবৈধ যাচাই করত না। ইসলাম এসে সবগুলোর একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়। তবে ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মতামত দেয়নি। বরং অবস্থা অনুযায়ী পথ দেখিয়েছে মাত্র বা মৌলনীতি বর্ণনা করেছে তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ কারণে বলা হয়েছে, যে সকল বস্তু মনে খটকা সৃষ্টি করে বা সন্দেহযুক্ত তা পরিত্যাগ করার জন্য। আবার যেগুলো সন্দেহমুক্ত এবং খটকা সৃষ্টি করে না, সেগুলো গ্রহণ করার জন্য। আর যেগুলো ইসলামের মৌল বিষয়ের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সেগুলো ত্যাগ করা আবশ্যক। এ পথই শান্তির পথ যা মনে প্রশান্তি এনে দেয়। বিপরীত পথ মিথ্যার পথ যা মনে অশান্তির সৃষ্টি করে। মনকে পবিত্র ও প্রশান্ত রাখা মু'মিন মাত্রই কর্তব্য।

আর মিথ্যার পথ পরিহার করা হারাম বস্তু বর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়। মনকে শান্ত ও পবিত্র রাখতে হলে হারাম উপার্জন পরিহার এবং হালাল উপার্জন এবং তা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

অপরের অধিকার হরণ

من اخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة بسبع أرضين .

যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ ভূমি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে কিয়ামত দিবসে তার গলদেশে সাত স্তর জমি লটকিয়ে দেয়া হবে।

হাদীসটি দ্বারা অপরের অধিকার হরণ, অন্যায়ভাবে অন্যের জমি-জমাসহ অন্যান্য সম্পদ আত্মসাৎ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি, সামাজিক অপরাধ প্রবণতার মধ্যে অন্যায় উপার্জনের মাধ্যম

হিসেবে অপরের অধিকার হরণ, চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই অন্যতম। এগুলো বিস্তার লাভ করলে সমাজ-সভ্যতা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। সমাজ হয়ে পড়ে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড তুল্য। এসব অপরাধের কুফলগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

সমাজে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে অধিকার ও কর্তব্য আছে, এসব কর্তব্য পালন করাই হল হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার। আল্লাহর হক আদায় করতে কোন ত্রুটি হলে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক নষ্ট করলে বা অপরের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ তাআলা তা কখনো ক্ষমা করবেন না। অধিকার শব্দটি বেশ ব্যাপক অর্থবোধক। জান, মাল এবং সম্মানের অধিকার, ভাল ব্যবহার এবং সদয় আচরণ পাওয়ার অধিকার সকল বিষয় এর অর্ন্তভুক্ত। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেছেন- "হে মানব মন্ডলী ! তোমাদের রক্ত, বিত্ত-সম্পদ ও ইজ্জত পরস্পরের জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম করা হল। এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব ঠিক তোমাদের আজকের এই দিনটি, এই পবিত্র মাসটি বিশেষভবে এই শহরে অবস্থানকালে যেভাবে পালিত হয়ে থাকে।" কাজেই উপার্জনের ক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি হারাম পন্থা পরিহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেছেন- "যে ব্যক্তি আদায় করার নিয়াতে মানুষের সম্পত্তি ধার নেয়, আল্লাহ তাকে ফেরত দেয়ার সঙ্গতি দান করেন এবং যে আদায় না করার নিয়াতে ধার নেয়, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।" (বুখারী)

অপর একটি হাদীসে আছে মহানবী (সা) বলেছেন- "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও যমীন হরণ করে, কিয়ামতের দিন ঐ জমির মাটি হাশরের ময়দানে জমা করার আদেশ দিবেন। (আহমাদ, তাবারানী) আমাদের কাছে অনেকের অধিকার আছে- সেসব অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা কর্তব্য। অধিকার আদায়ে অবহেলা করা মারাত্মক অপরাধ। আমরা অনেক সময় বোনদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব দেই না, এটিও অধিকার হরণের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম উপার্জন হিসেবে ঘৃণিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা ছেলের ন্যায় মেয়েকেও পিতৃ সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং তার জন্য অংশ নির্ধারণ করেছেন। যদি কেউ মেয়েদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সে অংশ নিজে ভোগ করে তবে তা হারাম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে এবং পরকালে জাহান্নামী হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

উত্তর সঠিক হলে 'স' আর মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. যে রক্ত মাংস হারাম বস্তু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
খ. হযরত দাউদ (আ.) নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা আহার করতেন।
গ. হযরত আলী (রা.) বলেন, নিশ্চয় মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করে।
ঘ. সন্দেহ যুক্ত বিষয় গ্রহণ করা এবং সন্দেহ মুক্ত বিষয় বর্জন করা বৈধ।
ঙ. সামাজিক অপরাধের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি মারাত্মক অপরাধ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের আলোকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. নিজ হাতে উপার্জন করার গুরুত্ব হাদীসের আলোকে লিখুন।
৩. অপরের অধিকার হরণ সম্পর্কে ইসলামের বিধান বর্ণনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ১০

নৈতিকতা সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন
- নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- দুর্বল ঈমানের লক্ষণ কী? তা নির্ণয় করতে পারবেন।

নৈতিকতার গুরুত্ব

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان من خياركم أحسنكم اخلاقا (بخارى , مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক হচ্ছে তারা, যাদের চরিত্র তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

উদ্ধৃত হাদীস থেকে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আদর্শ শিক্ষা উপস্থাপণ করেছেন- ঈমানের পরে সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হচেছ মানুষের নৈতিক চরিত্র এবং এটাকেই মানুষের সঠিক কল্যাণের উৎস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ অসৎ কার্যাবলী থেকে নিজেকে দূরে রাখবে, উত্তম ও উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী গ্রহণ করবে, এটাই হল মানুষের বৈশিষ্ট্য। রাসূলে করীম (সা)-এর আগমন-উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান দিক হচ্ছে জনগণের তাযকিয়া করা অর্থাৎ মানুষের মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যাবলীকে নির্মল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ এবং সর্বপ্রকার ক্লেদ-কালিমা-মলিনতা থেকে মুক্ত করে তোলা। কেননা মানুষের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত ও প্রমাণিত থেকে পারে উত্তম নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে। অত্র হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে যে লোক সর্বোত্তম, ইসলামের দৃষ্টিতে সে-ই হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি। এখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও উত্তম নৈতিক চরিত্র একই জিনিসের দুই নাম। যার উন্নত মনুষ্যত্ব রয়েছে, সে-ই উৎকৃষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী; পক্ষান্তরে যার উৎকৃষ্ট চরিত্র রয়েছে, সে-ই প্রকৃত মানুষ। উত্তম চরিত্র ছাড়া কোন মানুষ সঠিক মানুষ হওয়ার দাবী করতে পারে না। নৈতিকতার গুরুত্ব প্রসঙ্গে- আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ان من احبكم الى واقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وان من ابغضكم الى وابعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون و المتفيهقون قالوا يا رسول الله: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون قال المتكبرون(ترمذى)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী হবে সেসব লোক, যারা তোমাদের মধ্যে আখলাক ও নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকট থেকে অধিক দূরে থাকবে সেসব লোক, যারা দ্রুত কথা বলে, লম্বা-লম্বা কথা বলে লোকদের অস্থির করে তোলে এবং অহংকার পোষণ করে। সাহাবীগণ বললেন, তিন ধরনের লোকদের মধ্যে প্রথম দুই ধরনের লোকদের সম্পর্কে তো আমরা জানি, কিন্তু শেষোক্ত লোক কারা ? নবী করীম (সা) বললেন- তারা হচ্ছে অহংকারী লোক। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা

হাদীসটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটবর্তী ও প্রিয় লোক কে এবং কে প্রিয় নয়, তার একটি বাহ্যিক মাপকাঠি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উত্তম চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই কিয়ামতের দিন রাসূলে করীমের (সা) নিকট অধিকতর প্রিয় লোক বলে বিবেচিত হবে। তারা সেদিন রাসূলের (সা) সাহায্য লাভ করবে, রাসূলের (সা) শাফাআতেরও অধিকারী হবে। কিন্তু যাদের মধ্যে তিন ধরনের দোষের কোন একটি থাকবে, তারা যেমন রাসূলের

প্রিয়পাত্র থেকে পারবে না, তেমনি রাসূলের নৈকট্য ও সাহায্য পেতে পারবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা, যারা খুব বেশী কথা বলে, কথা বলায় কৃত্রিমতা ও কপটতার প্রশ্রয় নেয়, এত দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, অনেক সময় তা সঠিকভাবে বোঝাও যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক তারা, যারা দীর্ঘ ও লম্বা লম্বা কথা বলে, কথার বাহাদুরীতে এত উচ্চমার্গে পৌছে যায় যে, তাদের যেন নাগাল পাওয়া যায় না। নিজেদের কথার উচ্চ প্রশংসা নিজেরাই করতে থাকে। তাদের কথা থেকে এরূপ ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা দুনিয়ায় কাউকেও পরোয়া করে না, কারো মান-সম্মান-মর্যাদারও কোন মূল্য যেন তাদের কাছে নেই। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হচেছ তারা, যারা মুখ ভরে কথা বলে, কথা বলার সময় এমনভাব করে যে সমস্ত কথা যেন মুখের ভেতরই বন্দী হয়ে পড়েছে এবং বিকট ধরনের শব্দই শুধু শ্রুতিগোচর হয়। তাদের কথার মধ্যে এমন প্রচ্ছন্ন অথচ প্রকট ভাব লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যেন সকলের নাগালের বাইরে। অন্য সব লোক যেন তাদের থেকে অনেক ছোট, অনেক হীন এবং অনেক দূরে অবস্থিত। অহংকার, আত্মভিমান ও আত্মশ্রেয়বোধ তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ লাভ করে। আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে তারা শুধু রাসূলে করীম (সা)-এর কাছেই অপ্রিয় নয়, গোটা মানব সমাজেও তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক বলে বিবেচিত। তারা আর যা-ই করুক না কেন, মানুষের অন্তর জয় করতে ও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয় না, সত্যিকার মানুষের পরিচয় তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তারা কপট, তারা মিথ্যাবাদী, তাদের থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

অশ্লীল কথাবার্তা নিষিদ্ধ

عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه- ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: ما من شئ اثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق و ان الله يبغض الفاحش البذى. (ترمذى)

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদার বান্দার দাড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছুই হবে না। আর যে লোক বেহুদা, অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তাআলা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা

কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তির আমল ওজনকরা কালে তার উত্তম চরিত্রই অত্যন্ত ভারী জিনিসরূপে প্রমাণিত হবে। তার অর্থ, ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই দুনিয়ায় অত্যন্ত উত্তম চরিত্রবান হবে। কেননা ঈমান ও উত্তম নৈতিক চরিত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে ঈমান আছে, সেখানে অনিবার্যরূপে উন্নত নৈতিক চরিত্র থাকবে। ঈমান না হলে যেমন উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্ভব নয়, তেমনি সঠিক ঈমানের অনিবার্য ফল হচ্ছে উন্নত নৈতিক চরিত্র।

এ হাদীসে খারাপ চরিত্রের একটি বিশেষ গুরুতর দিক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে অশ্লীল কথা বলা এবং বেহুদা, বাজে ও নীচ-হীন কথাবার্তা বলা। কথা মানুষের মনোভাব ও চিন্তাধারার বাহন। মানুষের অন্তরের ভাবধারা ও ভিতরকার প্রকৃতরূপের প্রকাশ ঘটে মানুষের মুখের কথায়। কাজেই অশ্লীল কথা যেমন পরিত্যাজ্য, অপ্রয়োজনীয়, তাই এ ধরনের কথাবার্তা বলাও একান্তই অবাঞ্ছনীয়। কথাবার্তা যার খারাপ, অশ্লীলতা ও হীনতা প্রকট হয়ে উঠে যার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সে লোকের মন যে নিতান্তই কলুষতায় আচছন্ন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ধরনের কথাবার্তা পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, এ ধরনের কথা যারা বলতে অভ্যস্ত, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একবিন্দু ও ভালবাসেন না, তাদের প্রতি আল্লাহর অপরিসীম ক্রোধ ও অসন্তোষ পতিত হয়। মহান আল্লাহই যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাদের ভবিষ্যৎ কিছুতেই কল্যাণকর থেকে পারে না। আনুষ্ঠানিক নেক আমলের বোঝা বিচারের পাল্লাকে ভারী করতে পারবে না, যদি না এর সাথে উত্তম চরিত্র যোগ হয়, একথা হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ হাদীসের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী থেকে হবে। তার কথা বার্তা, আচার-আচরণে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অশ্লীল কথা-বার্তা বর্জন করতে হবে। তা হলে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব লাভ করবেন।

মহানবী (সা)-এর চরিত্র

عن مالك رضى الله تعالى عنه:انه قد بلغه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بعثت لأ تمم مكارم الاخلاق. (موطأ امام مالك)

ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তার নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন: আমাকে নৈতিক চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা

হাদীসটি মূলত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালিকের নিকট এটা নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক সূত্রে পৌঁছেছে, যদিও তিনি তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি।

হাদীসে উল্লেখিত নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্য বলতে সে সব উত্তম নৈতিক ধারণা ও গুণকে বোঝানো হয়েছে, যার ভিত্তিতে একটি পবিত্র মানবীয় সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এবং সমাজ থেকে নৈতিকতার প্রভাবে সকল অন্যায়-অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষ চুরি-ডাকাতি, ব্যাভিচার, হত্যা লুণ্ঠন, মিথ্যা বলা, ধোকা দেয়া প্রভৃতি সকল অন্যায় অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ-কর্ম লোপ পেয়ে স্বর্গীয় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

নৈতিক চরিত্র-মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বিধানের অর্থ এই যে, নবী করীম (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের অনুসারীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ও বিভিন্ন দেশে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকের শিক্ষাকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। আর নিজেদের বাস্তব কর্মজীবন দিয়ে তার উন্নততর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কিন্তু হযরতের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এমন কোন সর্বাত্মক ব্যক্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠে আগমন করেননি, যার দ্বারা ইসলামী নৈতিকতার সর্বাত্মক রূপ উপস্থাপিত ও বিবৃত থেকে পারে এবং একদিকে নিজের জীবনে তা পালন করে দেখাতে ও অপরদিকে তদনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। বস্তুত এমন ব্যক্তিত্ব মানুষের গোটা ইতিহাসে একটি মাত্র পরিদৃষ্ট হয় এবং তা হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর তেইশ বৎসরের নবুয়তী জীবনে মানব জীবনের সমগ্র দিক ও ক্ষেত্রের জন্য নৈতিক চরিত্রের অপূর্ব ও উজ্জ্বল নিদর্শন সংস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে কোন একটি দিকেও একবিন্দু অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। আর বস্তুত এ উদ্দেশ্যেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন এবং এ কাজকে পূর্ণতার চরম উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, এ নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যেই তিনি দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এটা তাঁর জীবনের কোন আনুসঙ্গিক কাজ নয় বরং এটাই হচ্ছে তাঁর নবুয়াতের মূল লক্ষ্য। বস্তুত দ্বীন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যত কাজই করেছেন, যত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারই করেছেন, তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল মানবজাতির সম্মুখে চূড়ান্তভাবে নৈতিক চরিত্র-মাহাত্ম্য উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তোলা। ব্যক্তি মানুষকে তার ভিত্তিতে গঠন করা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা উহার ভিত্তিতে গড়ে তোলা। আর এর জন্য একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই যে চূড়ান্ত বিধান তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা, ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধেরই লালন হয়ে থাকে। সরকার যেমন ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক থাকেন তেমনি জনগণও ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সকল স্তরে পালন করার জন্য আমৃত্যু প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সূতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই কেবল মানুষকে সৎ, চরিত্রবান এবং নৈতিকতার মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে পারে।

নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায়

عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم. فذكر الحديث بطوله الى ان قال: قلت يا رسول الله اوصنى قال اوصيك بتقوى الله فانه يزين لأمرك كله قلت زدنى قال: عليك بتلاوة القران و ذكر الله عز و جل فانه ذكر لك فى السماء و نور لك فى الارض قلت زدنى. قال: عليك بطول الصمت فانه مطردة للشيطان و عون لك على امر دينك قلت زدنى . قال: اياك و كثرة الضحك فانه يميت القلب و يذهب بنور الوجه قلت. زدنى قال: قل الحق و ان كان مرا قلت زدنى . قال لا تخف فى الله لومة لائم قلت زدنى قال: ليحجدك عن الناس ما تعلم من نفسك. (بيهقي , شعب الايمان)

হযরত আবূ যার আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। অতঃপর (হযরত আবূ যার, নতুবা তাঁর নিকট থেকে হাদীসের শেষের দিকের কোন বর্ণনাকারী) একটি

দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন (এ হাদীস এখানে বর্ণনা করা হয়নি)। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু যার বলেন- আমি তোমাকে নসীহত করছি ঃ তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা এটা তোমার সমস্ত কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেবে। আবূ যার বলেন ঃ আমি আরো নসীহত করতে বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবে এবং আল্লাহকে সব সময়ই স্মরণে রাখবে। কেননা এ তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণের ফলেই আকাশ রাজ্যে তোমাদের উল্লেখ করা হবে এবং এ যমীনেও তা তোমার জন্য 'নূর' স্বরূপ হবে।
আবু যার আবার বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ থাকা ও যথাসম্ভব কম কথা বলার অভ্যাস করবে। কেননা এ অভ্যাস শয়তান বিতাড়নের কারণ হবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে এটা তোমার সাহায্যকারী হবে। আবু যার বলেন- আমি বললাম ঃ আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। বললেন ঃ বেশী হেসো না, কেননা এটা অন্তরকে হত্যা করে এবং মুখমন্ডলের জ্যোতি এর কারণে বিলীন হয়ে যায়। আমি বললাম ঃ আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ সব সময়ই সত্য কথা ও হক কথা বলবে- লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ ও তিক্ত হোক না কেন । বললাম, আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে আদৌ ভয় করবে না। আমি বললাম ঃ আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি যা জান, তা যেন তোমাকে অপর লোকদের দোষত্রুটি সন্ধানের কাজ থেকে বিরত রাখে। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে প্রথম লক্ষণীয় যে, একজন সাহাবী রাসূলে করীমের নিকট নসীহত ও উপদেশ লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নসীহত করতে বলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত নসীহত করলেন; কিন্তু সংক্ষিপ্ত নসীহত থেকে সাহাবী মোটেই পরিতৃপ্ত থেকে ও ক্ষান্ত থেকে পারেননি। বরং বারবার নসীহত প্রার্থনা করলেন। বারবার বেশী বেশী করে নসীহত করার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালেন। এ ঘটনা আমাদেরকে এ পথ নির্দেশই দান করে যে, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই কর্তব্য তার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ, অধিক জ্ঞানী ও মুত্তাকী ব্যক্তির নিকট থেকে বিভিন্ন নসীহত শ্রবণ করা, তা কবুল ও পালন করা। বস্তুত কেবল আবু যার গিফারী (রা) একাই নন, প্রায় সকল সাহাবীই রাসূলের (সা) নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন। সাধারণভাবেও শব্দ শ্রবণ ও কবুল করতেন এবং বিশেষভাবেও করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবেও তা করতেন। ভাল চরিত্রবান হওয়ার অভিলাসী যারা, এটা তাদের এক স্থায়ী স্বভাব।
আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) প্রথমত তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন। কেননা তাকওয়া মু'মিন লোকদের সকল প্রকার কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেয়। কাজেই যে লোক তাকওয়া অবলম্বন করবে তার সমগ্র জীবন আনুগত্যশীল ও সে আল্লাহর বিধান পালনকারী হয়ে উঠবে। তার ভেতর ও বাইর এবং অন্তর ও বাইরের জীবন সুসংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সৌন্দর্যমন্ডিত হবে। তার জীবন হবে সুদৃঢ় আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক স্থায়ী নীতির অনুসারী।

তারপর কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর করার উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এটা করলে তার ফলে উর্ধ্বতম জগতেও তার কথা আলোচিত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" (সূরা আল-বাকারা : ১৫২)
অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে "কোন বান্দা যখন এ পৃথিবীতে আল্লাহর স্মরণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মধ্যে তার স্মরণ ও আলোচনা করেন।" কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণ করার আর একটা বরকত হচ্ছে এর ফলে এ দুনিয়ায় একটি নূর লাভ হয়। যিকর ও তিলাওয়াতের নূর মূলত ব্যক্তির অন্তর্লোকেই প্রস্ফুটিত হয় ; কিন্তু এর স্ফুরণ ঘটলে ব্যক্তির সমগ্র ব্যবহারিক জীবনে তা পরিব্যাপ্ত হয়।
অতঃপর অধিক সময় চুপ করে থাকার ও কথা কম বলার উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন- এটা এমন একটি হাতিয়ার যার দ্বারা শয়তানকে বিতাড়িত করা যায়, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভবপর এবং দ্বীন পালনের ব্যাপারে এ থেকে বড়ই সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। বস্তুত যে লোক অধিক মাত্রায় কথা বলতে অভ্যস্ত, চুপ থাকা যার স্বভাব বিরোধী, তার পক্ষে যে কোন মুহূর্তে শয়তানের ধোকায় পড়া এবং দ্বীন পালনের দায়িত্ব ভুলে যাওয়া অসম্ভব বা কঠিন কিছুই নয়। শাণিত তরবারির মত অধিক চালু রসনার মারফতে শয়তান মানুষকে যত বিভ্রান্তিকর ও অনিষ্টকর কাজের মধ্যে ফেলতে পারে তত আর কোন মাধ্যমে পারে না। মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা, গালমন্দ করা, পরস্পরের নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা লাগিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি করা প্রভৃতি বড় বড় গুনাহ এ চুপ না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। আর যে লোক অধিক চুপচাপ থাকতে অভ্যস্ত, তার দ্বারা এ ধরনের অপরাধ কর্মই হয়ে থাকে তবে অধিক চুপচাপ থাকার অর্থ কখনো এটা নয় যে, প্রয়োজনীয় কথাও

বলা যাবে না। বরং উহার অর্থ হচ্ছে- প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত না বলা। আর ভাল ভাল কথা-দ্বীন ইসলামের, কুরআন-হাদীসের কথা না বলাও উহার অর্থ নয়, একথা মনে রাখা আবশ্যক।

অতঃপর অধিক হাসা-হাসি না করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন- অধিক হাসা-হাসি করার ফলে আত্মা মরে যায়, চেহারা বা মুখমন্ডল জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। আত্মা মরে যাওয়ার অর্থ অধিকতর গাফলতি ও দায়িত্বহীনতা দেখা দেয়া এবং অনুভূতির বিলুপ্তি ঘটা। মনুষ্যত্বের পক্ষে এটা এক প্রকারের মৃত্যুও বটে। আর এ গাফলতির অন্ধকারই মনকে মারে, ব্যক্তির মুখমন্ডলকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। অথচ ঈমানদার লোকদের মুখমন্ডল সব সময়ই উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহর রাসূল (সা) একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান করেছেন। তা হচ্ছে, আল্লাহর ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে ভয় না করা। ভয় মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার ; তবে ইসলামের নির্দেশ এই যে, ভয় কেবল আল্লাহকেই করবে, তাকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। বস্তুত যে লোক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না, সে হয় নির্ভীক, বীর এবং সাহসী। কিন্তু যে লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তি বা ব্যক্তিকে ভয় করে তার মত ভীতু লোক কেউ থেকে পারে না। সকল ক্ষেত্রে তার মস্তক নতই থাকবে, কখনো উঁচু থেকে পারবে না। ফলে সে দুনিয়ার সামান্য ও নগণ্য জিনিসের সম্মুখে মস্তক ধূলায় লুটায়ে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবে। এ ধরনের ব্যক্তির চরিত্র বলতে কিছুই থাকতে পারে না। লাঞ্ছনা আর অবমাননাই তার কপালের লিখন হয়ে পড়ে।

নৈতিকতা অনুসারে ঈমানের শ্রেণী বিভাগ

عن ابى سعيد ن الخدرى رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الايمان . (مسلم)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন প্রকার অন্যায় ও পাপ কার্য অনুষ্ঠিত থেকে দেখলে যেন সে তার হাত দ্বারা তা অবশ্যই পরিবর্তন করে দেয়। এরূপ করার শক্তি না থাকলে মুখ দ্বারা এর পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করবে, আর তাও সাহস না করলে অন্ততঃ মন দ্বারা এর পরিবর্তন কামনা করবে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতার পর্যায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

'মুনকার' শব্দের অর্থ- অন্যায়, পাপ ও আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন যাবতীয় কাজকেই বোঝায় এবং এ ধরনের যে কোন কাজ বা অনুষ্ঠান দেখলে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হচ্ছে উহার পরিবর্তনের জন্য তৎপর হওয়া। বস্তুত এরূপ অবস্থায় কোন ঈমানদার ব্যক্তিই নিষ্ক্রিয়, নিস্তব্ধ ও নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকতে পারে না। আলোচ্য হাদীসে অন্যায় ও পাপকে পরিবর্তন করার জন্য ক্রমিক পর্যায় ও অবস্থার তারতম্যের দৃষ্টিতে তিনটি উপায় পেশ করা হয়েছে। প্রথমত: হাত দ্বারা উহার পরিবর্তন করা। দ্বিতীয়ত: মুখের ভাষা ও মুখপত্রের সাহায্যে এর পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা আর তৃতীয়ত: মন দ্বারা উহার পরিবর্তনের কামনা করা। অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার জন্য লোকদের সামর্থের পার্থক্য ও অবস্থার বিভিন্নতার কারণে উল্লেখিত তিনটি উপায়ই প্রণিধানযোগ্য। কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত থেকে দেখলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির যদি ক্ষমতা থাকে তবে নিজেদের হস্ত দ্বারা কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগ করেই এর প্রতিরোধ করতে হবে। শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে মুখে এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং সেজন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে। আর অবস্থা যদি এতদূর খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে যে, মুখেও প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না, তখন অন্ততঃ মন দ্বারা এটাকে খারাপ জানতে হবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক পাপ, অন্যায় ও নাফরমানী পরিবর্তন করে সর্বত্র ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবায়নের জন্য নীরবে চেষ্টা করতে হবে। এটা না করলে ঈমানের দাবি পূর্ণ থেকে পারে না; ঈমান যে আছে তার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না।

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় হাদীসের শেষ কথাটি বলা হয়েছে এ ভাষায়:

و ليس وراء ذلك ايمان حبة خردل

কোন ব্যক্তি অন্যায় ও পাপ কাজকে মন দ্বারা ঘৃণা না করলে ও তার পরিবর্তন কামনা না করলে একবিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে বলে ধারণা করা যাবে না।

উপরোক্ত সকল হাদীসই আমাদের সম্মুখে একটি সুষ্ঠু কর্মনীতি উপস্থাপিত করেছে। প্রথম পর্যায়ে ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যায় কি সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা। কেননা কোনটি অন্যায় এবং তা কতখানি অন্যায় তা

জানা না থাকলে ও বুঝতে না পারলে এর সম্পর্কে কোন নীতিই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। সে সঙ্গে প্রয়োজন জনগণের মধ্যে অন্যায়ের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা জাগ্রত করতে চেষ্টা করা, সাধারণভাবে সমাজে অন্যায় বিরোধী একটি জনমত তৈরি করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুখে, ভাষা-সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার মারফতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলা, জোরদার প্রতিবাদ উত্থাপন করা। এর ফলে জনমতের এক প্রবল শক্তির উদ্ভব হবে। এ শক্তির সুষ্ঠু লালন ও সংহতি বিধানের মাধ্যমে অন্যায় প্রতিরোধক ও সত্য প্রতিষ্ঠাকামী এক দুঃসাহসী আল্লাহ নিবেদিত প্রাণের এক দল গড়ে তোলা। শেষ পর্যায়ে এ শক্তির সাহায্যে কার্যত অন্যায়ের মূলোৎপাটন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ দায়িত্ব পালন করা সমাজের প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. তাযকিয়া-নাফস শব্দের অর্থ হচেছ-

ক. আত্মমর্যাদা; খ. তাকওয়া;
গ. আত্মশুদ্ধি; ঘ. আত্মসমালোচনা।

২. প্রকৃত মনুষ্যত্বের মানদন্ড কি?

ক. উত্তম নৈতিক চরিত্র; খ. বাহ্যিক আচরণ;
গ. পরোপকারিতা; ঘ. ব্যক্তি স্বাধীনতা।

৩. কিয়ামতের দিন ঈমানদারের দাড়িপল্লায় কোন্ জিনিস অধিক ভারী হবে?

ক. নীতিকথা; খ. উত্তম চরিত্র;
গ. সমাজকর্ম; ঘ. মানবতাবোধ।

৪. দুর্বল ঈমানের পরিচয় কী?

ক. অন্যায় কাজে শক্তি প্রয়োগ করে বাঁধাদান; খ. অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয়া;
গ. মুখে মুখে অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা; ঘ. অন্তরে অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. عن مالك رضى الله تعالى عنه : قد بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.

এ হাদীসটির ব্যাখ্যা লিখুন।

২. ব্যাখ্যা করুন-'ঈমানদার ব্যক্তির দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা ভারী জিনিস আর কিছুই হবে না।'

৩. নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন।

৪. হাদীসের আলোকে নৈতিক চরিত্র গঠনের উপায় বর্ণনা করুন।

৫. হাদীসের আলোকে ঈমানের তিনটি স্তরের বিবরণ দিন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. নৈতিক চরিত্র বলতে কী বোঝায়? হাদীসের আলোকে নৈতিক চরিত্র গঠনের গুরুত্ব ও উপায় সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

পাঠ ঃ ১১

যুলম-নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- অত্যাচারী ও অত্যাচারিতকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তার বিধান বলতে পারবেন
- অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন
- যুল্ম-নির্যাতনকারী এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انصر أخاك ظالما او مظلوما ان يك ظالما فارdده من ظلمه و ان يك مظلوما فانصره (الدارمى)

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তুমি তোমার ভাইকে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় সাহায্য কর। যদি সে অত্যাচারী হয়, তবে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখ এবং যদি সে অত্যাচারিত হয়, তবে তাকে সাহায্য কর। (আদ-দারিমী)

ব্যাখ্যা

সুনান আদদারিমীতে সংকলিত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) যালিমকে যুল্ম থেকে বিরত রেখে এবং মজলুমকে যালিমের অত্যাচার থেকে রক্ষা করে সাহায্য করতে বলেছেন।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ হচ্ছে- কোন লোক অত্যাচার করলে তাকে যথা শক্তি প্রয়োগে প্রতিরোধ কর, তাকে যুল্ম ও অত্যাচার করতে দিওনা। মযলুম বা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা কর। আসলে যুল্ম একটি অন্যায় ও জঘন্য অপরাধ যা ইসলামী জীবন দর্শনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রতি কোনরূপ যুল্ম ও অত্যাচার করে তবে আমাদের উচিত অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দেয়া। অত্যাচারিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনমত যথাসাধ্য সাহায্য করা।

এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে- অত্যাচারী ব্যক্তি যদি আপন ভাইও হয়, তবু তাকে বাধা দিতে হবে। অত্যাচার করা থেকে যে কোন উপায়েই হোক না কেন, তাকে বিরত রাখতে হবে। তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

কেননা যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায় সহে উভয়ই সমঅপরাধী। যেমন কবির ভাষায়-

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

কেননা যুল্ম ও অত্যাচার চলতে থাকলে সে সমাজে বাস করা জাহান্নামে বাস করার মতই অসহনীয় হয়। আর এটা সমাজ সভ্যতা বিকাশের পরিপন্থীও বটে। সুতরাং সমাজ থেকে এরূপ জঘন্য ও গর্হিত কাজ যা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) মোটেই পছন্দ করেন না চিরতরে দূর করে দিতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর থেকে কঠোরতম পন্থা অবলম্বন করে যুল্ম মুক্ত সমাজ গঠন করতে হবে।

অতএব আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা

- কারও প্রতি যুলম করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে অঙ্গীকার করি।
- অত্যাচারী বা যালিমকে অত্যাচার করতে দেয়া যাবে না। সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগ করে জুল্ম-নির্যাতন বন্ধ করার প্রত্যয় গ্রহণ করি।
- অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে আমরা প্রতিটি মানুষকে একাজে উদ্বুদ্ধ করি।
- অত্যাচারীকে যুল্ম থেকে বাধা দিয়ে সৎপথে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করতে সমাজের সকলে এগিয়ে আসি।
- মজলুম বা অত্যাচারিতের পক্ষাবলম্বন করে প্রত্যেকে ঈমানী দায়িত্ব পালন করি।
- মজলুম মানবতার অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ইসলামী আদর্শের অংশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করি।

অন্যায়ভাবে ও জুল্‌ম করে কারো জমি দখল করার শাস্তি

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ظلم قيد شبرا من الارض طوقه من سبع ارضين. متفق عليه.

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

মুসলমান একজন অন্যজনকে সম্মান করবে। কোন প্রকার বিরোধীতা করা বা শত্রুতা পোষণ করা বা ষড়যন্ত্র করা এবং অন্যায়ভাবে পর সম্পদ গ্রাস করা থেকে বিরত থাকবে। আলোচ্য হাদীসে মহানবী (সা) অন্যায়ভাবে কারো ভূমি তথা সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন- যে ব্যক্তি এভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করে অথবা সীমানা অন্যের জমির ভিতর ঢুকিয়ে দেয় অথবা আইল কেটে নিজের জমির ভিতর নিয়ে নেয় অথবা জোরপূর্বক দখল করে নেয় অথবা কোন প্রাকৃতিক কারণে আইল ভেঙ্গে নিজের জমির সাথে মিশে যায় এতে সে ব্যক্তি নিজ খুশীতে তা নিয়ে নেয় এবং মালিককে তা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করে না। নিশ্চয়ই কিয়ামত দিবসে এ ধরনের অন্যায়, যুল্‌ম ও অবৈধ দখলের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হবে এবং তাকে সে জমি বহন করতে দেয়া হবে। সাত তবক জমি বা সম পরিমাণ জমির গভীরতা ও ভার তার গলার উপর ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আর তাকে বলা হবে যে, এ শাস্তি তোমার গাদ্দারীর জন্য। অন্যায়ভাবে অপরের জমি আত্মসাৎ করার পরিণতি্ আজ গলায় ধারণ কর যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভোগ করার পরিণতি আজ ভোগ কর, অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে যুল্‌ম করার পরিণাম ভোগ কর। অবৈধ পন্থায় কারো জমি কর্তন করার পরিণতির শাস্তি আজ ভোগ কর। এখানে উল্লেখ্য যে, কারো জমি থেকে নিজ প্রয়োজনে মাটি কেটে আনার অধিকারও ইসলাম অন্যকে দেয়নি। মাটি কেটে আনতে হলে অবশ্যই জমির মালিকের অনুমতি লাগবে। অতএব, মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল- অন্যায় ও যুলমের মাধ্যমে আমরা অন্যের জমি কর্তন করব না। যাতে করে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি আমাদের গ্রাস না করতে পারে এবং কিয়ামত দিবসে সাত তবক জমি কাঁধে বহন করে আমাদেরকে মানুষের সামনে দিয়ে চলতে না হয়। যদি কেউ কারো সম্পদ আত্মসাৎ ও অবৈধভাবে দখল করে অথবা কারো জমি কর্তন করে নেয় তাহলে মুসলিম ভাইদের উচিত তারা যেন তাকে মালিকের কাছে তা ফেরত দেয়ার জন্য উপদেশ ও পরমর্শ প্রদান করে। যাতে করে মুসলিম সমাজে যুলম, নির্যাতন বন্ধ থাকে এবং ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট না হয়। সমাজের প্রতিটি মানুষ পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন-

يا عبادى: انى حرمت الظلم على نفسى و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا.

হে বান্দাগণ ! আমি নিজের উপর যুলম করাকে নিষিদ্ধ ও হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও যুলমকে হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে যুল্‌ম করবে না।

আলোচ্য হাদীস থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে,

- এক মুসলমান উপর অপর মুসলমানের প্রতি যুল্‌ম করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করে এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন সাত তবক জমি বা তার সমপরিমাণ ভার উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সমাজের মানুষ যদি একে অন্যের উপর যুল্‌ম করা থেকে বিরত থাকে তাহলে সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও ঐক্য বিরাজ করবে।

যুল্‌ম ও নির্যাতন এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি

عن ابى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له فى الاخرة من البغى و قطيعة الرحم (ابوداؤد)

হযরত আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যুলম ও নির্যাতনকারী এবং রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি থেকে অধিক গুণাহকারী আর কেউ হবে না, যাদেরকে আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতে শাস্তি দান করবেন। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা

প্রত্যেক পাপই নিকৃষ্ট এবং ঘৃণিত, কেননা তা মানুষের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাস্তির দিক থেকে সবচেয়ে কঠিন পাপ যা দুনিয়াতে দ্রুত নিপতিত হবে এবং পরকালেও ভয়ানক শাস্তি দেয়া হবে তা হচ্ছে মানুষের উপর যুল্‌ম নির্যাতন এবং রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। সত্যের সাধক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এ সংবাদ প্রদান করেছেন। নিশ্চয় যারা মানুষের উপর নির্যাতন ও যুল্‌ম করবে এবং যারা মা-বাবাকে কষ্ট দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তাদের সাথে কোনরূপ সুন্দর আচরণ করবে না, মা-বাবার প্রতি ইহসান করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ভুলে যাবে দুনিয়াতে অতি সত্তর আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে এবং আখিরাতেও তারা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং মুসলিম ভাইদের উচিত তারা যেন মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, তারা কখনও সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির পায়তারা না করে তাহলে তারা এ কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। তাদের জন্য পরিবারে এবং সমাজে উচ্চ স্থান নির্ধারিত হবে। এ সকল লোকই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের কামনা করতে পারে যারা মাতা-পিতার প্রতি সদাচারণে গুরুত্বারোপ করে, রক্তের সম্পর্ক স্থায়ী রাখে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও যুল্‌ম থেকে বিরত থাকে। আমাদের দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে মুক্তির জন্য যুল্‌ম , নির্যাতন, রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। তাহলে কাংখিত ফল লাভ সম্ভব হবে।

যুলম সম্পর্কিত অপর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল-

عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه و من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته. (متفق عليه)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচারও করবে না এবং তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

বুখারী শরীফের এ হাদীসে মহানবী (সা) মুসলমানগণের পরস্পরের সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ করে ঘোষণ করেছেন যে- মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। মুসলমান ভাইয়ের কর্তব্য হল আরেক ভাইকে সকল বিপদাপদে সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। শত্রুর আক্রমণ ও আঘাত থেকে সর্বদা রক্ষা করা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এ মর্মে ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ .

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ; সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর। (সূরা আল-হুজুরাত : ১০)

কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে কোনরূপ অত্যাচার করতে পারবে না। যত বড় মারাত্মক অপরাধই করুক না কেন তাকে কোন অবস্থাতেই দুশমনের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

আপন ভাইয়ের বিপদের সময়ে ভাই যেমন সাহায্য করতে এগিয়ে এসে, তেমনি এক মুসলমান ভাইও অপর মুসলমান ভাইয়ের বিপদে-মুছিবতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা ঈমানী কর্তব্য।

এ মর্মে রাসূল (সা) বলেন- আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে। (মুসলিম)

কাজেই আল্লাহ তাআলার সাহায্য পেতে হলে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা কর্তব্য। এক মুসলমানের বিপদে অপর মুসলমান ভাইয়ের এগিয়ে না আসার কারণেই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছে। বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত হচ্ছে। স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার লাঞ্ছিত জীবন অতিবাহিত করছে। যদি আল্লাহ ও রাসূলের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানগণ নিজেদের ভোগ-বিলাস ও সংকীর্ণ স্বার্থ-চিন্তা পরিহার করে

মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যের জন্য জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ থেকো, তবে কোন জাতির পক্ষেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা সম্ভব হত না। আর এ কারণেই আজ মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

সারকথা

মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পরে মিলেমিশে বসবাস করবে। এক মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর অত্যাচার করতে পারে না। অথবা তাকে শত্রুর নিকটও সোপর্দ করতে পারে না। এটা মুসলমানের আদর্শ নয়। সর্বদা মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসা কর্তব্য। তাহলেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে। অতএব, আল্লাহ আমাদের এ হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করে তা জীবনে অনুশীলনের তাওফীক দান করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. অত্যাচারীকে কীভাবে সাহায্য করা যায়?

ক. অত্যাচার থেকে বিরত রেখে; খ. অত্যাচার করতে সাহায্য করে;
গ. অত্যাচারিতকে সাহায্য দিয়ে; ঘ. উত্তর ক এবং গ সঠিক।

২. যুল্‌ম করা কী?

ক. হারাম; খ. জায়েয;
গ. মাকরূহ; গ. মুবাহ।

৩. এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করার পরিণতি কী?

ক. অন্যায়; খ. দখলকারীর গলায় সাত স্তর জমি ঝুলিয়ে দেয়া হয়ে;
গ. দখলকারীর সাথে শত্রুতা রাখতে হবে; ঘ. দখলকারীকে বয়কট করতে হবে।

৪. হাদীসে কুদসী কী?

ক. জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর বাণী; খ. সরাসরি আল্লাহর বাণী;
গ. জিবরীল (আ) -এর বাণী; ঘ. হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাণী।

৫. মুসলমানগণ পৃথিবীতে নির্যাতিত কেন?

ক. আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে; খ. মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে;
গ. মুসলমানগণ জিহাদ ত্যাগ করার কারণে; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

পাঠ ঃ ১২

সুদ, ঘুষ, জুয়া রোধ সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য
এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—
- ◆ সুদ কী তা বলতে পারবেন
- ◆ সুদের আদান-প্রদান সংক্রান্ত ইসলামী বিধান আলোচনা করতে পারবেন
- ◆ জুয়া এবং এর বিধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সুদ

সুদ এর আরবি প্রতিশব্দ রিবা (ربوا) এর অর্থ হচেছ বৃদ্ধি পাওয়া বা অতিরিক্ত হওয়া। অর্থাৎ প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করাকে সুদ বলে। একই শ্রেণীর জিনিসের ক্ষেত্রে এ সুদ প্রযোজ্য এবং সুদ সাধারণত বাকী বিক্রির বেলায়ই হয়ে থাকে। যেমন কেউ এক কেজি আটার বিনিময়ে এক কেজি আটাই গ্রহণ করতে পারে। এর বেশি গ্রহণ করলে সুদ হিসেবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এক কেজি আটার বিনিময়ে এক কেজি আটা এবং এর অতিরিক্ত অন্য যে কোন জিনিস বা অর্থ গ্রহণ করলে সুদ গ্রহণ করা হয়। সুদের পরিচয় প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন- সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে যব, আটার বিনিময়ে আটা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ-একই প্রকার দ্রব্যের বিনিময়ে একই প্রকার দ্রব্য নগদ (আদান-প্রদান) আর অতিরিক্ত হলেই সুদ অর্থাৎ কেউ বেশি দিলে বা বেশি নিলে উভয়েই সুদের মধ্যে লিপ্ত হবে। (মুসলিম)

ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ

ইসলামে সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ। সুদ খাওয়া আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর। পবিত্র কুরআনের মোট ৭টি আয়াত, ৪০টিরও অধিক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সুদ হারাম প্রমাণীত। সুদের অবৈধতা এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত মাত্র কয়েকটি হাদীসের বাণী নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم اكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال هم سواء.

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান (অপরাধী)। (বুখারী ও মুসলিম)

সুদ হচ্ছে জুল্‌ম ও শোষণের একটি হাতিয়ার। এ জন্য ইসলাম সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেকেই সুদের কুফল আলোচনা করেছেন। সুদের অনিষ্ট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। সুদের ব্যাপক অনিষ্টকারিতার কারণে মহানবী (সা) সুদ ও সুদখোর এবং সুদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুদের ফলে সমাজ জীবনের উপর যে বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, সে সম্পর্কে হাদীসে সতর্কবাণী উল্লেখিত হয়েছে। মহানবী (সা) বলেন-

اذا ظهر الربا والزنا فى قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله.

সুদ ও ব্যভিচার-যেনা যখন কোন দেশে-শহরে বা গ্রামে ব্যাপকতা লাভ করে, তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে। (হাকিম)

ইসলাম সুদের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং অকাট্যভাবে হারাম করে দিয়েছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে। তাদের নৈতিকতা, সমাজ ও অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে।

ধনী লোকেরাই সুদ খায় ও সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। সুদখোর ব্যক্তি গরীবকে ঋণ দেয় এবং মূলধনের উপর সে বাড়তি টাকা ফেরত নেয়। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও যেমন অভিশপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি জনগণের কাছেও অভিশপ্ত। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল সুদ-খোররাই অপরাধী হয় না, যারা সুদ দেয়, সুদ খাওয়ায়, তারাও এ অপরাধে শরীক রয়েছে। সুদের দলিল যারা লিখে এবং তাতে যারা সাক্ষী হয়, তারাও কোন অংশে কম অপরাধী নয়। হাদীসে বলা হয়েছে।

لعن الله اكل الربا و مؤكله و شاهديه و كاتبه.

যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী হয় এবং তার দলিল লিখে তাদের সকলের উপর আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

সমাজে যখন করযে হাসানার প্রবর্তন না থাকে এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করার যদি তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে শুধু সুদখোরই গুনাহগার হবে। সুদের ভিত্তিতে ঋণ না করাই উত্তম। তাই সুদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সকলকেই প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। একান্ত কঠিন সমস্যায় পড়া ছাড়া সুদ গ্রহণ করা ঠিক নয়। আর সমস্যায় পড়ে একাজ করতে হলে অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে একাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা চলবে না। এরূপ অবস্থা হলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

সূদের পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (সা) আরো বলেন-

و عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: الربا ثلث و سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সুদের মধ্যে তিহাত্তরটি গুনাহ রয়েছে। আর সর্বনিম্ন গুনাহটি হল- নিজের মাতাকে বিবাহ করার সমতুল্য। (মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- সুদের ভিতর তিহাত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে-এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হল নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য। (বায়হাকী ও ইবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যিনা করা অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ। (মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন সে সমাজে সুদের প্রচলন বৃদ্ধি করে দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ঋণ মুনাফা টানে তা সুদ। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ক্ষতিকর সাতটি বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা) ! সে সাতটি বিষয় কী ? জবাবে তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) যাদু বিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা, (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা (৪) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৬) ধর্ম যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা এবং (৭) কোন স্বতী-সাধবী রমণীকে অপবাদ দেয়া। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। বিশ্বনবী (সা) বলেছেন, সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (হাকিম)

সুদ খাওয়ার অর্থ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদ খাওয়া এবং খাওয়ানোকে হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুদ সম্পর্কে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে খাওয়া। যেমন-

اكل الربا و موكله, الذين يأكلون الربوا (যারা সুদ খায়), لا تأكلو الربوا (তোমরা সুদ খেয়ো না) (সুদ যে খায় এবং যে দেয়) ইত্যাদি।

বর্তমান যুগে সুদখোর এবং এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোক যাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারা সুদকে হালাল করার জন্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা বলেন- কুরআনে সুদ খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু এর ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাদের এ দাবীর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদ খাওয়ার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অসত্য নয়। কিন্তু সুদ খাওয়া অর্থ হচ্ছে সুদ ব্যবহার করা বা গ্রহণ করা বা সুদের আদান-প্রদান করা।

আর তা খাওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হোক বা ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্যে ব্যবহার করা হোক বা আসবাব পত্র ক্রয়ের জন্যে ব্যবহার করা হোক বা পোষাক পরিচ্ছদের জন্যে ব্যবহার করা হোক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুদ ব্যবহার

শব্দটি উল্লেখ না করে সুদ খাওয়া শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, অন্যায়ভাবে কারো কোন জিনিস ব্যবহার করার পর সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার পরে তা মালিকের নিকট ফেরত দেয়া যায়। কিন্তু কোন জিনিস খেয়ে ফেলা হলে তা আর ফেরত দেয়া যায় না। সুদের ব্যাপারটি ঠিক অনুরূপ। সুতরাং সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে কুরআন ও হাদীসে খাওয়া শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ভাষার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। সুতরাং সুদ খাওয়া অর্থাৎ সুদের সর্বপ্রকার ব্যবহার তথা আসবাবপত্র ক্রয়, ঘরবাড়ি নির্মাণ, পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়, সুদ দেয়া নেয়া, সুদের সাক্ষ্য দেয়া, সুদের দলিল লেখা, সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, বাণিজ্যিক সুদ এবং সর্বপ্রকার সুদী লেনদেন ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেউ যদি সুদের নাম পরিবর্তন করে সুদকে অন্য কোন নতুন নামে আখ্যায়িত করে তাহলে সুদ হালাল হবে না বরং হারামই থাকবে। হারামকে হারামই মনে করতে হবে। সুদকে কোন অবস্থাতেই বৈধ বা হালাল হিসেবে চিন্তা করা যাবে না। এটা ঈমানের দাবী।

ঘুষ সংক্রান্ত হাদীস

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল (সা) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشى والمرتشى .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই অভিশম্পাত করেছেন। (তিরমিযী)

ঘুষ চাওয়া, ঘুষ লওয়ার চেষ্টা করা, না দিলে বিপদ হবে এরূপ হুমকি বা ধমক দেয়াও ঘুষ গ্রহণের শামিল। এছাড়া যারা ঘুষ দিবে এবং যারা ঘুষের আদান প্রদানে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা করবে তারাও ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার ন্যায় সমান অপরাধী বলে গণ্য হবে। কেননা হারাম কাজ করা যেমন অন্যায়, তদরূপ হারাম কাজে সাহায্য সহযোগিতা করাও অন্যায়।

এ বিষযে হযরত উমর ফারুক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একদল লোক সাদাকার অর্থ পাবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জড়িয়ে ধরত। তারা সাদাকার অর্থ না নিয়ে ফিরে যেতে রাজি হত না। অথচ তারা এর হকদার ছিল না। তথাপি তাদের পিড়াপিড়িতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে কিছু দিয়ে দিতেন। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ان احدكم ليخرج بصدقته من عندى متابطها و انما هى نار قال عمر: يا رسول الله اكيف تعطيه و قد علمت انها له نار قال فما اصنع يأبون الا مسالتى و يابى الله عز و جل لى البخل .

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যারা আমার নিকট থেকে সাদাকার মাল নিয়ে বগলে চেপে বের হয়ে যায় অথচ উহা তার জন্য আগুনের ন্যায়। হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি যখন জানেনই যে সেটা তার জন্য আগুনের ন্যায় তখন আপনি তাকে দেন কেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি কি করব ? ওরা এমনভাবে আবদার করে বসে যে, ওদেরকে ফিরানোই যায় না। মহিমান্বিত আল্লাহ চান না যে, আমি কৃপণতা করি। (মুসনাদে আহমাদ)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, সাদাকার অর্থ তাদের ন্যায্য প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও এবং তা তাদের জন্য অগ্নি এটা জেনেও তাদের চেপে ধরার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে কিছু মাল দিয়ে দিতেন। সুতরাং ঘুষ দেয়া এবং তা গ্রহণ করা হারাম জেনেও যারা ঘুষ ব্যতীত কাজ করতে চায় না, ঘুষ না দিলে যারা ফাইল পত্র লুকিয়ে রাখে, কিংবা দিনের পর দিন টেবিলে ফাইল ধরে রাখে তাদেরকে যদি নিজের ন্যায্য হক আদায়ের জন্য কিংবা তাদের জুল্‌ম থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিরূপায় হয়ে শেষ প্রচেষ্টায় ঘুষ দেয়া হয় তাহলে গুনাহ এবং হারাম হবার কথা নয়।

অন্যদিকে ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা এবং ঘুষের আদান প্রদানে যারা সহযোগিতা করবে তারাও অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা পাপ কাজ করা বা পাপ কাজে সহযোগিতা করা উভয়ই সমান অপরাধ। তবে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ সাহায্যকারী যদি ঘুষদাতা কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং ন্যায্য অধিকার আদায় বা জুল্‌ম থেকে বাঁচার জন্য নিরুপায় হয়ে ঘুষের আদান প্রদানে সহযোগিতা করে তাহলে তার অবস্থা ঘুষদাতার মতোই হবে অর্থাৎ সে অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি অবৈধ ও নিয়ম বহির্ভুতভাবে সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য ঘুষ প্রদানে সহযোগিতা করে তাহলে সে ঘুষদাতার ন্যায় অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অপরদিকে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ সাহায্যকারী যদি ঘুষ গ্রহণকারী কর্তৃক

নিযুক্ত হয় এবং ঘুষের আদান প্রদানে সহযোগিতা করে যায় তাহলে সে ঘুষ গ্রহীতার ন্যায় অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ তাকে তো ঘুষ খেতে কেউ বাধ্য করেনি। ঘুষ খাওয়া বা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এছাড়া শাসককে ঘুষ দেয়া সর্বাবস্থায় হারাম, তা কারো কোন প্রকার জুল্‌ম থেকে বাঁচার জন্য হোক বা ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য হোক।

জুয়া কি?

জুয়া জঘন্যতম সামাজিক অনাচার। জুয়াকে কুরআন মাজীদের ভাষায় মাইসির বলা হয়েছে। মাইসির অর্থ- সহজ উপার্জন। অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অপরকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে জুয়া বলা হয়। জুয়ার মালিকানা বা লাভ ঘটনাক্রমের ওপর নির্ভরশীল। এক ব্যক্তির সম্পদ অন্য ব্যক্তির হস্তগত হওয়ার ভাগ্যক্রমে বা দৈব চক্রের সব কাজই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি শয়তানী, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও প্রতারণামূলক কাজ।

জুয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদীও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ; সুতরাং তোমরা তা বর্জ কর-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৯০)

জুয়া ও লটারি সামাজিক অনাচার ও অপরাধের মধ্যে একটি মারাত্মক অপরাধ। মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকে এ পাপাচার ও পাপানুষ্ঠানে আসক্ত হয়ে আছে। সমাজের বহু অন্যায় এ জুয়ার পাপাচার থেকে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম তাই জুয়াকে চিরতরে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

জাহেলী যুগে জুয়া

আরবের জাহিলী যুগের লোকেরা নানাভাবে জুয়া খেলত। তার মধ্যে একটি হচেছ- আযলাম। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যা দ্বারা আরবে ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট যবাহ করত। কিন্তু সমান অংশে মাংস ভাগ না করে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত থাকত। আর তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। যার নামে যে অংশ বিশিষ্ট শর ওঠত সে তত অংশ মাংস পেত। আর যার নামে অংশবিহীন শর ওঠত, সে কিছুই পেত না। ইসলামে এ ধরনের কাজকে হারাম করা হয়েছে। কেননা, এতে প্রকৃত মালিক বঞ্চিত হয়। সুরা মায়িদায় বলা হয়েছে- "শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না।" (সুরা-মায়িদাঃ ৯১)

আধুনিক কালে জুয়া

আধুনিক বিশ্বে নানাভাবে নানা উপায়ে এ জুয়ার আসর জমজমাট করে রেখেছে। বিভিন্ন নামে চলছে জুয়ার আড্ডা। লটারিও এক রকম একটি জুয়া। ইসলাম সব ধরনের জুয়াকে হারাম করেছে।

জুয়া ও লটারীর কুফল

জুয়া একটি শয়তানী কাজ। আল্লাহ বলেন ঃ এটি ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। (সূরা আল-মায়িদা : ৯০)

জুয়া ও মদ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে। জুয়ার দ্বারা একজন লাভবান হয় অন্যজন হয় নিঃস্ব। ফলে একে অপরের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা শুরু হয়।

জুয়া সম্পদ অর্জনের কোন মাধ্যম নয়। এটা বিনা শ্রমে অন্যকে বঞ্চিত করে সম্পদ অর্জনের অপকৌশল। কাজেই বন্টনের এ ব্যবস্থাটি ন্যায়নীতি বিহীন, নির্যাতন ও প্রবঞ্চনামূলক। তাই একাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

জুয়া সকলের জন্য খারাপ। এতে কোনো কল্যাণ নেই। এজন্য যে সব বস্তু বা কাজ আমাদের জন্য কল্যাণকর আল্লাহ তাআলা তা আমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর যা অকল্যাণকর তা হারাম করে দিয়েছেন।

জুয়া একটি প্রতারণামুলক অর্থোপার্জনের মাধ্যম। প্রতারণামূলকভাবে এতে অন্যের অধিকার কুক্ষিগত করা হয়। মহানবী (সা) বলেন- যে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসলিম)

জুয়ার দ্বারা আপাত লাভ হলেও এর দীর্ঘ মেয়াদী ফল হচ্ছে এক সময় জুয়াড়ী সর্বশান্ত হয়ে পড়ে।

বিনা শ্রমে জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত টাকা পেয়ে তা খরচ করার জন্য জুয়াড়ী নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জুয়াড়ী যিনা-ব্যভিচার ও মাদকাসক্ত হয়।

জুয়ার টাকা সংগ্রহের জন্য জুয়ারী নানা ফন্দি-ফিকির করে। নিজের সম্পদ নষ্ট করে। অপরের টাকা লুট করে, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি ও সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ে।

জুয়া অনেক অপকর্মের জন্ম দেয়। সমাজকে কলুষিত করে। জুয়ার দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তি ও সমাজ মানবতার ঘৃণ্য শত্রু। এজন্য কুরআনে একে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জুয়া একটি সামাজিক অনাচার। অনেক পাপাচারের উৎসাহদাতা। জুয়া সংক্রমণ ব্যাধির মত। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা কলুষিত হয় এবং নিঃশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ কারণে ইসলাম জুয়াকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই জুয়ার ন্যায় প্রতারণামূলক উপায়ে অর্থ উপার্জন থেকে প্রতিটি উম্মতকে নিরাপদ থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদ-এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে-

ক. আনফাল; খ. যিয়াদাহ;
গ. রিবা; ঘ. মাইসির।

২. আল্লাহর অভিশাপ কার উপর?

ক. সুদদাতার উপর; খ. সুদগ্রহীতার উপর;
গ. সুদের দলীল লেখকের উপর; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৩. সুদের সর্বনিম্ন পাপ কোনটি?

ক. ব্যভিচার করার তুল্য; খ. নিজের মাতাকে বিবাহ করার সমতুল্য;
গ. নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৪. ঘুষগ্রহীতার পরিণাম কী?

ক. ঘুষ গ্রহীতা ঘৃণার পাত্র; খ. ঘুষ গ্রহীতা জাহান্নামী হবে;
গ. ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিশম্পাত; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৫. মাইসির শব্দের অর্থ কী?

ক. সহজ উপার্জন; খ. জুয়া;
গ. প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. রিবা বলতে কী বোঝায়? লিখুন।
২. "ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ" আলোচনা করুন।
৩. হাদীসে বর্ণিত নিষিদ্ধ সাতটি বিষয় কী কী? লিখুন।
৪. ইসলামে ঘুষ গ্রহণের বিধান লিখুন।
৫. অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুষ দিলে তার বিধান কী? লিখুন।
৬. জুয়া কী? জুয়ার কুফল আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সুদ বলতে কী বোঝায়? সুদের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. জুয়া কী? ঘুষ ও জুয়ার বিধান আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ১৩

হত্যা, সন্ত্রাস, অধিকার হরণ-এর পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ◆ ইসলামে হত্যার বিধান কী তা বর্ণনা করতে পারবেন
- ◆ রক্তপণ বা দিয়াতের বিধান বলতে পারবেন
- ◆ কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলমান হত্যা করার বিধান উল্লেখ করতে পারবেন
- ◆ ইসলামী আইনে একজনের অপরাধে অন্যজনকে শাস্তি দেওয়ার বিধান নেই- তা আলোচনা করতে পারবেন
- ◆ আত্মহত্যাকারীর বিধান বলতে পারবেন
- ◆ ফিতনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসের পরিণতি আলোচনা করতে পারবেন।

হত্যা, সন্ত্রাস, অধিকার হরণ এর পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস

মহানবী (সা) বলেন-

قتال المسلم اخاه كفر و سبابه فسوق (للترمذى) عن ابن مسعود (للنسائى) عن سعد قتال المسلم كفر و سبابه فسوق ولا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. (مسند أحمد ,لابى يعلى فى مسنده . و للطبرانى فى صحيحه)

১. মুসলমানের জন্য তার ভাইকে হত্যা করা কুফরী, আর তাকে গালী দেয়া ফাসেকী (তিরমিযী ও নাসাঈ)
২. মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী, তাকে গালী দেওয়া ফাসেকী, কোন মুসলমানের জন্য বৈধ-জায়িয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। (মুসনাদ আহমাদ, আবু ইয়ালা, তাবারানী)

হত্যার বিনিময়ে হত্যা

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان قريظة والنضير و كان النضير اشرف من قريظة فكان اذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به و اذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودى بمائة و سق من تمر فلما بعث النبى صلى الله عليه و سلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه الينا نقتله فقالوا بيننا و بينكم النبى صلى الله عليه و سلم فأتوه فنزلت و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت افحكم الجاهلية يبغون .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইযা ও নাযীর ইয়াহূদীদের এ দু'টি গোত্রের মধ্যে- নাযীর গোত্রটি অধিক সম্মানিত ছিল। কুরায়যা গোত্রের কোন লোক, নাযীর গোত্রের কোন লোককে হত্যা করলে এর বিনিময়ে তাকে হত্যা করা থেকো। অপর পক্ষে নাযীর গোত্রের কোন লোক কুরাইযা গোত্রের কোন লোককে হত্যা করলে এর বিনিময়ে হত্যাকারীকে একশত ওসক ফিদয়া বা রক্তপণ দিতে থেকো। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আসেন, তখন নাযীর গোত্রের এক ব্যক্তি, কুরায়যা গোত্রের একজনকে হত্যা করে। তখন নাযীর গোত্রের লোকেরা তাদের বলে ঃ হত্যাকারীকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর, আমরা তাকে হত্যা করবো। তখন কুরায়যা গোত্রের লোকেরা বলে- আমাদের ও তোমাদের মাঝে নবী (সা) আছেন, চল তার কাছে যাই। তারা নবী (সা)-এর কাছে আসলে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ 'যদি আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে করবেন।' আর ইনসাফ হলো ঃ

জীবনের বিনিময়ে জীবন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় - তারা কি জাহিলী যুগের ফয়সালা পসন্দ করে? (এরূপ করা উচিত নয়)

হত্যার বিধান

মূসা ইবনে ইসমাঈল (রঃ) আবূ শূরায়হ খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- মহানবী (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তির উপর কোন হত্যার বা অংগচ্ছেদের বিপদ আসে, তাকে যেন তিনটির মধ্যে কোন একটি সুযোগ দেয়া হয়। হয়তো রক্তপণ নেবে, নয়তো মাফ করে দেবে, অথবা বিনিময় নেবে। এরপর যদি সে চতুর্থ কোন বিষয়ের আকা ক্ষাকরে, তবে তার হাত ধরে তা থেকে বিরত রাখতে হবে। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তবে তার জন্য ভীষণ আযাব নির্ধারিত আছে।

হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করার বিধান

حدثنا محمد بن كثير نا همام عن قتادة عن انس ان جارية وجدت قد رض راسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمى اليهودى فاومت برأسها فاخذا اليهودى فاعترف فامر النبى صلى الله عليه و سلم ان يرض راسه بالحجارة .

মুহাম্মদ ইবনে কাছীর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা একটা মেয়ের মাথা পাথর দ্বারা দলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কে তোমার সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে? অমুক, না অমুক; এক পর্যায়ে একজন ইয়াহূদীর নাম উচ্চারিত হলে, সে মাথা নেড়ে তা সমর্থন করে। তখন ইয়াহূদীকে পাকড়াও করা হলে, সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

ইসলামে হত্যার শাস্তি কঠোর। কেননা হত্যা পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তাই ইসলামী বিধান মতে হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ রয়েছে। যাতে মানুষ হত্যা ও খুন-খারাবী থেকে বিরত থাকে। আলোচ্য হাদীসে দেখা যায়, একটি মেয়েকে ইয়াহূদী পাথর মেরে মাথা চুর্ণ করে দিয়েছে। তখন মহানবী (সা) ও উক্ত ইয়াহূদীর মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এ বিচার মহানবী (সা) এর নিজস্ব চিন্তা প্রসূত ছিল না, এ বিচার মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত ছিল। এ জাতীয় আরো বহু হাদীস রয়েছে। এখানে আরো দুটো ঘটনার উল্লেখ করা হল।

অপর হাদীসে আছে- এক ইয়াহূদী অলংকারের লোভে জনৈক আনসার সাহাবীর মেয়েকে হত্যা করে কূপে নিক্ষেপ করে এবং তার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। সে ধৃত হয়ে নবী করীম (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলে, তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন- ইবন জুবায়হ আইউব (র) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন- একদা একটি মেয়ে অলংকারে সুসজ্জিত ছিল। তখন (অলংকারের লোভে) জনৈক ইয়াহূদী পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) সে মেয়েটির কাছে তখন যান, যখন তার দেহে প্রাণের স্পন্দন ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ কে তোমাকে মেরেছে ? অমুক মেরেছে কি ? তখন সে মাথানেড়ে বলে ঃ না। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আচ্ছা, অমুক মেরেছে কি ? তখনও সে মাথা নেড়ে বলে ঃ না। এরপর তিনি বলেন ঃ আচ্ছা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে মেরেছে কি ? তখন সে মাথা নেড়ে বলে ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে দুটি পাথর দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

حدثنا احمد بن حنبل و مسدد قال نا يحيى بن سعيد نا سعيد بن ابى عروبة نا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت انا والاشتر الى على فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا لم يعهده الى الناس عامة فقال لا الا ما فى كتاب هذا قال مسدد فاخرج كتابا قال احمد كتابا من قراب سيفه فاذا فيه المؤمنون تكافا دمائهم وهم

يد على من سواهم و يسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر و لا دوعهد فى عهده من احدث حدثا فعلى نفسه و من احدث حدثا اواوى محرثا فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين قال مسدد عن ابى عروبة فاخرج كتاب .

কায়স ইবনে আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আশতার ইবনে মালিক (র) আলী (রা)-এর নিকট গমন করি। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে কি এমন বিশেষ কোন কথা বলে গেছেন, যা সাধারণের নিকট বলেন নি ? তিনি বলেন ঃ না, তবে যা তিনি বলেছেন- তা সবই আমার এ কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এরপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একটি চিঠি বের করেন, যাতে এরূপ লেখা ছিল ঃ সমস্ত মুসলমানের রক্ত সমান এবং সমস্ত মুসলমান-অমুসলিমের এক হাত স্বরূপ।

আবদুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া (র) আবদুর রহমান ইবন বুজায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ ! সাহল এ হাদীসের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আসল ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের নিকট এমর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমাদের নিকট এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কাজেই তোমরা তার দিয়াত আদায় কর। তখন তারা এর জবাবে পঞ্চাশ বার কসম খেয়ে লেখে যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার হত্যাকারী কে, তা আমরা জানি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ থেকে দিয়াতস্বরূপ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের একশত উট প্রদান করেন।

এ হাদীসে হত্যার বিনিময়ে হত্যার বিধান দেওয়া হয়েছে। হাদীসে একটি মেয়েকে মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার শাস্তি হিসেবে উক্ত ব্যক্তির মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। হত্যার বিনিময়ে হত্যা একটি কঠিন শাস্তি। ইসলাম হত্যার বিনিময়ে হত্যার শাস্তির বিধান জারি করে মানব জাতির উপর অন্যায় ও জুল্‌ম করেনি বরং এ কঠিন বিধানের মাধ্যমে হত্যার মত পাশবিক ও জঘন্য অপরাধ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে মাত্র। মানুষ যখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যায় তখন সে হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধ করে বসে, যদি এ অপরাধের কঠিন শাস্তির বিধান আরোপ করা না হয় তা হলে পৃথিবীতে ফিতনা, ফাসাদ, হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা এ বিধান দিয়েছেন।

দিআত গ্রহণের পর হত্যা বৈধ নয়

حدثنا موسى بن اسمعيل نا حماد اخبرنا مطر الوراق و احسنبه عن الحسين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا اعفى من قتل بعد اخذ الدية.

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হত্যাকারীর নিকট থেকে দিআত গ্রহণের পর তাকে হত্যা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

ব্যাখ্যা

দিআত গ্রহণ করা হত্যার পরিবর্তে রক্তপণকে বোঝায়। হত্যার পরিবর্তে হত্যা এ বিধানের বিকল্প ব্যবস্থা হচেছ রক্তপণ বা দিআত গ্রহণ। কোন ব্যক্তি তার পরিবারের বা আত্মীয়ের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হত্যার পরিবর্তে রক্তপণ বা দিআত গ্রহণের মাধ্যমে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে হত্যাকারীকে হত্যা করা কোন মতেই বৈধ হবে না কেননা তারা উভয় পক্ষ একমত হয়ে এ রক্তপণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। যদি কেউ এ চুক্তি ভঙ্গ করে কাউকে হত্যা করে তবে সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তি পাবে।

একের অপরাধে-অন্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না

حدثنا احمد بن يونس نا عبيد الله يعنى ابن اياد حدثنا اياد عن ابى رمثة قال انطلقت مع ابى نحو النبى صلى الله عليه و سلم ثم ان النبى صلى الله عليه و سلم قال لابى: ابنك هذا قال اى ورب الكعبة قال حقا قال اشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضاحكا من ثبت شبهى فى ابى و من حلف ابى على ثم قال اما انه لا يجنى عليك و لا تجنى عليه و قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تزر وازة وزر اخرى.

আবূ রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করি। তখন নবী (সা) বলেন- একি তোমার ছেলে ? তিনি বলেন ঃ কাবার রবের শপথ ! হাঁ। নবী (সা) বলেন ঃ তুমি কি সত্য বলছো ? আমার পিতা বলেন - এ ব্যাপারে আমি সত্য সাক্ষ্য প্রদান করছি। তিনি বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্য মুচকি হেসে বললেন, আমার চেহারার সাথে আমার পিতার চেহারার হুবহু মিল ছিল, তবুও আমার পিতা শপথ করেন। এরপর নবী (সা) বলেন ঃ জেনে রেখে ! তোমার অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হবে না এবং তুমিও তার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে না। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন- 'একে অপরের গুনাহের বোঝা উঠাবে না।'

ব্যাখ্যা

হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীকে হত্যা করা ইসলাম বৈধতা দান করেছে। তাই বলে হত্যাকারীর পরিবর্তে তার আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা ইসলাম বৈধতা দান করেনি। তাছাড়া কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করে তবে তার অপরাধের জন্য তার বাবা-মা, ভাই, বোন বা আত্মীয় স্বজন অপরাধী হবে না। ইসলাম একের অপরাধ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় না এবং একজনের অপরাধের কারণে অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়ার বিধান ইসলামে নেই। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) হাদীসটি বলেন। আল-কুরআনেও অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

ولا تزر وازرة وزر أخري একে অপরের গুনাহের বোঝা বহন করবে না। অর্থাৎ একজনের অপরাধে অন্যজন অপরাধী সাব্যস্ত হবে না জাগতিক বা পরকালীন জীবনে কোনটাতেই নয়। কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, ছেলের অপরাধের জন্য পিতা-মাতাকে হেনস্ত থেকে হয়। অপরাধী ছেলেকে খুঁজে পাওয়া না গেলে পিতা-মাতা, ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে এর খেসারত দিতে হয়। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের বিচার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সমর্থন করে না। ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও আদলের লালন করে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে ইসলাম আইনের ক্ষেত্রে যে সমতা ও আদলের প্রতিষ্ঠা করেছে তা পৃথিবীর অন্য কোন সমাজ ও ধর্মে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

আত্মহত্যাকারী কাফের হয়ে যায় না

عن جابر ان الطفيل بن عمروالدوسى اتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله : هل لك فى حصن حصين و منعة قال حصن كان لدوس فى الجاهلية فابى ذلك النبى صلى الله عليه و سلم للذى ذخر الله للانصار فلما هاجر النبى صلى الله عليه و سلم الى المدينة هاجر اليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فاخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرأه الطفيل بن عمرو فى منامه فرأه , هيئة حسنة و رواه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفرلى بهجرتى الى نبيه صلى الله عليه و سلم فقال مالى اراك مغطيا يديك قال قيل لى لن نصلح منك ما افسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر.

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার কোন মজবুত দুর্গ এবং আত্মরক্ষার জন্য কোন সুরক্ষিত স্থানের প্রয়োজন আছে কি ? রাবী বললেন, জাহিলী যুগে দাউসীদের একটি দুর্গ ছিল। নবী করীম (সা) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা (তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার) এ সম্মান আল্লাহ তাআলা আনসারদের ভাগ্যেই নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর যখন নবী করীম (সা)

মদীনায় হিজরত করলেন, তুফাইল ইবনে আমর তাঁর অনুসরণ করল। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তিও হিজরত করল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হল না। তার সঙ্গের লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগ যন্ত্রণা তার সহ্য হল না। সে তীরের একটি চেস্টা ফলা নিয়ে হাতের আঙ্গুলের জোড়াগুলো কেটে ফেলল। ফলে তার দু'হাত দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরূ হল। অবশেষে সে মারা গেল। তুফাইল ইবন আমর তাকে স্বপ্নে দেখল। সে দেখল যে, তার দৈহিক অবস্থা খুবই সুন্দর। সে আরজ করল, তোমার প্রভু তোমার সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছেন ? সে বলল, তাঁর নবী করীম (সা)-এর দিকে হিজরত করার দরুণ তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফাইল তাকে আরো জিজ্ঞেস করল, তোমার হাত দু'খানা কেন জড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি ? সে বলল, আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় নিজের দেহের যে অংশ নষ্ট করেছ তা আমরা কখনও ঠিক করে দেব না। তুফাইল এ ঘটনাটি আদ্যোপান্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বর্ণনা করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার জন্যে দোয়া করে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তার হাত দুটিকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

ব্যাখ্যা

এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আত্মহত্যাকারী কাফির হয়ে যায় না। কিন্তু অন্যান্য হাদীস ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত অনুযায়ী দেখা যায় যে, আত্মহত্যাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একটি ঘটনার দ্বারা বিষয়টি পরিস্কার হওয়া যায়। জনৈক সাহাবী মহানবী (স.) এর সাথে কয়েকটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (স.) উক্ত সাহাবী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, এ সাহাবী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন এ কথা শুনে অন্যান্য সাহাবীগণ এর কারণ খুঁজে পেলেন না। তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং অপেক্ষা করতে থাকলেন। দেখা গেল যে, উক্ত ব্যক্তি হযরত উমর (রা) এর রাজত্ব কালে আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেছে। মহানবী (স.) এ ঘটনাটি পূর্বেই জানতেন, তাই তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন। তাছাড়া আত্মহতাকারী ফাসিক তো বটেই। কাজেই উক্ত হাদীসের আলোকে তাকে মুমিন বলা যথার্থ হবে না। আল্লাহ তাআলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

ফিতনা-ফাসাদ বা সন্ত্রাস

ইসলামে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা-সন্ত্রাস এবং কলহ-বিবাদের কোন স্থান নেই। সমাজ জীবনে ফিৎনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ, সন্ত্রাস-কলহের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময়। মহানবী (স) বলেন-

الا لا تظلموا

"সাবধান ! তোমরা অত্যাচার করো না।"

ফিতনা-ফাসাদ অর্থ ঝগড়া-বিবাদ, হাঙ্গামা, কলহ ও সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করা। অন্যায়ভাবে জোর-যুল্‌ম করে একের উপর অন্যের প্রভাব খাটাতে গিয়ে বা অন্যায়ভাবে ভোগ-দখলের জন্য ভয়-ভীতি এবং ত্রাস সৃষ্টি করা হয়, তাই ফিতনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাস। সন্ত্রাস শব্দের অর্থ অতিশয় ত্রাস বা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি। ইংরেজিতে একে ঞবৎৎড়ৎরংস বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে ফিৎনা-ফাসাদকে এক ধরনের সন্ত্রাস বলা যেতে পারে।

ফিতনা-ফাসাদের পরিণতি

সমাজ জীবনে ফিৎনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ ও সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা চরম পরিণতি ডেকে আনে। সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। সমাজ জীবন বাসোপযোগী থাকে না, সমাজ জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। এজন্য সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন-

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল-আ'রাফ : ৫৬)

وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

"তুমি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি চাইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূলা আল-কাসাস : ৭৭)

ফিতনা-ফাসাদ এবং বিশৃঙ্খলা যে কত জঘন্য অপরাধ, তা আমরা কুরআন মাজীদের এ একটি আয়াত থেকে বুঝতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন-

وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ

"ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।" (সূরা আল-বাকারা-১৯১)

ফিতনা-ফাসাদ মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। ফিতনা মানব সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সমাজে ভাঙ্গন ধরে। এজন্য ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত ফিতনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা দূরীভূত না হয়।" (সূরা আল-বাকারা : ১৯৩)

সমাজে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক হওয়ার পূর্বেই সৎ কাজ করার জন্যে এগিয়ে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন-

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا و يمسى كافرا او يمسى مومنا و يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমরা কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ কর। এ বিপর্যয় তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত গ্রাস করে নেবে। কোন ব্যক্তির ভোর হবে মুমিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা হবে কাফের অবস্থায় অথবা কোন ব্যক্তির সন্ধ্যা হবে মুমিন অবস্থায় আর সকাল হবে কাফির অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে।

ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে ফিতনা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা জঘন্য অপরাধ। ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কারণে মানুষের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মহানবী (সা) বলেন- এমন সময় আসবে যখন সমাজে ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করবে এবং ঈমানদারগণ ঈমান ঠিক রাখতে পারবেনা। পরিস্থিতি এমন হবে যে কোন ব্যক্তি সকাল বেলা মুমিন থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় সে কাফির হয়ে যাবে। আবার কোন ব্যক্তি সন্ধ্যায় মুমিন থাকলেও সকালে সে কাফির হয়ে যাবে। মানুষের কাছে ঈমান ও আমলের তেমন কোন মূল্য থাকবে না। মানুষ দুনিয়া মুখী হয়ে যাবে এবং সকল কাজ কর্মে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে। ফলে হালাল-হারাম, নৈতিক মূল্যবোধের কোন মূল্য থাকবে না। সমাজ হিংস্র পশুর সমাজে পরিণত হবে। কেননা মানুষের মধ্যে যে পশুবৃত্তিগুলো রয়েছে সেগুলোর বিস্তার ঘটবে। ধর্মীয় অনুশাসন লোপ পাবে। মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। ন্যূনতম স্বার্থের জন্য মানুষ ঈমান বিনষ্ট করে দেবে। তাই সমাজে যাতে ফিতনা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা, হত্যা, সন্ত্রাস প্রভৃতি অপরাধ সংঘটিত থেকে না পারে, সেজন্য সমাজের মানুষকে সজাগ থাকতে হবে। সমাজে কোন অপরাধ দেখা দিলে সামাজিকভাবে তা প্রতিরোধ করা বা সরকারকে সহযোগীতা করা মানুষের ঈমানী দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালন করতে পারলেই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং নিরাপদ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান

প্রায় সর্বযুগেই কিছু পেশাদার সন্ত্রাসী ছিল বলে ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। সন্ত্রাসই যাদের পেশা, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই তাদের প্রাপ্য। আর রাসূল (সা)-এর শিক্ষাও তাই। যেমন- একদা কতিপয় বেদুঈন মুনাফিক মুসলমানের ছদ্মবেশে রাসূল (সা)-এর নিকট আসল। তাদের শরীর ছিল রোগে-শোকে জীর্ণ-শীর্ণ। রাসূল (সা) চিকিৎসা স্বরূপ তাদেরকে একটি উটের পাল দেখিয়ে দিলেন এবং সেখানে গিয়ে উটের দুধ পান করতে বললেন। কিছু দিনের মধ্যেই তারা সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল এবং উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। এ সংবাদ রাসূলের নিকট পৌঁছলে তাঁর নির্দেশে কয়েকজন সাহাবা তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন এবং তাদেরকে বন্দী করে মহানবী (সা)-এর দরবারে হাজির করলেন। অতপর মহানবী (সা)-এর নির্দেশে শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত-পা কেটে উত্তপ্ত পাথুরে ভূমিতে ফেলে রাখা হল। তারা পানি পানি বলে চিৎকার করল। কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। (বুখারী খ. ১ম, তাহারাত, পৃ. ৩৬-৩৭)

পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৩৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতই। আর আক্রমণকারীকে হত্যা না করা হলে সে যদি আক্রমণ থেকে বিরত বা দমন না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. কোন মুসলমানকে হত্যা....., তাকে গালি দেওয়া ..... কোন মুলমানের জন্য ..... নয় যে সে তার ভাইয়ের সাথে ..... বলা ..... রাখবে।

খ. খায়বরের একজন ..... নারী ..... সাথে মিশ্রিত করে ..... এর নিকট স্বরূপ প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তার রানের ..... করেন এবং ..... কেউ কেউ তা ..... করে।

গ. এক ইয়াহূদী ..... লোভে জনৈক ..... মেয়েকে ..... করে ..... নিক্ষেপ করে এবং তার ..... পাথর দিয়ে ..... করে। সে ..... হয়ে নবী করীম (সা) -এর ..... হলে তিনি তাকে ..... নির্দেশ দেন। এরপর তাকে ..... করা হয়।

২. উত্তর সঠিক হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা ইসলামের বিধান।

খ. বিষ মিশ্রিত গোশত খেয়ে কোন এক সাহাবী মারা যান।

গ. সকল মুসলমানের রক্ত সমান নয়।

ঘ. ইসলামী বিধান মতে একজনের অপরাধে অন্যজন অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

ঙ. ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা দ্বারা সমাজ জীবনে শান্তি বিঘ্নিত হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামে হত্যার শাস্তির বিধান লিখুন।

২. কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে কী? হাদীসের আলোকে লিখুন।

৩. রক্তপণ গ্রহণ করার পর হত্যাকারীকে হত্যা করার বিধান কী? লিখুন।

৪. আত্মহত্যাকারীর বিধান লিখুন।

৫. ফিতনা-ফাসাদ কী? ফিতনা-ফাসাদের পরিণতি আলোচনা করুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের আলোকে হত্যা, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস ও অধিকার হরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ১৪

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানির পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই সম্পর্কে বলতে পারবেন
- চুরির শাস্তির বিধান উল্লেখ করতে পারবেন
- পাগল ব্যক্তি চুরি করলে তার শাস্তির বিধান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- ডাকাতি ও ছিনতাই-এর শাস্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সমাজের শান্তি কীভাবে বিঘ্নিত হয় তা আলোচনা করতে পারবেন।

চুরি করলে চোরের হাত কাটার বিধান

حدثنا احمد بن محمد بن حنبل نا صفيان عن الزهرى قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يقطع فى ربع دينار فصاعدا .

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এক দীনারের চারভাগের এক অংশ বা এর অধিক মূল্যের জিনিস চুরি করলে হাত কাটার নির্দেশ দিতেন।

ব্যাখ্যা

দীনার বলা হয় স্বর্ণ মুদ্রাকে এবং দিরহাম বলা হয় রৌপ্য মুদ্রাকে। তৎকালে ১২ দিরহাম সমান ছিল এক দীনার। সে হিসেবে তিন দিরহাম অর্থাৎ চারভাগের এক দীনার মূল্যের মাল চুরি করার কারণে নবী করীম (সা) চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন। বর্তমান বিশ্বের মুদ্রামানের দৃষ্টিতে দীনারের মূল্য স্থির করে-এর ভিত্তিতে শরীয়াতে হাত-কাটার বিধান চালু করা সম্ভব।

হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) এক দীনারের চারভাগে এক অংশ বা এর অধিক মাল চুরি করলে চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিতেন। রাবী আহমদ ইবন সালিহ (র.) বলেন ঃ এক দীনারের চারভাগের এক অংশ বা এর অধিক চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.) ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করার কারণে এক বক্তির হাত কাটার নির্দেশ দেন।

حدثنا احمد بن حنبل نا عبد الرزاق نا ابن جريج اخبرنى اسمعيل بن امية ان نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه ان عبد الله بن عمر حدثهم ان النبى صلى الله عليه و سلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة راهم.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একজন চোরের হাত কাটেন, যে স্ত্রী লোকদের সারি থেকে তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরি করেছিল।

চোরের হাতকাটার বিধান

حدثنا قتيبة بن سعيد نا عمرو بن على نا حجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد فى العنق للسارق امن السنة هو قال اتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت فى عنقه .

আবদুর রহমান ইবনে মুহায়রীয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা.)-কে চোরের হাত কেটে তার গলায় ঝুলানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট একজন চোরকে হাযির করা হলে, তার হাত কাটা হয়। এরপর তিনি তার কর্তিত হাত চোরের গলায় ঝুলিয়ে দিতে বলেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা

আভিধানিক অর্থে চুরি বলতে অন্যের মাল সম্পদ গোপনে নিয়ে যাওয়া বোঝায়। শরীয়াতের বিধানে এর অর্থ হল, অন্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ সুরক্ষিত মাল গোপনে নিয়ে যাওয়া। চুরির শাস্তি হল চোরের হাত কবজী পর্যন্ত কেটে দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন- 'পুরুষ চোর এবং নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে চুরির প্রতিবিধান। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল-মায়িদা : ৩৮)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন- 'ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সেও মুমিন থাকে না।

চুরি করা জঘন্য অপরাধ। যে সমাজে চুরি ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়, সেখানে শান্তি থাকতে পারে না।

কি পরিমাণ জিনিস চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে, এ ব্যাপারে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এক-চতুর্থাংশ দিনার বা তিন দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। বনূ মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। এতে কুরায়শগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করবে ? উসামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন- তুমি কি আল্লাহর দন্ড-বিধিসমূহ থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছ ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন- নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতি ছিল যে, যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার উপর দন্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেব। পরে ঐ মহিলার হাত কেটে দেওয়া হল। এর দ্বারা বোঝা যায়, চুরি করা বড় অপরাধ এবং এর শাস্তি যত কঠিন হোক তা রদ করা যাবে না।

পাগলের চুরি বা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرا و عن الصبى حتى يكبر.

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাদের ভাল-মন্দ লেখা হয় না)। এরা হলো ঃ (১) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগরিত হয় ; (২) পাগল ব্যক্তি-যতক্ষণ না সুস্থ হয় এবং (৩) নাবালক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ না তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা উমর (রা.)-এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা-ব্যভিচার করেছিল। তিনি (রাসূলুল্লাহ স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এ সময় আলী (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয় ঃ সে অমুক গোত্রের একজন পাগল মহিলা। সে যিনা-ব্যাভিচার করায়, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন আলী (রা.) বলেন ঃ তাকে ফিরিয়ে আন। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে আলী (রা.) উমর (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনিন। আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ? তারা হলো ঃ (১) পাগল-যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি-যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালেগ ছেলে-মেয়ে-যতক্ষণ না তারা বয়োপ্রাপ্ত হয়। তখন উমর (রা.) বলেন ঃ হ্যাঁ। আলী (রা.) বলেন ঃ এখন আর এরূপ করা হবে না। আলী (রা.) বলেন ঃ আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমর (রা.) তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত এবং নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক বা বালেগ না হওয়া পর্যন্ত শরীআতের বিধান তার উপর আরোপিত হবে না। কারো উপর শরীআতের বিধান জারি করার জন্য তাকে মুকাল্লাফ থেকে হবে অর্থাৎ শরীআতের বিধান পালন করার শর্তাবলী তার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে। চুরির শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, তাই এ বিধান প্রয়োগের ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। ঘুমের মধ্যে মানুষের কোন জ্ঞান থাকে না, ফলে ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে

কোন অপরাধ করলে তা শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত নয়। এমনিভাবে পাগল ব্যক্তির উপরও কোন শাস্তির বিধান আরোপ করা যাবে না। কেননা পাগল ব্যক্তির হিতাহিত বা ভালমন্দ বোঝার কোন শক্তি নেই। তাই তার উপরও ইসলামী শরীআত কোন শাস্তির বিধান বা শরীআতের কোন বিধান প্রয়োগ করে না। এমনিভাবে নাবালেগ ছেলে-মেয়ে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত শরীআত পালনের ব্যাপারে বাধ্য নয়। তারা কোন অপরাধ করলেও শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কেননা তারা অবুঝ, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য এবং ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতা নেই। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তির বেলায় ইসলাম যে দন্ড মওকুফ করেছে তা যুক্তি সংগত এবং মানবিক। যারা চুরির শাস্তিতে হাত কাটাকে অমানবিক বলে ধারণা করে থাকে তারা ইসলামী শরীআতের দর্শন বুঝতে সক্ষম নয়। তাই তারা অজ্ঞতাবশত এরূপ উক্তি করে থাকে।

ছিনতাই ও আত্মসাৎকারীর শাস্তি সম্পর্কে

عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس على المنتهب قطع و من انتهب نهبة مشهورة فليس منا و بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس على الخائن قطع.

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি অন্যের মাল ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

এ সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, খিয়ানতকারীর হাতও কাটা যাবে না।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে অতিরিক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, পকেটমারের শাস্তি হাত কাটা নয়। কেননা সে প্রকাশ্যে মাল চুরি করে।

শাস্তির ব্যাপারে পার্থক্য করা যাবে না

রাসূলুল্লাহ (সা) অপরাধীর শাস্তির ব্যাপারে ছোট বড় বা অভিজাত, নিচু জাতে কোন পার্থক্য করতেন না। একজন চোরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন- "আমরা ভাবিনি, তাকে এ শাস্তি দেবেন। তিনি বললেন- আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত নিশ্চয়ই আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।" চুরি করলে চোরের প্রতি স্বজন প্রীতি বা আভিজাত্যের কারণে শাস্তি লঘু করার বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে শাস্তি সকল অপরাধীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ঘুষ খেয়ে শাস্তি হালকা করে দেয়া যেমন অপরাধ তেমনিভাবে আত্মীয় বা উচচ বংশীয় বলে শাস্তি লঘু করা ও জঘন্য অপরাধ। বিচার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে বিচারককে সব সময় নিরপেক্ষ থেকে হবে। পক্ষপাতিত্ব করা কখনো বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। এখানে আরেকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার- কোন পিতা-মাতা যদি ক্ষুধার বা অভাবের তাড়নায় বাধ্যহয়ে সন্তানের সম্পদ চুরি করে তবে এ জন্য পিতা-মাতার উপর শাস্তি আরোপিত হবে না। কেননা, সন্তানের সম্পদ পিতা-মাতার সম্পদের মতই। হাদীসের মধ্যে আছে, রাসূল (সা) বলেন- তুমিও তোমার ধন-সম্পদ সবই তোমার পিতার।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা থাকলে তার পরই চোরের প্রতি উল্লিখিত শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে অন্যথায় তা করা যাবে না। আর শাস্তি কেবল সরকারই দেবে। অন্য কেউ নয়। কেননা আইন প্রয়োগের বৈধতা একমাত্র সরকার বা তার প্রতিনিধির উপর বর্তায়। গ্রামের মাতব্বর, ইমাম সাহেব, আলিম-উলামা বা গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো উপর শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন না। এরূপ করলে তারা রাষ্ট্রীয় অপরাধে দন্ডিত হবেন।

ডাকাতি

ডাকাতি অর্থ প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি। শক্তি ও বল খাটিয়ে প্রকাশ্যে ভীতি প্রদর্শন করে বা অস্ত্র দেখিয়ে কারও টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক অপহরণ করাকে ডাকাতি বলে। ডাকাতরা অনেক সময় শুধু ধন-সম্পদ, সোনা-দানাই নিয়ে যায় না, মারধোর, নির্যাতন এবং খুন-যখমও করে। ডাকাতি মারাত্মক যুল্‌ম । অত্যাচার করে অন্যের সম্পদ হরণ করা মহাপাপ। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে সাবধান করে বলেন ঃ

الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه.

সাবধান ! তোমরা অত্যাচার করবে না। সাবধান ! স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া অন্যের সম্পদ (গ্রহণ করা) হালাল নয়। (মিশকাত, বায়হাকী, দারেকুতনী) কেউ যদি জোর খাটিয়ে অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ নিয়ে নেয়, তা হলে কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ ফেরৎ দিতে হবে। আর এটা নিশ্চিত যে, সেদিন ফেরৎ দেয়া সম্ভব নয়। তখন ঐ পাওনাদারকে তার পুণ্য দিয়ে দিতে হবে। আর পুণ্য না থাকলে যার সম্পদ নেয়া হয়েছে তার পাপের বোঝা ঐ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। (সূরা আল-বাকারা : ১৮৮)

ডাকাতি বা ছিনতাইকৃত অর্থ-সম্পদ কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়, কেউ ভাল কাজে ব্যয় করলে সাওয়াবের পরিবর্তে পাপী হবে। অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ অন্যায়, অপরাধ ও অসামাজিক কাজেই ব্যয়িত হয়। এতে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়।

ডাকাতি ছিনতাই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়। বর্তমানে বিমান ছিনতাই করা এবং অস্ত্রের মুখে কাউকে জিম্মি করে অর্থ আদায় করা জঘন্য অপরাধ। বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস সংঘটিত হয়। ছিনতাইয়ের ফলে অনেক জান-মালের ক্ষতি হয়, এতে দেশ-বিদেশের বহু জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট হয়।

কোন কোন সময় ধনী ব্যবসায়ী বা সম্পদশালী ব্যক্তিকে বা তাদের সন্তানকে অপহরণ করা হয়, অজ্ঞাত স্থান থেকে পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে টেলিফোনে বা পত্রে পণ দাবি করা হয়। কখনো কখনো পণ দিয়ে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। এটা জঘন্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধে সহায়তা করা গর্হিত কাজ।
কোন মুমিন মুসলমান ছিনতাই করতে পারে না। কেননা হাইজ্যাক বা ছিনতাই ঈমানের পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

و لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها و هو مؤمن.

যখন কোন ব্যক্তি কোন মূল্যবান বস্তু ছিনিয়ে নেয় আর লোকেরা এ সময় তার দিকে চোখ তুলে দেখতে থাকে, তখন সে ব্যক্তি মুমিন থাকে না। (মুসলিম)

ডাকাতি ও ছিনতাই

ডাকাতি, ছিনতাই, লুট-পাট ইত্যাদি চুরি অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। চুরি হয় গোপনে, আর ডাকাতি, ছিনতাই, লুটপাট হয় প্রকাশ্যে। এর সাথে কখনও কখনও খুন জখমও হয়ে যায়। এর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন ঃ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩৩)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ানোর অর্থ বুঝতে হবে সম্পদ নিয়ে যাওয়া ও হত্যার মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করা। এ আয়াতে ডাকাতি, ছিনতাই ও অন্যান্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।
এখানে হত্যা করা, শূলে চড়ানো, হাত ও পা কাটা এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করা এ চার প্রকার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বিচারক অপরাধের মাত্রানুযায়ী তা প্রয়োগ করবেন। যে ডাকাত হত্যা ও সম্পদ হরণ এ দু' অপরাধ করবে তাকে হত্যা করা হবে ; তারপর শূলে চড়ানো হবে। যে ডাকাত শুধু হত্যা করে কিন্তু মাল না নেয় তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি হত্যা ও সম্পদ হরণ কোনটাই করে না, কিন্তু অস্ত্র বা অন্য কোন মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

ছিনতাই, লুট-পাট ও আত্মসাতের জন্য হাত কাটা যাবে না। হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এ হাদীস অনুযায়ী ছিনতাইকারীর হাত না কেটে বিচারক সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্য যে কোন শাস্তি দিতে পারেন।

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ

সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের পরিধি ব্যাপক। যেমন ঃ হত্যা, ষড়যন্ত্র, সম্পদ আত্মসাত, গোলমাল, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা। যে সমাজে এসব কার্যকলাপ অবাধে চলতে থাকে সেখানে শান্তির আশা করা যায় না। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র এমন গর্হিত কাজের প্রশ্রয় দিতে পারে না। ইসলামে এ সব কিছুর কোন অবকাশ নেই।

প্রতিটি মানুষ সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। সমাজের কোন মানুষ যেন অপরাধ করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট না করে এটাই সকলের কাম্য। তবুও সমাজের কিছু মানুষ অন্যের অধিকার খর্ব করে অপরাধ করে বসে। ফলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। সমাজে যাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় সে লক্ষ্যে ইসলাম সমাজকে কলুষমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, যেসব পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা। যেমন সম্পদের ইনসাফ সম্মত বণ্টন, যাতে অভাবের তাড়নায় কাউকে চুরি, ডাকাতি করতে না হয়। প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজ পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে। দেশে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন ও যৌন উত্তেজনা উদ্দীপক সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার রোধ করে ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন। খুনখারাবি রোধে সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটাতে হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ধারা জারী রাখতে হবে। পরনিন্দা, পরচর্চা বন্ধ করার লক্ষ্যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন করতে হবে।

অপরপক্ষে ইসলাম ব্যক্তির মন-মানসিকতায় আল্লাহর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও পরকালের জবাবদিহিতার প্রত্যয় সৃষ্টি করে। তাকে এ কথা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করার সুযোগ দেয় যে, যত সংগোপনেই সে অপরাধ করুক না কেন আল্লাহ তা দেখেন। পরকালে আল্লাহর নিকট এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পরকালের শাস্তি ইহকালের শাস্তি অপেক্ষা অনেক কঠিন ও স্থায়ী। এ বোধ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই কেবল অপরাধের মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব। একাধারে সমাজ থেকে অপরাধ সংঘটনের সকল সম্ভাবনা দূরীভূত ও ব্যক্তি চরিত্রের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই অপরাধ দমন করা যেতে পারে। এতসব ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কোন ব্যক্তি অপরাধ করে বসে, তবে ইসলাম তাকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হয়?

ক. তিন দিনার; খ. তিন দিরহাম

গ. ১২ দিরহাম; ঘ. ক ও গ-এর উত্তর সঠিক।

২. কয় প্রকারের ব্যক্তির উপর থেকে শাস্তি রহিত?

ক. তিন প্রকারের; খ. দুই প্রকারের;

গ. পাঁচ প্রকারের; গ. কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৩. ছিনতাই ও ডাকাতির শাস্তি কী?

ক. হত্যা; খ. হাত ও পা কর্তন করা;

গ. শূলে চড়ানো; ঘ. দেশান্তর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের আলোকে চুরির বিধান কী? লিখুন।

২. ডাকাতি ও ছিনতাই এর বিধান সম্পর্ক আলোকপাত করুন।

৩. পাগল ব্যক্তি চুরি করলে তার শাস্তির বিধান কী? লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-এর বিধান সম্পর্কে হাদীসের আলোকে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ১৫

পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত হাদীস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- সংশ্লিষ্ট হাদীসের অনুবাদ করতে পারবেন;
- লানতপাপ্ত তিন ব্যক্তির পরিচয় দিতে পারবেন;
- ফসল ফলানো ও গাছ রোপনের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন;
- মদ ও মাদক দ্রব্য পরিবেশের ক্ষতি করে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- খিদমতে খালক-এর গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

রাস্তা-ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال اتقو اللعا نبين قالوا وما اللعا نان يارسول الله قال الذى يتخلى فى طريق الناس او فى ظلهم. (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: তোমরা দু'জন অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকবে। তাঁরা বলেন, ঐ অভিশপ্ত দু'জন কারা? যে ব্যক্তি মানুষের চলাচলের রাস্তায় অথবা ছায়াদার গাছের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা

রাস্তাঘাটে বা মানুষ চলাচলের পথে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া কোন ছায়াদার বৃক্ষের বা ফলদার বৃক্ষের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় রাস্তাঘাটে বা ছায়াদার ও ফলদার বৃক্ষের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করার ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি রাস্তা-ঘাটে তথা লোক চলাচলের পথে এবং ছায়াদার ও ফলদার বৃক্ষের নিচে প্রস্রাব-পায়খানাকারীকে অভিশপ্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যারা রাস্তাঘাটে এবং ছায়াদার ও ফলদার বৃক্ষের নিচে প্রস্রাব-পায়খানা করে মানুষ তাদেরকে গালি গালাজ করে। তাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া মানুষের স্বভাবগত অভ্যাস। কেননা মানুষ এতে কষ্ট পায়। পরিবেশ দূষিত হয়। ফলে তারা অভিশাপের হকদার হয়ে যায়। যদি অভিশাপ দেয়া বৈধ হয় তাহলে তার প্রতি এমন দোয়া করা হয় যা তাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর যদি অভিশাপ দেয়া বৈধ না হয় তাহলে সে গুনাহগার হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে হযরত হুযায়ফা ইবনুল আসাদ থেকে বর্ণিত- যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে রাস্তা-ঘাটে কষ্ট দেয় তার প্রতি অভিসম্পাত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষ চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিশাপ, ফেরেশতাদের অভিশাপ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। এ হাদীস দ্বারা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানাকারী ব্যক্তি অভিশপ্ত হয়ে পড়ে। হাদীসে যে ছায়ার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঐ ছায়া যেখানে মানুষ খর-তাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেয় বা ফলদার বৃক্ষ- যা থেকে ফল নিচে পড়ে এবং মানুষ তা খায় এমন ছায়াদার জায়গা। সকল ছায়া এখানে উদ্দেশ্য নয় যার নিচে বসে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ।

ইমাম আবূ দাউদ মুআয (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তোমরা অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকবে- যে ব্যক্তি এমন জায়াগায় প্রস্রাব-পায়খানা করে যেখানে লোকজন পানি পান করা বা অজুর জন্য আসা-যাওয়া করে। কোন পুকুর বা খালের পাড় অথবা নদীর কিনারায় এমন চওড়া রাস্তা যার মধ্য দিয়ে লোকজন পায়ে হেঁটে চলে এবং ছায়াদার বৃক্ষের নিচে যেখানে মানুষ বসে বিশ্রাম গ্রহণ করে। সমাজের লোকজন ব্যবহার করে এমন পানির ধারে পায়খানা-প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। খাল-বিল ও নদীর ধারে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। অপর হাদীসে আছে- সাত জায়গায় প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। যথা- লোক চলাচলের রাস্তার উপর, ছায়াদার বৃক্ষের নিচে যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এমন

জায়গা যেখান থেকে মানুষ অজু বা পান করার জন্য পানি গ্রহণ করে। জন সাধারণের জন্য ব্যবহৃত পানির স্থানে, ফলদার বৃক্ষের নিচে, খাল, বিল বা নদীর ধারে এবং মসজিদের দরজার সামনে। হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে- মহানবী (সা) বলেন-তোমরা কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলাকে পিছন ফিরে প্রস্রাব-পায়খানা করবে না। বরং যদি নিশ্চিত হও যে, পূর্ব-পশ্চিমে কিবলা নেই তবে তা করতে পার। পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের যত্র-তত্র মল-মূত্র ত্যাগ করা বৈধ নয়। এটা আমাদের পরিবেশ দুষিত করে। ক্ষেত্র বিশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে মানুষ বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়াও মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

জীব-জন্তুর প্রতি দয়া করা

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى. فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه. فسقى الكلب فشكر الله له فغفرله: فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: و انا لنا فى البهائم اجرا ؟ فقال نعم! فى كل ذات كبد رطبة اجر. (بخارى ,مسلم ,ابو هريرة رضى الله عنه)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এক ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। সে (এদিক সেদিক অনুসন্ধানের পর) একটি কূপ দেখতে পেয়ে তার মধ্যে নেমে পানি পান করল। (তথায় বালতি এবং রশির ব্যবস্থা ছিল না)। অতঃপর কূপ থেকে বের হয়েই সে একটি কুকুর দেখতে পেল যে পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে ভাবল নিশ্চয় কুকুরটি তার ন্যায় অত্যন্ত পিপাসার্ত। সে তৎক্ষণাৎ কূপে অবতরণ করল এবং স্বীয় চামড়ার মোজা পানি দ্বারা পূর্ণ করে মুখে কামড়ে ধরে উঠে আসল এবং কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজটি অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং তার সকল পাপ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে আমাদের জন্য সাওয়াব আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যে কোন প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার করলে সাওয়াব লাভ করা যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

সকল সৃষ্টিই আল্লাহর। আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া কারো উচিত নয়। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল সৃষ্ট প্রাণীকে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। সকল বস্তু ও প্রাণীই মানুষের অধীন হিসেবে কাজ করছে। তাই, মানুষের উচিত সকল প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ করা। অনর্থক কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেয়া এবং অনর্থক কোন প্রাণীকে আঘাত করা বা হত্যা না করা। পশু-পাখীকে কষ্ট দেয়া স্বয়ং স্রষ্টাকে কষ্ট দেয়ার শামিল। আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- কুকুরের মতো একটি নিকৃষ্ট প্রাণীকে জনৈক ব্যক্তি পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তার সকল পাপ মাফ করে দিয়েছেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বণী ইসরাইলের এক মহিলা বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। উক্ত মহিলা বাড়ী থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় বিড়ালটিকে কোন খাদ্য না দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। বিড়ালটি খাদ্যের অভাবে নিস্তেজ হয়ে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মহিলার এ কাজটি আল্লাহর কাছে খুবই নিন্দনীয় কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কেননা সে যদি বিড়ালটিকে ছেড়ে দিত, তাহলে বিড়ালটি পোকা-মাকড় বা অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করত এবং খাদ্য খেয়ে প্রাণে রক্ষা পেত। কিন্তু উক্ত মহিলা বিড়ালকে খাদ্যতো দিলইনা বরং বিড়ালটিকে বেঁধে রাখল। ফলে খাদ্যের অভাবে বিড়ালটি মারা গেল। পশু-পাখীর সাথে এ ধরনের আচরণ করা অমানবিক ও পাপের কাজ। সুতরাং প্রতিটি মানুষ তথা মুসলমানকে এ জাতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। হাদীসটি মানবজাতিকে পশু-পাখীর প্রতি দয়া করে নিজেদের আচার-আচরণ সুন্দর করার ইঙ্গিত বহন করে। অপর এক হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, কোন এক ব্যক্তি তার উট দিয়ে অতিরিক্ত বোঝা বহন করাত এবং উটটিকে সে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় দিতনা। ফলে উটটি একদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কাছে ঐ ব্যক্তির বিরূদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) লোকটিকে ডেকে এনে উটের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও

পানীয় সরবরাহের নির্দেশ দান করলেন। ইসলাম পশু-পাখীর প্রতি সদয় হওয়ার ব্যাপারে কত সুন্দর বিধান দিয়েছে তা অকল্পনীয়। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে পশু-পাখীর উপর মানুষের কর্তব্যবোধ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করা উচিত।

বৃক্ষরোপণ এর গুরুত্ব

عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة. (متفق عليه)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যদি কোন মুসলমান বৃক্ষরোপণ করে অথবা কোন শস্য ফলায় এবং তা থেকে কোন মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদকা স্বরূপ গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা

এ হাদীসে সৃষ্টি জীব-জন্তুর প্রতি মানব জাতির দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের কোন শ্রমই বৃথা যায় না। তাছাড়া বৃক্ষরোপণের উপকারিতার প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসেবে পশু-পাখি ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের লালন পালন ও সেবা যত্নের দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পিত। এ উদ্দেশে মানুষ যদি কোন বৃক্ষরোপণ করে কিংবা জমিতে শস্য বীজ বপন করে এবং উক্ত বৃক্ষের ফল-ফলাদি ও জমির ফসলাদি যখন কোন মানুষ, পশু কিংবা পাখি ভক্ষণ করবে, তখন এতে ঐ ব্যক্তি সাদকার সাওয়ার লাভ করবে।

কেননা, ইসলামের বিধান মতে সকল প্রাণীর প্রতি মানুষের কতকগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। যারা উক্ত নির্দেশ মুতাবিক নিজ দায়িত্ব পালন করবে, তারাই আদর্শ মানুষ বলে বিবেচিত হবে। আর তাদেরই জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর দরবারে অফুরন্ত পুরস্কার।

এ হাদীসে বলা হয়েছে- কোন মুসলমান কর্তৃক রোপণ করা গাছের ফলফলাদি বা উৎপাদিত খাদ্য-শস্যাদি যদি কোন মানুষ কিংবা কোন পথিক খেয়ে জীবন ধারণ করে অথবা কোন পাখি বা কোন পশু খেয়ে ফেলে তবে এটাও তার জন্য সাদকা বা দান স্বরূপ গণ্য হবে।

অর্থাৎ তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না বরং এর পরিবর্তে সে দানের সমতুল্য সাওয়াব লাভ করবে। মহান আল্লাহর সৃষ্টি জীব তা যে শ্রেণীরই হোক না কেন, তাদের প্রতি মানুষের দয়াশীল থেকে হবে। এমনকি এদের প্রয়োজনীয় উপকার সাধন করতে হবে। তবেই মহান আল্লাহ মানুষকে পুরস্কৃত করবেন।

উক্ত হাদীসের মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, পশুপাখির প্রয়োজন মেটালে এবং তাদের উপকার করলে মহান আল্লাহর নিকট মানুষ মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে। মানুষ ও পশু-পাখি সকলেরই খাদ্যের প্রয়োজন। পশুপাখির প্রতি দয়া প্রদর্শন ও তাদের খাদ্যের যোগান দেয়া মানুষের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালন করলে মহান আল্লাহ তাকে দান-খয়রাত ও সাদকার পুণ্য দেবেন।

মদ ও মাদক দ্রব্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা অভিশপ্ত

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لعن الله الخمر و شاربها و ساقيها وبائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها والمحمولة اليه (رواه ابوداؤد و ابن ماجة)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন মদকে, উহার পানকারীকে, উহা যে পান করায় তাকে, উহা যে ক্রয় করে তাকে, উহা যে প্রস্তুত করে তাকে, উহা যে অর্ডার দেয় তাকে, উহা যে বহন করে তাকে, উহা যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেও। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)

মদ ও মাদক দ্রব্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপ প্রাপ্ত। ইসলাম মানবতার রক্ষাকবচ। ইসলাম মানব স্বভাব বিরুদ্ধ যাবতীয় বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মদ ও মাদকাসক্তি যা মানব প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ। যা মানুষের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক তথা সর্বদিক দিয়ে অনিবার্য ধ্বংসকারী। তাই ইসলাম মদ ও মাদকতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। এর উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মহানবী (সা) আরো বলেছেন-

الخلق عيال الله فاحب خلق الى الله من احسن الى عياله .

"সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ তাআলার পরিবার সদৃশ। সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তিই মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়জন, যে ব্যক্তি সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তাআলার পরিবারের প্রতি বেশি সদয়।"

অতএব এ থেকে বোঝা যায় যে, খিদমতে খালকের গুরুত্ব মানব জীবনে কত বেশি।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া

'খিদমত' (خدمت) শব্দের অর্থ সেবা বা খিদমত, যত্ন, পরিচর্যা ইত্যাদি। আর 'খালক' (خلق) অর্থ সৃষ্টি জগৎ, সৃষ্টি জীব। সুতরাং খিদমতে খালক কথাটির অর্থ সৃষ্টির সেবা। ব্যবহারিক অর্থে শুধু মানুষেরই নয় বরং নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তুর প্রতি স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশানুযায়ী কর্তব্য পালনের নামই হচ্ছে 'খিদমতে খালক' বা সৃষ্টির সেবা।

মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন-

ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

"তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আকাশে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করবেন।" (তিরমিযী)

সেবা মানুষের ধর্ম। নিখিল সৃষ্টি জগতের সব কিছুই মহান আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনি সব কিছুরই স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সকল সৃষ্টির প্রতিই তার করুণাধারা সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত ও আল্লাহর খলীফা। তাই তার উপরই জগতের অন্যান্য সৃষ্টিকূলের রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাজতের ভার ন্যস্ত। সুতরাং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কুল মাখলুকাতের (সমগ্র সৃষ্টিজগতের) প্রতি মানবের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, উদ্ভিদরাজি, নির্জীব জড় পদার্থের প্রতিও মানবের যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। কাজেই কোন সৃষ্টিকেই তুচ্ছ মনে করে অবহেলা ও অমর্যাদা করা মানুষের উচিত নয়। মহান স্রষ্টার সকল সৃষ্টির সেবা তথা খিদমতে খালকের মাধ্যমে মানব নিজেকে তাঁর আপন স্রষ্টার নিকট সবার চেয়ে অধিক প্রিয় বলে প্রমাণিত করতে পারে। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ.

"কেউ আল্লাহর নির্দশনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তার অন্তরের তাকওয়ার সঞ্জাত।" (সূরা আল-হজ্জ : ৩২)

সমাজ জীবনে খিদমতে খালকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা কোন কাজই সম্পাদন করতে পারে না, এমনকি মানবের জীবন ধারণের জন্যও প্রয়োজন হয় অসংখ্য সৃষ্টির সহযোগিতা। আর আল্লাহ তাআলা সমুদয় সৃষ্টিকে মানবের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। সুতরাং মানবের উচিত সৃষ্টির সেবায় এগিয়ে আসা। এ হিসেবে খিদমতে খালকের গুরুত্ব অপরিসীম।

খিদমতে খালকের মাধ্যমে আল্লাহর অপার করুণা লাভ করা যায়। যে মানুষ অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, সে আল্লাহর করুণা ও দয়া পায় না। এ মর্মে মহানবী (সা) বলেন-

لا يرحم الله من لا يرحم الناس

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেন না।"

মহানবী (সা) আরো বলেন-

خير الناس من ينفع الناس

"যিনি মানুষের উপকার করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ।"

খিদমতে খালকের মাধ্যমে জান্নাত লাভ হয়। খিদমতে খালক জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে। সৃষ্টির সেবাকারী পরম সুখে জান্নাতে অবস্থান করবে। করুণার নবী (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ "কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্র দান করল, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোশাক পরাবেন। কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দান করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। আর কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি পান করালে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সীলমোহরকৃত হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন।" (আবু দাউদ)

সৃষ্টির সেবায় মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য

সৃষ্টি জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষই যেহেতু প্রধান সৃষ্টি ; তাই মানুষের উপকার করাই হল তার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। মানুষ মানুষের ভাই। তাই মানুষের সকল বিপদাপদে সাহায্যের জন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেউ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, পীড়িত, অভাবগ্রস্ত, বস্ত্রহীন, দুঃস্থ ও বিপন্ন হয়ে পড়লে তার প্রতি সদয় হয়ে তার সকল দুঃখ বেদনা মোচন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। মানুষের সেবা করলে আল্লাহ প্রীত হন এবং তিনি মানুষের সেবাকে নিজের সেবা হিসেবে গ্রহণ করেন। মানুষের শক্তি-সামর্থ্য সীমিত, একই সাথে সকলের সেবা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; কাজেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ সেবা দান করতে হবে। পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীগণ সেবা পাবার ক্ষেত্রে অগ্রণী। অতঃপর অপরাপর মানুষের সেবায় যথাসম্ভব নিয়োজিত থাকতে হবে।

শুধুমাত্র মানুষের খিদমত করলেই খিদমতে খালক-এর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদরাজি ইত্যাদি সৃষ্টির প্রতিও তার সেবার হাত বাড়াতে হবে। নতুবা আল্লাহর খলীফা ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই পশু-পাখির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গৃহপালিত গবাদি পশু ও উপকারী পাখি, হাস-মুরগি, কবুতর ইত্যাদির যত্ন নেয়া প্রয়োজন। অতঃপর অপরাপর পশু-পাখি, কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল ইত্যাদিকেও প্রয়োজনীয় সেবা দান করা উচিত। বিনা কারণে কোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। ভাষাহীন পশুদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানোও উচিত নয়। তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দান করা কর্তব্য। বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে- "একজন নবীকে এক পিপীলিকা দংশন করলে তিনি সমস্ত পিপীলিকা পুড়ে মেরে ফেলেন। এতে মহান আল্লাহ ওহী যোগে তাকে জানালেন-

"তুমি একটির অপরাধে আমার মহিমা ঘোষণাকারী একটি সম্প্রদায়কে শেষ করে দিলে ?"

মানব সেবা ও জীব-জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহারের সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতের সাথে এমনকি অচেতন জড় পদার্থের প্রতিও সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ ইসলাম দিয়ে থাকে। একদা অকারণে এক ব্যক্তি গাছের পাতা ছিড়লে মহানবী (সা) তাকে সাবধান করে বলেন, "প্রত্যেক পাতাই মহান স্রষ্টার মহিমা গায় ও গুণ কীর্তন করে।"

চেতন পদার্থের ন্যায় অচেতন পদার্থের প্রতিও সদয় ব্যবহার করা প্রসঙ্গে মহানবী (সা) ঘোষণা করেন- "আল্লাহ পাক প্রত্যেক পদার্থের উপর "রহমত" কথাটি অঙ্কিত করে রেখেছেন। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিই সদয় থেকে হবে। অতএব বিনা কারণে গাছ-পালা কর্তন করা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। পানিও অকারণে ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে।

মহান আল্লাহ মানুষের ওপর যেরূপ করুণা করেছেন তেমনি সকল সৃষ্টি জগতের প্রতিও মানুষকে করুণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন-

و احسن كما احسن الله اليك.

"তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ ইহসান করেছেন, তুমিও তদ্রূপ সৃষ্টির প্রতি ইহসান কর।" মহামানব গৌতম বৌদ্ধ এ কারণেই বলেছেন, "জীবে দয়া করে যেজন- সেজন সেবিছে ঈশ্বরে।"

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. (بخارى ,مسلم ,انس)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি মুমিন পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যেও তা পছন্দ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

উকবা ইবন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলিম তার ভাইয়ের নিকট কিছু বিক্রি করার সময় তাতে যদি কোন দোষ ত্রুটি থাকে

তা যেন স্পষ্টভাবে বলে দেয়। কেননা দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা কোন মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য হালাল নয়।" (ইবনে মাজা)

আলোচ্য পাঠে পরিবেশ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে সব মিলিয়েই পরিবেশ। পরিবেশ অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়। এখানে সকল বিষয় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে যে সকল কারণে পরিবেশ দূষিত হয়, মানুষ কষ্ট পায়, পশু-পাখি আর্তনাদ করে রোগ জীবানু ছাড়ায় এ সকল বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া পশু-পাখী যেমন আমাদের পরিবেশের অংশ তেমনি গাছ-পালা, নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল সবকিছুই পরিবেশের অংশ। ধুমপান, মাদক দ্রব্য সেবন এগুলোও পরিবেশ নষ্ট করে। তাই এ পাঠে- এ সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ পাঠের হাদীসের আলোকে আমরা পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখার চেষ্টা করে আল্লাহর প্রিয় পাত্র থেকে সচেষ্ট থাকব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. অভিশপ্ত ব্যক্তি কারা?

ক. যে ব্যক্তি ছায়াদার ও ফলদার বৃক্ষের নিচে মল-মূত্র ত্যাগ করে; খ. যে ব্যক্তি জনপথে মল-মূত্র ত্যাগ করে;
গ. যে ব্যক্তি চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে; ঘ. উপরের সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

২. হাদীসে কতটি স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ করেছে?

ক. ৫ জায়গায়; খ. ৭ জায়গায়;
গ. ৩ জায়গায়; ঘ. ২ জায়গায়।

৩. কিবলার দিকে মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন-

ক. মহানবী (সা); খ. আল্লাহ তায়ালা;
গ. হযরত উমর (রা); ঘ. হযরত আলী (রা)।

৪. পশু-পাখীর প্রতি দয়া করা-

ক. ইসলামের বিধান; খ. পুণ্যের কাজ;
গ. মহানবীর সুন্নাত; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

৫. মানুষের পরিচয় কী?

ক. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি; খ. মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব;
গ. মানুষ সামাজিক জীব; ঘ. সব ক'টি উত্তরই সঠিক।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের আলোকে ফলদার বৃক্ষ ও জনপথে মল-মূত্র ত্যাগের পরিণাম আলোচনা করুন।
২. কয় জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ? হাদীসের আলোকে লিখুন।
৩. পশু-পাখীর প্রতি আমাদের কর্তব্য কী? হাদীসের আলোকে লিখুন।
৪. বৃক্ষ রোপণ ও মাঠে ফসল ফলানোর গুরুত্ব হাদীসের আলোকে বর্ণনা করুন।
৫. মদ ও মাদকতা সম্পর্কে ইসলামী বিধান কী? লিখুন।
৬. মানব জীবনে খিদমতে খালকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৭. মাঠে শস্য ফলানো ও বৃক্ষ রোপণের হাদীসটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখুন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হাদীসের আলোকে ইসলামে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।